সত্যানন্দ দেবায়তন, যাদবপুর
১ নং ইব্রাহিমপুর রোড, কলকাতা - ৩২

ছড়ানো মুক্তো
পোর্টেবল সংস্করণের প্রকাশ
"ঝুলন পূর্ণিমা"
১৪২৭
সত্যানন্দ দেবায়তন, যাদবপুর

ছড়ানো মুক্তো

শ্রীঅর্চনাপুরী মায়ের বাণী

(পরিবর্ধিত পূর্ণাঙ্গ পঞ্চম সংস্করণ)

শ্রীসত্যানন্দ দেবায়তন

১, ইব্রাহিমপুর রোড, যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৩২

ফোন : ২৪১২-১৩৭২ / ২৪১২-০৭৬৯ / ২৪১৪-২২২১/৩১০১৭২৬২

CHHARANO MUKTO – *Sayings of* Sree Archana Puri Maa

প্রকাশক : স্বামী মৃগানন্দ
শ্রী সত্যানন্দ দেবায়তন
১, ইব্রাহিমপুর রোড, যাদবপুর
কলকাতা- ৭০০ ০৩২

প্রথম প্রকাশ : ৭ই শ্রাবণ, ১৩৮১
দ্বিতীয় সংস্করণ : ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪
তৃতীয় সংস্করণ : ৭ই শ্রাবণ, ১৪০০, 23rd July, 1993
চতুর্থ সংস্করণ : শুভ রথযাত্রা, ১৫ই আষাঢ়, ১৪০২, 30th June, 1995
পঞ্চম সংস্করণ : সীতা নবমী, ১৬ই বৈশাখ, ১৪১১, 29th April, 2004

মুদ্রাকর : **ইকোপ্রিন্ট**
৩৭, রাজকুমার চক্রবর্ত্তী সরণী
(স্কট লেন) কলকাতা - ৭০০ ০০৯
দূরভাষ : ২৩৫১ ৪৪৮৩

প্রণামী : তিরিশ টাকা (Rs. 30/-)

শ্রী ঠাকুরের সাধের মনিমন্দিরের বিগ্রহ সমূহ।
ত্রিনয়নি মা, পরম পিতা শ্রী রামকৃষ্ণ দেব,
সর্বজননী মা সারেদা, পরম পূজ্যপাদ স্বামী
অভেদানন্দ মহারাজ্জি ও শ্রী ঠাকুর সত্যানন্দ দেব।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকা

শ্রীঅর্চনা মায়ের বেদবাণী সঞ্চয়নের পূর্ণাঙ্গ পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে শ্রীঠাকুরের কৃপায়। শ্রীঅর্চনা মা'র উপদেশ সব যুগের সব স্তরের মানুষের জন্য। এর একটা ব্যাপক আবেদন যে আছে, তা আমরা বহু ভক্ত এবং সাধারণ মানুষের মন্তব্যে জানতে পারছি। চতুর্থ সংস্করণ নি:শেষিত হয়েছে। এর মধ্যে শুধু "ছড়ানো মুক্তো" পড়ে বহু মানুষ দিব্যজীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আশ্রমে এসেছে পূজনীয়া মায়ের দর্শন ও সান্নিধ্যলাভের প্রার্থনা নিয়ে।

আজ ধনসম্পদ এবং জাগতিক ঐশ্বর্যই মানুষের কাছে মুখ্য চাওয়া হয়ে উঠেছে। সবাই চায় মা লক্ষ্মীর কৃপা। এ প্রসঙ্গে শ্রীমায়ের একটি বাণী স্মরণীয় "লক্ষ্মীর কৃপা তখনই আসে যখন বাইরের সম্পদের সঙ্গে অন্তরের সম্পদ যুক্ত হয়। তা না হ'লে বাইরের সম্পদ লোভ এবং অশান্তি জাগিয়ে দেয়, আর বাইরের সম্পদের যোগ্য ব্যবহারও হয় না। এসে পড়ে ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা। কিন্তু অন্তরের সম্পদ যেমন, উদারতা, সহানুভূতিশীলতা, পরোপকারের ইচ্ছা এবং সর্বোপরি ঈশ্বরে ভক্তি ইত্যাদি থাকলে জাগতিক ঐশ্বর্যের যোগ্য ব্যবহার হয়।" মানুষ প্রশ্ন নিয়ে আসে শ্রীমায়ের কাছে এবং উত্তর পেয়ে প্রসন্ন চিত্তে এগিয়ে যায় জীবনের চলার পথে— এ আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ করেছি।

পূজনীয়া অর্চনা মা আমাদের মধ্যে আছেন এবং জগতের পাপতাপের কিছুটা স্বীয় দেবদেহে টেনে নিয়ে জগতের কল্যাণ সাধন করে চলেছেন। মায়ের বাণীর মধ্যে ঝরে পড়ছে তাঁর করুণামাখা মাতৃস্নেহ।

সবাই মায়ের স্নেহের অমৃত সুধাপানে সঞ্জীবিত হ'ন এই প্রার্থনা।

মাতৃচরণাশ্রিত

স্বামী মৃগানন্দ

শ্রীসত্যানন্দ দেবায়তন

যাদবপুর, কলকাতা

সীতা নবমী

29th April, 2004

ছড়ানো মুক্তো : প্রথম খণ্ড

প্রকাশকের নিবেদন

(প্রথম প্রকাশ)

শ্রীসত্যানন্দ-মানসকন্যা আবাল্য সন্ন্যাসিনী আমাদের পরম পূজনীয়া শ্রীশ্রীঅর্চনা মা ভক্তদের আকুতি ঠেলে বেশিদিন লোকচক্ষুর সম্পূর্ণ অন্তরালে থাকতে পারেননি—আমাদের এ এক পরম সৌভাগ্য। এগারো বছর বয়সে প্রথম দেখাতেই মা ঠাকুরকে চিনেছিলেন তাঁর প্রাণপুরুষ বলে এবং সেই অল্পবয়সেই পরিবেশের অপরিসীম বাধা তুচ্ছ ক'রে নিজের সবটুকু তুলে দিয়েছিলেন শ্রীঠাকুরের হাতে। ঠাকুরের একান্ত সান্নিধ্যে ধীরে ধীরে শতদল-পদ্মের মতো পবিত্র পর্ণ মেলে ফুটে উঠলেন জননী। শ্রীঠাকুর মাকে রেখেছিলেন নিজের সবচেয়ে কাছে। মা ছিলেন ঠাকুরের সঙ্গে পরিপূর্ণরূপে একাত্ম—দুটি সত্তা একেবারে একাকার হয়ে গিয়েছিল। শ্রীঠাকুর সেকথা তাঁর বিশিষ্ট ভক্তদের কাছে প্রমাণ ক'রে দেখিয়েছিলেন। শ্রীমৎ স্বামী নির্বেদানন্দজীর লেখা 'স্মৃতির তীর্থে' গ্রন্থে সেসব কথা রয়েছে।

'ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ' এ বাণীর যাথার্থ্য শ্রীঠাকুর ও শ্রীমায়ের মূর্তি চিন্তা করলেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যুগে যুগে একই লীলা আমরা প্রত্যক্ষ করছি, শুধু রূপ একটু বদলে গিয়েছে। এবার স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম সনাতন শ্রীভগবান সত্যানন্দ লীলায় অবতীর্ণ হয়ে, পরমা শক্তিস্বরূপিণী ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মবাদিনী জগজ্জননী শ্রীশ্রীঅর্চনা মাকে তাঁর মানসকন্যারূপে সঙ্গে নিয়ে এলেন। একমাত্র শ্রীঠাকুরই জানতেন মা'র স্থান কোথায়। তাই সারাজীবন মাকে মর্যাদার উচ্চতম শিখরে বসিয়ে রেখেছিলেন।

শ্রীঠাকুরের দেহরক্ষার পর পাঁচ বছর গত হয়েছে। শোকবিহ্বলা বিরহিণী জননীকে সমস্ত শোক সংবরণ ক'রে এবং শ্রীঠাকুরের সঙ্গেই দেহাবসানের সুদৃঢ় সংকল্পকেও অতিক্রম ক'রে আমাদের মতো শত-সহস্র সন্তানকে কোল

দিতে এই জগতের লীলায় থাকতে হ'ল—থাকতে হ'ল শ্রীঠাকুরের বিরাট আদর্শ এবং উচ্চতম আধ্যাত্মিক ভাবধারাকে বাস্তব রূপ দেবার বিরাট প্রয়োজনে। ভক্ত-শিষ্যদের প্রার্থনায় করুণাময়ী মা এখন গুরুরূপে অধিষ্ঠিতা হয়ে এই জগৎকে তাঁর করুণারসধারায় অমৃতায়িত করছেন। কিন্তু মায়ের সবটুকুই একেবারে প্রচ্ছন্ন। ঠাকুর নিজে কখনও চাননি কোনরকম প্রচার, মা আবার ততোধিক গোপন। শ্রীঠাকুর বলতেন— 'শক্তিকে সংহত রাখাই শক্তিমানের লক্ষণ'। তবু আজ মাকে আমরা পেয়েছি আমাদের একেবারে আপনজন রূপে—সহজ সরল মানবীরূপে। তাঁর কাছে বসে থেকে এতটুকু টের পাওয়া যায় না যে, তিনি এমন এক বিরাট শক্তির উৎসস্বরূপা। তাঁর বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ এতাবৎ সমস্ত ইতিহাসকে অতিক্রম করেছে।

সেই বেদবন্দিতা জননীর সাগরগভীর অন্তর হতে সুদুর্লভ মুক্তাসম অগণিত বেদবাণী স্বতঃই নিঃসৃত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে উপযাচক ভক্তবৃন্দের সম্মুখে। অনায়াসে পাওয়া সেই মুক্তারাজির বেশির ভাগই ধরে রাখা সম্ভব হয় না। তবু শ্রীঠাকুরের একান্ত কৃপায় যেটুকু সম্ভব হয়েছে তারই কিছু সংগ্রহ ক'রে ভগবতী শ্রীশ্রীঅর্চনাপুরী মায়ের সপ্তচত্বারিংশৎ শুভ জন্মদিবস উপলক্ষে শ্রীচরণোদ্দেশে নিবেদন করি এই সামান্য অর্ঘ্য।

আমাদের বিশ্বাস, মায়ের এই বাণীগুলি ভগবৎ পথান্বেষী পথিকের হৃদয়-তন্ত্রীতে গভীর আবেদন সৃষ্টি ক'রে তাকে নিয়ে যাবে মহতের পথে। মা বলেছেন—'সব অশান্তির মূল কারণ কিন্তু একটিই— ভগবৎ অবস্থা থেকে বিচ্যুতি'। মায়ের বেদবাণীকে মন্ত্রস্বরূপ গ্রহণ ক'রে আকুল প্রার্থনা সহায়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে তাঁরই দিকে—সেই ভগবৎ সত্তায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে পরম শান্তিলাভের উদ্দেশ্যে! শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের সকলের সহায় হ'ন, এই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

শ্রীসত্যানন্দার্পণমস্তু।।

৭ই শ্রাবণ, ১৩৮১ — মাতৃচরণাশ্রিত
জুলাই, ১৯৭৪ — স্বামী মৃগানন্দ

ছড়ানো মুক্তো

(১ম খণ্ড)

১।। মানুষের আসল অভাবটা হচ্ছে ভগবানকে না-পাওয়ার অভাব— সেই বিরাট অভাবটাই মূল অভাব। কিন্তু ঠাকুর খুব ফাঁকি দিতে জানেন, তাই ছোট ছোট নানান অভাব দিয়ে সেই বিরাট অভাবকে ভুলিয়ে রাখেন। সব অশান্তির মূল কারণ কিন্তু একটিই — ভগবৎ-অবস্থা থেকে বিচ্যুতি।

২।। অপরের গুণকে বড় ক'রে দেখাটাও একটা মস্তবড় গুণ। সকলকে বড় করলেই তো নিজেও বড় হয়ে যাবে। কারও কোনও গুণের কথা শুনে অনেকে সেটা কেটে দিয়ে ব'লে ওঠে—'ওটা এমন কিছু নয়।' কিন্তু এটা করা ঠিক না। যার যেটুকু ভালো গুণ দেখবে, সেটাকেই বড় করবে, মর্যাদা দেবে।

৩।। যার বিবেক জেগে আছে তার সব ঠিক আছে।

৪।। ভালবাসার এমন একটা পর্যায় আছে যেখানে পৌঁছলে আর কোনও কিছু চাওয়ার থাকে না, কোনও কিছু পাওয়ারও থাকে না। তখন বুকটা সব সময় যেন ভ'রে থাকে, জগৎটা তুচ্ছ মনে হয়।

৫।। নিজের ভেতর থেকে মহামায়াত্বকে সম্পূর্ণ সরাতে হবে। মহামায়া হচ্ছে মোহকরী শক্তি। প্রত্যেকের ভেতরে সেটি রয়েছে। যে তার নিজের ভেতরের মহামায়াত্বটিকে বিসর্জন দিতে পেরেছে, সে আর কোন কিছুতেই মুগ্ধ হয় না।

৬।। সব সময় বালকভাবে, শিশুভাবে থাকবে, যাতে কারও অদিব্য আকর্ষণ তোমাদের প্রতি না এসে পড়ে।

৭।। কেউ যখন সত্যি-সত্যি শিশুভাবে, বালকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন

তার মধ্যে মহামায়াত্বটা থাকে না, তার মধ্যে উপেক্ষার ভাবটা স্বাভাবিক ভাবেই এসে যায়, সহজ সরল ভাবেই তার সমস্ত tendency-গুলি শিশুর মতো হয়ে যায়।

৮।। মানুষের ভেতরে দুই-ই আছে, ফুল আর কাঁটা। আমরা ফুলটুকু গ্রহণ করবো। কাঁটা যখন পাব তখন কষ্ট কি হবে না? কষ্ট ঠিকই হবে, কিন্তু তাই ব'লে কাঁটার পরিবর্তে কাঁটা দেব না। আমরা সাধু, আমরা ফুলই দিয়ে যাব জগৎকে।

৯।। যে যা নয়, সে যদি তাই সাজে—তবে সেটা মানাবে না, কিছুতেই মানাবে না।

১০।। ঘন ঘন দর্শন হয়তো অনেকেরই হয়, কিন্তু দেখা যায়, তাদের বাসনা-কামনা, লোভ-ক্রোধ কিছুই যায় নাই। সেখানে বুঝতে হবে, তার সুকৃতির জন্য ঠাকুর হয়তো তাকে একটু কৃপা করছেন, কিন্তু সেটায় তার নিজের দিক থেকে একটা ফাঁকি রয়ে গেছে।

১১।। দেখা যায়, একজন গায়িকা স্টেজে ওঠামাত্র পাব্লিক থেকে আজে-বাজে গানের ফরমাশ আসে, আবার আর একজন ভজন বা শ্যামাসংগীত-শিল্পী যখন স্টেজে ওঠে তখন লোকে ভজন শ্যামাসংগীতই আশা করে তার কাছে। কাজেই শিল্পীরা যদি দিব্য দিকে নিজেদের প্রতিভাকে বিকাশ ক'রে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই জিনিস পরিবেশন করে, তা হলে লোকের রুচিও পালটাতে বাধ্য।

১২।। মায়ের সঙ্গে ছেলের যে সম্পর্ক, লেখকের সঙ্গে তার লেখার সেই সম্পর্ক।

১৩।। মানুষকে বলে 'সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ জীব'। কিন্তু আমার তো মনে হচ্ছে—ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এই আকাশ, ফুল, এই বিশ্বপ্রকৃতি। এদের মধ্যে বিদ্বেষের হানাহানিটা নেই। একটা ফুল, সে তার innocence

নিয়েই ফোটে, আর সুরভিটুকু নিশ্চুপে বিলিয়ে ঝরে যায়।

১৪।। আমাদের ঠাকুর সত্যানন্দদেবকে আমরা দেখেছি একেবারে সহজ অবস্থায়। একেবারে সহজ স্বাভাবিক শিশুর মতোই আমরা তাঁকে দেখেছি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"শিশুর মতো দু'হাত দিয়ে জগৎটাকে ছুঁই"। আমাদের ঠাকুরকে দেখে সেই কথাই মনে হয়—যেন শিশুর মতোই দু'হাত দিয়ে সমস্ত সাধনার জগৎটাকে ছুঁয়েছেন। বিশেষ process অবলম্বন ক'রে এক-একটা period ধরে একটা সাধনা করতে আমরা ঠাকুরকে দেখি নাই বা সে কথা শুনিও নাই। কিন্তু হিন্দুধর্মের সব মত সব পথের সাধনাই যেন সহজ স্বাভাবিক ভাবেই ঠাকুরের জীবনে রূপ নিয়েছে।

১৫।। আমাদের ঠাকুরের পথ সৃষ্টি হয়েছে চলার পথেই। কোন plan বা পরিকল্পনা ক'রে কিছুই করেননি। মহাকালের মতোই চলার পথে পথ সৃষ্টি ক'রে গেছেন।

১৬।। আমরা ঠাকুরকে দেখেছি, ঠাকুরের সঙ্গে থেকেছি, আমাদের যা পাবার তা পেয়ে গেছি। এখন, যা পেয়েছি সেটা বুঝতে হবে, উপলব্ধি করতে হবে।

১৭।। ঠাকুর সত্যানন্দ বলতেন, 'দেখ বাবা, দৈহিক নৈকট্যটাই সব নয়, মনটাই আসল। কাছে বসে আছ আর চোরের মন পুঁই-আঁদাড়ে, মনটি ঘুরছে তোমার এদিক-ওদিক, তাতে কিছুই হবে না। এই দেখ, টিকটিকিটা আমার পাটার তলায় থাকে, জিভ দিয়ে চেটে চেটে প্রসাদ খায়, কিন্তু এর কি হচ্ছে? কাজেই, কাছে থেকে মনটাকে উন্নত করবার চেষ্টা কর।' সত্যিই যা দেখছি, মানসিক বৃত্তিগুলি যদি উন্নত না হয়, তাহলে কিন্তু কিছুই হবে না—সে যতই ঠাকুরের সঙ্গ করুক আর মাখামাখি করুক।

১৮।। সংসার সব কেড়ে নেয়, চুষে ফেলে দেয়। ভগবানকে দিলে তার চতুর্গুণ আমরা ফিরে পাই। কিন্তু সেটা পাই আমাদের অলক্ষ্যে, তাই

বুঝতে পারি না।

১৯।। সমস্ত অনুদারতার মূল হচ্ছে বাসনা।

২০।। ভেতরের সংস্কারের ওপর বাইরের shock-টা খুব কাজ করে।

২১।। তপস্যা করতে হবে, কারণ, দেহবোধকে ভুলতে হবে। কিন্তু সাবধান, অহংকার যেন না আসে। মানুষ এমন কিছু করতে পারে না, যেটা তাঁকে পাবার মতো হতে পারে। এটা মনে রাখতে হবে যে, সেই অমূল্য রত্নকে কেনবার মতো কোনও ধনই আমাদের নেই। তবু আমাদের এক-পা এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা দেখে তিনি সাত-পা এগিয়ে এসে কৃপা করেন। কৃপা সব সময় অহেতুক। তবু তাঁর দেওয়া অহংটুকু তাঁকে পাওয়ার চেষ্টায় লাগুক— কাজে লাগুক, এটাও তিনিই চান। তপস্যা শেষ-কথা নয়। শেষ-কথা, প্রথম-কথা সবই ওই কৃপা।

২২।। তপস্যা করতে করতে যখন অহংকার চলে আসে, তখনই হয় সাধকের পতন।

২৩।। তপস্যা করা মানে আমাদের আকুতিটুকু তাঁর কাছে পেশ করা। তাই অহংকার করার কিছু নেই। তিনি যতটুকু দড়ি ছেড়ে দিয়েছেন, তাই নিয়ে ওইটুকু পরিধিতে আমরা খাচ্ছি-দাচ্ছি, লাফাচ্ছি। আমাদের তাঁকে লাভ-করাটা কি-রকম জানো? ঠিক যেন একটি গরিবের কোহিনূর কেনা। ধর, একজনের কাছে কোহিনূর আছে। সে হঠাৎ গরিবের ওপর দয়াপরবশ হয়ে সেটা সামান্য কিছুর বিনিময়ে তাকে দান করলো। এখন, গরিবটি যদি অবুঝ হয়, তা হলে ভাববে, আমার মতো বড়লোক জগতে কেউ নেই। কিন্তু সে যদি একটু বুদ্ধিমান হয়, তবে ঠিকই বুঝবে যে, এটা কেনার ক্ষমতা তার ছিল না।

২৪।। ভক্তের তপস্যা হবে ফুলের মতো, দীপের মতো, ধূপের মতো। পরিবর্তে তার কোনও চাওয়াই নেই। ফুল ফোটে শুধু সুগন্ধ ছড়িয়ে দেওয়ার

জন্যই, কাঁটার ব্যথা নিয়ে তার ফোটা শুধু গন্ধ বিলিয়ে দিতে। দীপের জ্বলা তাঁর দেউলে। সে-আলোকে ঘিরে সবাই বসে, কিন্তু দীপের সে-অহংকার নেই যে 'আমার আলোতেই সব আলো'। ধূপও নিঃশব্দে জ্বলে যায় চুপি-চুপি তার সুরভিটুকু বিলিয়ে। এদের তপস্যা শুধু তাঁর প্রীত্যর্থে, অন্য কোনও প্রত্যাশা নেই। আবার চলার পথে অনেকেরই রুক্ষতা এসে যায়। সে-সময়ে খুব সাবধান হতে হবে। আমাদের ঠাকুর যেমন অত তপস্যা সত্ত্বেও চিরকাল এক অনাবিল আনন্দসত্তায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের যেমন আছেঃ "ত্যাগের শূন্য পাত্রটি নিই আনন্দরসে ভ'রে"। সাধক কাঠিয়াবাবা ছিলেন কঠোর তপস্বী। কিন্তু যখনই একটুখানি মিষ্টি-হেসে চোখ মেলে তাকাতেন কারুর দিকে, তখনই সে প্রফুল্লিত হয়ে উঠত, কৃতকৃতার্থ হয়ে যেত। তপস্যাটা আবার আধার-বিশেষে এক এক রকম। নরম শরীর, প্রেমিক শরীর যাদের, তাদের পক্ষে উগ্র তপস্যা একটু ক্ষতিকর।

২৫।। হুকুমের সুরে কাউকে কিছু করতে বললে, অহংকার প্রকাশ পায়, তাই সব সময় অনুরোধের সুরে বলবে। চাকরকেও হুকুমের সুরে বলতে নেই; মিষ্টি ক'রে বলবে—"বাবা, এটা একটু ক'রে দাও তো!" সবাইকে সম্মান দিয়ে নম্রভাবে কথা বলবে। দেখবে যেন ক্রোধ না আসে। বৈষ্ণব যারা, তারা কখনও উগ্রতা প্রকাশ করে না; তারা হবে—'তৃণাদপি সুনীচেন' আর 'অমানিনা মানদেন'।

২৬।। যতক্ষণ অহংকার আছে, ডাঙস খেতে হবে।

২৭।। ইষ্টের সঙ্গে গুরুর সঙ্গে বিভেদ সৃষ্টি করতে একমাত্র মন ছাড়া আর কেউ পারে না। ঠিক যদি মনের জোর থাকে, তা হলে সেরকম সঙ্গ সে ত্যাগ করবে যেখানে গেলে মন গোলমালে পড়ে।

২৮।। মনই হচ্ছে ঘরশত্রু বিভীষণ। মন যদি ঠিক থাকে, তা হলে কারও ক্ষমতা নাই কোনও কিছু করে।

২৯।। যদি সত্যই আধ্যাত্মিক পথে এগোতে চাও, তবে মনটাকে উদার করতে হবে।

৩০।। গরিবেরও একটা আত্মসম্মান আছে, তার মূল্য অনেক বেশি। কারণ, সেটা তার অন্তরের ঐশ্বর্য।

৩১।। সাজবার একটা বয়স আছে, তখন সাজগোজ ভালো লাগে। মেয়েরা সাজতে ভালবাসে। সাজবে তাতে কিছু দোষ নেই। কিন্তু সাজের ভেতর এমন কিছু যেন না থাকে যাতে চটুলতা প্রকাশ পায়। সাজ এমন হবে যাতে, যে দেখবে তার মনে দিব্যভাবের স্ফুরণ হবে।

৩২।। বিবাহটা হচ্ছে ভেলভেটে-মোড়া ছুরি। ভেলভেটের মোড়কটা খুলে দাও, চকচকে ধারালো ছুরি বেরিয়ে আসবে। এক রাত্রির জন্য উলু দিয়ে শাঁখ বাজিয়ে জ্বালার মালা গলায় পরা।

৩৩।। সেবা করতে করতে অনেক সময় অহংকার চলে আসে। মনে সে আকর্ষণ বা টান থাকে না, সেবাটা হয়ে ওঠে দায়সারা গোছের—করতে হবে ব'লেই করে যাওয়া। আসলে উদ্দেশ্যটা ভুল হয়ে যায়। ভালবাসা যে সেবার মূল কথা, সেটাই ভুল হয়ে যায়।

৩৪।। আমাদের সমস্ত অশান্তির মূলে হচ্ছে প্রয়োজন। আমাদের প্রয়োজনটা যত বেড়ে যাচ্ছে স্বার্থচিন্তা ততই পেয়ে বসছে, আর তা থেকেই যত অশান্তি। প্রয়োজন কম থাকলে, এত অশান্তি হ'ত না।

৩৫।। প্রেম এমন একটি জিনিস যেখানে সমস্ত ধর্ম সমস্ত পথ এক হয়ে গিয়েছে। তাই সত্যিকার কোনও প্রেমিক সাধুসন্তের কাছে গেলে বা তাঁর সঙ্গ করলে নিষ্ঠার হানি হবে ব'লে মনে হয় না।

৩৬।। ভালবাসা এমন একটা জিনিস যা বুকটাকে ভরিয়ে দেয়। কিছু পাক আর না পাক, ভালবেসেই তার সুখ। নিঃস্বার্থ ভালবাসা নেই ব'লেই এত অশান্তি।

৩৭।। ভালবাসার মধ্যে দিয়ে যেটা প্রতিষ্ঠিত হবে সেটা শাশ্বত। কিন্তু ভালবাসাটা ভালবাসার জন্যই যদি হয় তবেই সেটা চিরন্তনী হয়, নইলে একটা ফাঁকি থেকে যায়।

৩৮।। মনে রাখতে হবে, সত্ত্বগুণের বন্ধনও যেন আসক্তিতে পরিণত না হয়। সত্ত্বগুণাশ্রিত মায়াও মায়া। তাই মাঝে মাঝে একদম একা বেরিয়ে পড়তে হয়—তাতে মায়িক বন্ধনটা হয় না।

৩৯।। সাধক-কবিরা আসেন আলোর স্রোতে ভেসে আসা ফুলের মতো। তাঁরা ইতিহাসের পাতায় নিজের নাম চান না। তাই সব সময় সাল-তারিখের বালাই তাঁদের থাকে না।

৪০।। অমর্যাদার আঘাতই ভগবানের সবচেয়ে বড় কষ্ট। মানুষ তাঁকে মর্যাদা দিতে পারে না। তিনি যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব, শুদ্ধাতিশুদ্ধ তত্ত্ব; তাই বাসনা-কামনার জগৎ নিয়ে, স্থূল জগৎ নিয়ে যারা আছে, তারা তাঁর ঠিক মর্যাদা দিতে পারে না।

৪১।। স্থূল চোখে সেই চিন্ময় রূপ দেখা যায় না। তাঁকে দেখতে হলে, চাই প্রেমের চোখ। প্রেমচক্ষু হলে তাঁর চিন্ময় দেহের দর্শন হয়। তখন এ দেহটাও হয়ে যায় চিন্ময় দেহ। প্রেমের শরীর হলে, তাঁর চিন্ময় পরশটিও পাওয়া যায়।

৪২।। চাওয়াটা বড় কঠিন ব্যাপার। সামর্থ্যবান দাতার পক্ষে দিয়ে দেওয়াটা কিছু কঠিন নয়, কিন্তু পাওয়ার পর তার ভার বহন করা বড় কঠিন। তার যোগ্য-মর্যাদা দেওয়াটাও শক্ত।

৪৩।। প্রতিভা হচ্ছে সত্য-শিব-সুন্দরের প্রকাশ। লেখক, শিল্পী, গায়ক সবাই যদি দিব্য জিনিস পরিবেশন করে, তবেই ঠাকুরের দেওয়া প্রতিভা সার্থক।

৪৪।। প্রশ্ন ঃ মা সারদার ঝুলনলীলা হ'ল নন্দিনীর সঙ্গে, তা না হয়ে যদি

ঠাকুরের সঙ্গেই হ'ত তো ক্ষতি কী ছিল?

উত্তর ঃ লীলার দৃষ্টিতে দেখলে কোনও ক্ষতি ছিল না। কিন্তু সমাজের পরিবেশকেও মানিয়ে নিতে হয় সাধারণ দৃষ্টির লোকেদের জন্য। সমাজের আদর্শ রক্ষা করতে গিয়ে ভগবানকে যে কী কষ্ট করতে হয় তা ভগবানই জানেন। আচার্য হয়ে আসার ঝুঁকি অনেক। ঠাকুর যে এলেন সন্ন্যাসীর রাজা হয়ে।

৪৫।। প্রশ্ন ঃ অবতারপুরুষ যখন আসেন তখন বহুজনকে কৃপা বিলিয়ে যান, কিন্তু কই সকলে তো সংস্কারমুক্ত হয় না!

উত্তর ঃ অবতারপুরুষ এলে ঠিক বান আসার মতো অবস্থা হয়। বান এলে, নদী ঝরনা খাল পানাপুকুর সব ভেসে যায়। কিন্তু বানের জল যখন চলে যায়, তখন একটু থিতোলে, পানাপুকুরের পাঁক বেরিয়ে পড়ে, তখন বোঝা যায় কোনটা নদী কোনটা কী। অবতারপুরুষও যখন আসেন তখন তাঁর কৃপার বন্যায় সবাই একসঙ্গে ভেসে যায়। ভালোমন্দ ছোট-বড়র বাছবিচার থাকে না। তাই অযোগ্য আধারও কৃপা পায়। তিনি তো বিলিয়ে দিতে আসেন, তাই বিলিয়ে দেওয়াতেই তাঁর আনন্দ। কিন্তু যখন তিনি সামনে থেকে স'রে যান তখন তাদের ভেতরের সংস্কারগুলি ফুটে ওঠে।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, পরশমণির স্পর্শ পেলে লোহা সোনা হয়ে যায়, একবার সোনা হয়ে গেলে পরেও তো সোনাই থাকবে। পানা-পুকুরে আবার পাঁক ওঠার কথাটা এর সঙ্গে কী করে মিলবে?

এর উত্তরে বলা যায় লোহা সোনা হয় ঠিকই, কিন্তু যারা সে পরশমণির সংস্পর্শে আসছে তাদের সবগুলো লোহা নাও তো হতে পারে। যদি অন্য কোনও ধাতু হয়, তা হলে তো হবে না। আবার দেখ, ঠাকুরের বলা আছে ঃ মলয়-পবন বইলে সব গাছ চন্দন হয়, শুধু হয় না ঘাস, বাঁশ

আর অশ্বত্থ। কিন্তু একই বনে যদি সবগুলো গাছ চন্দন হয়ে যায় তবে হয়তো ঘাস-বাঁশ-অশ্বত্থও একটু কিছু সেই সুরভির ছোঁয়ায় সুরভিত হবে। যেমন, হাজরার বেলায় শ্রীঠাকুর বললেন—শেষের দিকে একটু কিছু হয়েছিল।

৪৬।। প্রশ্ন ঃ সাধারণভাবে বলতে গেলে, মানুষ কষ্ট পায় তাদের পাপ তাপের জন্য। হয়তো পূর্ব পূর্ব জন্মেরও নানান পাপের ফল ভোগ করে। কিন্তু এই যারা ঠাকুরের ভক্ত, ঠাকুরকে ভালবেসে ঠাকুরের জন্যই সব ছেড়েছে, যারা ঠাকুরের সবচেয়ে প্রিয়, তাদের কেন এত কষ্ট?

উত্তর ঃ যারা ঠাকুরের সবচেয়ে প্রিয়, সবচেয়ে আপন, তাদের ওপরই তো ঠাকুরের একটা বিশেষ right আছে, দাবি আছে, অধিকার আছে। তাই সব আঘাতের বোঝা তাদের ওপর নিঃসংঙ্কোচে চাপিয়ে দেন। যেমন, বাড়িতে বা সমাজে আমরা খুব কষ্ট পেলে তা ব্যক্ত করি সবচেয়ে যারা আপনজন তাদের কাছেই। মা যেমন নিজের ছেলেকে যখন তখনই দু'ঘা দিতে পারে; হয়তো পাড়ার ছেলেই দোষ করেছে তবু দু'ঘা দেয় নিজের ছেলেকেই। তেমনি ভগবানও তাঁর সবচেয়ে আপনজনকে, বা সমবেতভাবে ধরতে গেলে, ভক্ত সত্তাকেই দুঃখ আঘাত দেন বেশি।

৪৭।। প্রশ্ন ঃ ঠাকুরের চরণে মনকে একান্ত নিবিষ্ট করার সময়ে সংসারের নানা চিন্তার বিক্ষেপ উঠে সেই একাত্ম ভাবটি জমে উঠতে দেয় না। কিন্তু সংসারের কাজের মাঝে যখন থাকি, অনুরূপভাবে ঠাকুরের চিন্তা কেন বিষয়কাজের নিবিষ্টতা ব্যাহত করে না? শক্তি যেমন একটাই, শুভ বা অশুভ যাই হোক না, এক্ষেত্রে চিন্তাশক্তিটাও ওই একটাই। বিষয়ান্তরে মনের গতি স্বতঃসিদ্ধ, তবুও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হয় কেন?

উত্তর ঃ বস্তুতঃ শক্তি একটা হলেও, তার প্রকাশ তো বিভিন্ন রূপেই হবে এবং যুগ ও আধার-বিশেষে তার প্রাবল্যেরও তারতম্য ঘটবে। এ

যুগে অশুভ শক্তির প্রাবল্য বেশি, তাই শুভ সংস্কারগুলিকে সে দাবিয়ে রাখে। তাই ভগবচ্চিন্তার সময়ে অশুভ শক্তি মাথা-চাড়া দিয়ে সংসারের চিন্তা এনে দেয়; কিন্তু শুভ সংস্কারের স্বল্পতাহেতু সংসারের কাজে ভগবচ্চিন্তা সহজে জেগে ওঠে না। তখন মন বিষয় হতে বিষয়ান্তরে ছুটে যায় ঠিকই, কিন্তু সংসারের বিভিন্ন বিষয়েই তার গতি সীমিত থাকে। কারণ, ভগবৎ-বিষয় তো স্থূল বিষয়বস্তুর পারের জিনিস। সেখানে সংসারের কাজের মধ্যে মনকে যাওয়াতে হলে, মনের অনেকখানি সূক্ষ্মতার প্রয়োজন। দীর্ঘদিন ভগবচ্চিন্তায় অভ্যস্ত হলে, সেই মন তখন সংসারের কাজের মধ্যে থেকেও ভগবচ্চিন্তাকে টেনে আনতে পারবে। কারণ, সে মন তখন অশুভ শক্তিকে পরাভূত ক'রে শুভ সংস্কারকে জাগিয়ে তুলেছে। সে মনের কাছে ভগবৎ-বিষয় এবং জাগতিক বিষয়ের ব্যবধানটা কমে এসেছে এবং জাগতিক বিষয়টারও রূপ পালটে গেছে তার দৃষ্টিতে। কাজেই সেখানে দুটি বিষয়ের মধ্যে মনের যাওয়া আসাটা সম্ভব।

ছড়ানো মুক্তো : দ্বিতীয় খণ্ড

প্রকাশকের নিবেদন

(প্রথম প্রকাশ)

পরমপূজনীয়া শ্রীঅর্চনাপুরী মায়ের আটচল্লিশতম জন্মদিবস ও গুরুপূর্ণিমার শুভ তিথিতে 'ছড়ানো মুক্তো'র এই দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হ'ল। সম্যক্ প্রজ্ঞাপ্রসূত এই বাণী মানুষের অন্তরে অন্তরে মন্ত্রবৎ গেঁথে গিয়ে তাকে শক্তি দেবে দিব্যপথে চলার, তাকে নিয়ে যাবে শিবসুন্দরের দিকে— এই আমাদের বিশ্বাস, এই আমাদের অন্তরের প্রার্থনা।

এই পুস্তক প্রকাশে সহযোগী মহাপ্রাণদের ঋণ আমাদের চিরদিনের।

শ্রীসত্যানন্দার্পণমস্তু।

ভূমিকা

যুগসঙ্কট-মুহূর্তে ক্রন্দসী ধরার আর্তবেদনা টলিয়ে দেয় ব্যথাহারী নারায়ণের অটল সিংহাসন। জীব-কল্যাণে নবরূপে আবার তাঁকে ধরার ধূলে আসতে হয় নেমে। এই বিংশশতাব্দীর আঁধার যুগে আবার ঘটেছিল সেই আবির্ভাব যুগপুরুষ শ্রীসত্যানন্দদেবের প্রেমঘন বিগ্রহে। সেই পরমকরুণাময় দেবতার অন্তর্ধানে এ জটিল যুগে ভক্তসাধারণ হয়ে পড়েছিলেন অকূল সাগরে ভাসমান। সেই বিরাট অভাব পূরণ করতে এবং শ্রীঠাকুরের ভাবাদর্শ ও কর্মধারাটিকে জাগিয়ে রাখতে শ্রীসত্যানন্দ-মানসকন্যা আমাদের পরমারাধ্যা শ্রীঅর্চনা মা এগিয়ে এলেন ভক্তজনসমক্ষে। ঠাকুর সম্বন্ধে, অধ্যাত্মবিষয়ে, সমাজ ও সংসার সম্বন্ধে কত শত প্রশ্ন ও সমস্যার কথা নিয়ে এবং আত্যন্তিক শান্তি কামনায় ভক্ত জিজ্ঞাসুরা আসেন মায়ের কাছে। তাঁদের সে-সব প্রশ্ন ও সমস্যার সমাধান-মুখে নিঃসৃত বাণীগুলির কিছু কিছু আমার প্রিয় গুরুভাই স্বামী মৃগানন্দ টুকে রাখেন তাঁর দিনলিপিতে। সেখান থেকেই আটচল্লিশটি বাণীমুক্তা নিয়ে 'ছড়ানো মুক্তো'র এই দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হয়েছে।

দীর্ঘ তিরিশ বছর ঠাকুরের নিরবচ্ছিন্ন নিবিড় সান্নিধ্যে থেকেছেন তাঁর মানসকন্যা শ্রীঅর্চনা মা। তাই মায়ের পক্ষেই সম্ভব শ্রীঠাকুরের অনন্তভাবময়তা এবং অনন্তরূপময়তাকে সর্বজনসমক্ষে এত সহজ ভাবে তুলে ধরা, যা এই পুস্তকের কতকগুলি বাণীর অনুশীলনে বোঝা যায়। ঠাকুরের প্রসঙ্গ ছাড়াও বাণীর বৈচিত্র্যে আরও বহু বিষয়ে আমরা দেখতে পাই নূতন আলোর রেখা। ভক্ত-জিজ্ঞাসুর জন্য আধ্যাত্মিক পথের, ধর্মপথের নির্দেশ যেমন রয়েছে, তেমনি এ দেশের মাতৃজাতি ও সর্বসাধারণের এগিয়ে চলার গুরুত্বপূর্ণ পথ-নির্দেশও রয়েছে এই বাণী-সম্ভারে। অধ্যাত্মপীঠ ভারতের আধ্যাত্মিকতাই প্রাণ। এ জাতির জীবনের প্রতিটি স্তরই হচ্ছে অধ্যাত্মভিত্তিক। তাই সংসারক্ষেত্র, সমাজসেবা, সব কিছুর নির্দেশই আমরা পাই আমাদের দেশের ঋষিদের, ব্রহ্মবাদিনীদের কথিত ধর্মনীতির বাণীর মধ্যে। এই পুস্তকেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

বর্তমান দেশজোড়া নৈতিক অধঃপতন ও সমাজের ব্যাপক অবক্ষয়জনিত জাতির শোচনীয় অবস্থার কল্যাণময় পরিবর্তন-সাধন আজ সকলেরই অভীষ্ট। কিন্তু ধর্মকে, আধ্যাত্মিকতাকে বিসর্জন দিলে ভারতের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। ভারত-আত্মার বাণীদূত বিবেকানন্দ ভারতবাসীকে এ-বিষয়ে বার বার সাবধান ক'রে গেছেন। সেই সাবধানবাণীই আজ আবার নতুন ক'রে ঘোষিত হয়েছে এই পুস্তকে। মা বলেছেন— "ধর্ম-নিরপেক্ষতার দোহাই দিয়ে ধর্ম-বর্জনের যে নীতি এখন চলেছে তার জন্যই সর্বস্তরে দুর্নীতি ছেয়ে গেছে। দেশটাকে যেন তলায় তলায় খেয়ে যাচ্ছে, একটা বিরাট ধ্বস নেমে যাচ্ছে। নৈতিকবোধ ধর্মবোধ চলে যাচ্ছে ব'লেই এই অবস্থা।" দেশের এই চরম অবস্থার মোড় ফেরাতে হলে, ধর্মবোধ ও নীতিবোধকে জাগাতেই হবে। ধর্মের সঙ্গে নীতির রয়েছে গভীর সম্পর্ক। এই বোধটি জাগ্রত করতে মায়ের বাণী হওয়া উচিত নিত্য স্মরণ-মন্ত্র। পুস্তকের একস্থানে বলা হয়েছে—"একটি ঊর্ধ্বতম সত্তার প্রতি গভীর বিশ্বাস রাখা উচিত, সেখানে সমস্ত নীতির মান নির্ধারিত হচ্ছে।" বস্তুতঃ এই বিশ্বাসকে দৃঢ় করতেই বিশ্ববাসীকে আবার স্মরণ করতে হবে সেই ঐতিহ্যময় তপোবন-ভারতের কথা। এ পুস্তকে আমরা পাই সে-কথারই ইঙ্গিত। আরও দেখি—

মাতৃজাতিকে একদিকে যেমন ত্যাগাদর্শে অধ্যাত্মপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে, তেমনি সমাজ ও দেশের প্রতিও তাঁদের যে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে, বিশেষ ক'রে দেশাত্মবোধটি শৈশব থেকেই শিশুর প্রাণে জাগিয়ে তোলার যে বিরাট দায়িত্ব তাঁদের ওপর ন্যস্ত রয়েছে, সে বিষয়ে সচেতন করা হয়েছে মাতৃকুলকে।

সর্বোপরি, ত্যাগদীপ্ত এই বাণী মানুষের অন্তরে ধ্বনিত করে বৈদিক-ভারতের মৈত্রেয়ী কণ্ঠের সেই শাশ্বত আদর্শ—"যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্"—অর্থাৎ যার দ্বারা আমি অমৃতত্ব লাভ করবো না, তা দিয়ে আমি কী করবো, তা আমি চাই না।

আমরা বিশ্বাস করি, 'ছড়ানো মুক্তো'র দিব্যদ্যুতিতে মানুষ পাবে অমৃতপথের সন্ধান, পারমার্থিক শান্তির দিশা।

১লা শ্রাবণ, ১৩৮২
জুলাই, ১৯৭৫

মাতৃচরণাশ্রিত
স্বামী হীরানন্দ

ছড়ানো মুক্তো

(২য় খণ্ড)

১।। আমাদের ঠাকুর শ্রীসত্যানন্দদেব ছিলেন বিশ্বপিতার প্রতিমূর্তি। বলতেন ঃ "আমি জমিটা তৈরী ক'রে দেবো, পারিপার্শ্বিকটা তৈরী ক'রে দেবো, তারপর তারা নিজের নিজের originality নিয়ে ফুটবে।" যেমন, বিশ্বপিতা সব সাজিয়ে দিয়েছেন—আলো বাতাস জমি—সব থরে থরে সাজিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন। এখন আপনিই ফুল ফুটবে, ফল ফলবে, সবই হবে। আমাদের ঠাকুরের ছিল ঠিক ওই একই process বা পদ্ধতি। দেখ না, ভগবান, যিনি সৃষ্টিকর্তা, তিনি স্থান-কাল-পাত্র বিশেষে পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে দিয়েছেন। সবাই নিজের নিজের আধার অনুসারে চরমের দিকেই এগিয়ে চলেছে। তারি মধ্যে মৃত্যু আসছে—একটা যবনিকা পড়ছে, আবার নতুন জন্ম হচ্ছে, আবার নতুন পোশাক প'রে নতুন জীবন সুরু করছে মানুষ। আমরা তাকে বলছি জন্মান্তর। কিন্তু তাঁর কাছে এর সবটুকুই একটা অভিনয়ের অঙ্ক মাত্র। তিনি কিন্তু সম্পূর্ণ নির্বিকার। সেই সবের মাঝে থেকেও নিস্পৃহ ভাবটি ঠাকুরের মধ্যেও দেখেছি। এক এক সময় সেটি বিশেষভাবে ফুটে উঠত। রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা শ্রীঠাকুর প্রায়ই বলতেন—

"সবলে কারেও ধরিনে বাসনা মুঠিতে
দিয়েছি সবারে আপন বৃন্তে ফুটিতে।"

২।। ঠাকুর সত্যানন্দদেব ছিলেন ভক্ত-প্রতিপালক। শুধু দীক্ষা দিয়েই দায়িত্ব শেষ নয়, শুধু যে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ তা নয়, ভক্তদের সবরকম প্রয়োজনের দিকে, অভাব-অনটনের দিকেও ঠাকুরের দৃষ্টি ছিল। কোনও

ভক্তের বাড়িতে শুনেছেন দুধ জোটে না, অথচ তাদের দুধের খুবই দরকার। আশ্রম থেকে ভালো দুধ মহাপ্রসাদ ক'রে বড় গেলাস ভর্তি ক'রে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কাউকে টাকা দিয়ে সাহায্য করেছেন, কাউকে জামা-কাপড় দিয়েছেন। কী বলবো, কী উপমা দেব, বুঝতে পারছি না। ঠিক যেমন রাজা। প্রজাপ্রতিপালক রাজা যেমন তার প্রজাদের সবরকমে প্রতিপালন করে, তেমনি আমাদের ঠাকুর তাঁর ভক্ত-শিষ্যদের প্রতিপালন ক'রে গেলেন সারাজীবন। যাদের অহোভাগ্য তারা সে করুণার কথা আজও মনে রেখেছে।

৩।। ঠাকুর সত্যানন্দদেব ছিলেন পূর্ণতম সত্তা। আশ্রমের সব কাজের মধ্যেই ছিলেন ঠাকুর। ধ্যান-জপ, পূজো-পাঠ, গান-বাজনা, অভিনয়, সেলাই-এর কাজ, রান্নাবান্না, ঘরঝাঁট সবই ছিল ঠাকুরকে ঘিরে, ঠাকুরের জন্যে। তাই ঠাকুরকে একটা শুধু পূজার জিনিস, সেবার জিনিস করে রাখা হয়নি; নানান বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে চলেছে আমাদের জীবন। ঠাকুর গান লিখতেন, আমরাও লিখতাম। কত সুরবৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের সমস্তই হয়েছে ঠাকুরের আশ্রয়ে এসে। নাটক লিখেছি, সেগুলো আমাদেরই ছেলেমেয়েরা অভিনয় করেছে। ঠাকুর সেগুলো দেখে কত আনন্দ করতেন। আমাদের মেয়েদের থিয়েটার নামকরা থিয়েটারের চেয়ে কিছু কম ছিল না।

আমাদের সাধনাটা পূর্ণাঙ্গ সাধনা। আমাদের ধর্মজীবনটা পূর্ণাঙ্গ ধর্মজীবন। যা কিছু শ্রীযুক্ত, যা কিছু দিব্য সবকিছুই আমাদের ধর্ম-জীবনে আছে। তাই বাইরের জিনিসের জন্য কোনও অভাববোধ কখনও হয়নি। সাধারণতঃ, মানুষ জপ-ধ্যান ক'রে কতক্ষণ থাকতে পারে? একটু বৈচিত্র্য যদি সৃষ্টি না করা যায় তাহলে জপধ্যান করতে গিয়ে ঢুল আসবে। দু'একজন ছাড়া, শুধু জপ-ধ্যান নিয়ে কেউ থাকতেও পারে না, আর কিছু পায়ও না। ধর্ম বিষয়ে যদি মনকে সব সময় যুক্ত রাখতে হয় তাহলে ধর্ম পথেও কিছু

ক'রে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে হবে। তবে, সে বৈচিত্র্য হবে দিব্য জিনিস নিয়ে। শ্রীঠাকুর সত্যানন্দ তাঁর আশ্রমগুলিতে এই দিব্য বৈচিত্র্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে অভিনব দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন।

৪।। কোনও কারণ নিয়ে ভালবাসাটাকে ঠিক ভালবাসা বলা যায় না। যোগ-বিভূতি দেখে হয়তো কাউকে ভালো লাগল। কিন্তু যেই তার সে-শক্তি ফুরিয়ে গেল তাকে আর ভালো লাগবে না। এক্ষেত্রে মানুষটিকে ভালবাসা হয়নি, হয়েছে তার যোগ-বিভূতিকে। আমাদের ঠাকুর সত্যানন্দদেবকে আমরা ভালবেসেছিলাম তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা দেখে নয়, কোনও যোগ-বিভূতির প্রকাশ দেখে নয়, তাঁকে দেখেই মনে হয়েছে—তিনি আমাদের আপন হতেও আপন, তাঁকে নইলে বাঁচব না। এক্ষেত্রে ভালবাসার অন্য কোনও কারণ ছিল না। ঠাকুরের প্রতি এই ভালবাসাটি শাশ্বত ভালবাসা, তাই ঠাকুরও আমাদের শাশ্বত ঠাকুর।

৫।। শ্রীঠাকুরের এমনই কল্যাণশক্তি ছিল যে, তাঁর সন্তানদের মধ্যে অকল্যাণশক্তি আসতেই পারে না। কারণ, তারা তো কাজ করছে ঠাকুরের শক্তিতেই। ঠাকুরের এক সন্তান আর এক সন্তানের অকল্যাণ কখনওই করতে পারে না—ইচ্ছা করলেও করতে পারে না, ঠাকুরই করতে দেবেন না। কারণ, তাহলে তো ঠাকুরের শক্তিটাও কিছুটা অকল্যাণশক্তি হয়ে যাবে। কিন্তু তা তো হতে পারে না। তাই ঠাকুরের ছেলেদের সম্বন্ধে এ-কথা কখনই বিশ্বাস করা যায় না যে, ঠাকুরের আধ্যাত্মিক শক্তি নিয়ে তারা কারো ক্ষতি করতে পারে।

৬।। ভগবান আমাদের মধ্যে নেমে আসেন আমাদের মতো হয়েই আমাদের জন্যই অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করেন। কিন্তু মানুষ তাঁকে ঠিক মর্যাদা দিতে পারে না, কাঁটার ক্ষতই দিয়ে ফেলে। ...আবার তিনি যদি শুধু শাসনদণ্ড বা Ruling power নিয়ে এসে লীলা করতেন, তাহলে লোকে

ভয় করত ঠিকই, কিন্তু ভালবাসতে পারতো না। কৃষ্ণের প্রতি মানুষের অনুরাগ তাঁর বৃন্দাবনলীলার জন্যই। আমাদের মতো হয়ে না এলে গৌরাঙ্গদেবকে প্রেমাবতার বলত না, তাঁর সঙ্গে হরিনামে গলে যেতে পারত না। শুধু শাসনদণ্ড বা Ruling power নিয়ে এলে তিনি হয়তো হিটলার হতে পারতেন, কিন্তু তাতে তাঁকে কেউ প্রেমাবতার বলতে পারত না। তিনি সেইজন্য সাধারণের মতোই সবকিছু করে পথ দেখিয়ে নিয়ে যান।

চৈতন্যদেব হরিনামের বন্যায় জগৎকে ভাসিয়ে দিয়ে গেলেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের মতোই তাঁকেও অনেক কিছুই সইতে হয়েছিল। লোকে তাঁকে বলতে কিছুই বাকি রাখেনি। উনি নাম-সংকীর্তনে বেরোতেন একটু সেজেগুজে গলায় মালতীর মালা প'রে। একে অপরূপ সুপুরুষ, তাতে যখন সাজগোজ করে বেরোতেন তখন সকলে মুগ্ধচোখে চেয়ে চেয়ে দেখত শুধু। কিন্তু একদল ঈর্ষাপরায়ণ লোক বলতে লাগল—একে অমন রূপ, তাতে ওই সাজবেশ, লোকের আকর্ষণ হবে না কেন! আর অত ঐশ্বর্য, শিষ্যরা ভুরি ভুরি দিয়ে যাচ্ছে, তা ছাড়া অমন রূপসী স্ত্রী, এসব নিয়ে ভোগ-সুখে ডুবে থেকে নাম করা, এ আর কি? ...

এসব কথা যখন মহাপ্রভু শুনলেন, তখন বুঝলেন, তাঁর সন্ন্যাস ছাড়া জীবের উদ্ধার হবে না, বিষ্ণুপ্রিয়ার চোখের জল ছাড়া জগতের কল্যাণ অসম্ভব। তিনি তখন মা এবং স্ত্রীকে অনেক বুঝিয়ে তাঁদের অনুমতি নিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন এবং পুরী চলে গেলেন। এক এক সময় তাঁর বিরাট ঐশী শক্তির প্রকাশ হয়েছে বটে, কিন্তু তিনি সেটাকে সংবরণ ক'রে নিয়েছেন, সাধারণ মানুষের মতোই আচরণ ক'রে গিয়েছেন শেষ পর্যন্ত।

আবার মানুষের জন্যই তাঁর সবচেয়ে প্রিয় পার্ষদ নিত্যানন্দ প্রভুকে সংসারে পাঠালেন। নিত্যানন্দ ছিলেন মহাপ্রভুর এপিঠ-ওপিঠ। আজীবন

কঠোর সন্ন্যাসধর্ম পালন করেছেন। সমস্ত বাসনাকে জয় ক'রে সন্ন্যাসধর্মে পূর্ণ-প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তারপর তাঁকে মহাপ্রভুর আদেশে সংসার করতে হ'ল। তাঁর সংসার করা নিজের বাসনা-তৃপ্তির জন্য নয়। কারণ, তিনি তো সব বাসনা-কামনার ঊর্ধ্বে। তাঁর সংসার করা গৃহীদের আশ্বাস দেবার জন্য যে, সংসারে থেকেও ভগবানকে ডাকা যায়, ভগবানকে পাওয়া যায়, তাঁর সংসার শুধুমাত্র ভগবৎ নাম প্রচারের জন্য।

তাই সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবে কর্তব্যকর্মটুকু ক'রে যাওয়া ছাড়া সংসারে তাঁর আর কিছু প্রয়োজন ছিল না। এই মানুষের উদ্ধারের জন্যই মহাপ্রভুকে বিবাহের পর স্ত্রীকে ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাস নিতে হ'ল, আবার এই জীবকল্যাণের জন্যই আজন্ম সন্ন্যাসী নিত্যানন্দকে সংসারে পাঠাতে হল।

৭।। এমনিতে দেখ, ভগবানের সঙ্গে শুধু চাওয়ার সম্বন্ধই থাকে, দেওয়ার কিছু থাকে না। কিন্তু ভগবান দেহ ধারণ ক'রে এলে মনে হয় শুধু দিতে। যেই তাঁকে নিজের আপনজন বলে কাছে পেলাম, তখন চাওয়ার চেয়ে দেওয়ার মনটাই হয়ে যায় বেশি। আত্মীয়সুলভ ভালবাসা যেই এল তখন নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের চেয়ে তাঁর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যটাই বড় হয়ে ওঠে। মা-যশোদার কাছে যখন গোপাল এলেন তখন তিনি তো বলেননি—কৃষ্ণ, আমাকে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এসব দে। বরং তাঁকে কী করে একটু খাওয়াবেন, আদর করবেন এই ছিল তাঁর চিন্তা। কালিয়া নাগকে দমন করতে শ্রীকৃষ্ণ দীঘিতে নামলেন শুনে মা যশোদা ভয়ে কেঁদে উঠলেন। ভগবান ভাবলে এটা হত না, মানবভাবটি না হলে নিষ্কাম বিশুদ্ধ ভালবাসাটা আসে না। ভগবানের মূর্তির কাছে তো শুধু দেহি দেহি। ভক্তি-পূজা সবের ভেতরই চাওয়াটি রয়েছে।

৮।। মহাপুরুষেরা যখন আসেন, নিজের সত্তাকে ভুলে আসেন। তাঁরা

যে অধরার ধন, ধরায় এসেও তাঁরা থাকেন আপনহারা হয়ে। তাঁদের বিরাট প্রতিভার প্রতিষ্ঠার কোনও রকম চাহিদাই থাকে না। কোনও রকম return তাঁরা চান না।

৯।। প্রেম-ভালবাসাকে ঠাকুর সব স্তরে না দিয়ে যদি একটা দিব্য স্তরের জন্যই শুধু রেখে দিতেন তো ভালো হ'ত। কারণ, ভালবাসার বহিঃপ্রকাশটা সবক্ষেত্রে প্রায় একই রকম হয় ব'লে, দিব্য ভালবাসার সঙ্গে সাধারণ কামনাবাসনাযুক্ত ভালবাসার তফাৎটা মানুষ ঠিক বুঝতে পারে না। তাই কৃষ্ণলীলাকে সাবধানে রাখতে হয়। সাধারণ মানুষের সেখানে প্রবেশাধিকার নাই। পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত কৃষ্ণলীলায় প্রবেশ নিষেধ।

১০।। প্রেমের অহংটা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। এই অহংকার আসে প্রেমাস্পদের সঙ্গে গভীর একাত্মতা থেকে। তখন প্রয়োজনবোধে, ভালবাসার দায়ে প্রেমাস্পদকে নিজের চেয়ে ছোট মনে করে ফেলে কখনো কখনো। তাতে দোষ নেই। প্রেমাস্পদের জলতেষ্টা পেয়েছে। অথচ কাছে ভোগ দেবার মতো শুদ্ধ জল নেই। সেক্ষেত্রে যদি কেউ নিজের খাবার এঁটো জলটাই খেতে দেয় তাতে দোষ হয় না। তবে ভাবের শুদ্ধতা দরকার।

কর্মেতিবাই দাঁতন করতে করতে গোপালের ভোগ রাঁধতেন, পাছে প্রাতঃকৃত্য সারতে গিয়ে গোপালের খাওয়ায় দেরি হয়ে যায়। গোপালের খুব ভোরেই খিদে পেয়ে যায়, তাই দেরি করা তো চলবে না। একদিন এক সাধু এসে তাঁর এইরকম করাটাকে বিধিবিরুদ্ধ, শুদ্ধাচার-বিরুদ্ধ এসব ব'লে খুব তিরস্কার করলেন। আর শুদ্ধাচার-পালনের বিধিগুলোও তিনি ব'লে দিলেন। পরের দিন সেই নিয়মগুলো পালন করতে গিয়ে গোপালের ভোগে দেরি হয়ে গেল। ওদিকে জগন্নাথজীর ভোগ আর কিছুতেই হয় না। শেষে জগন্নাথজী দর্শন দিয়ে বললেন—ওরে, আমি যে রোজ কর্মাবাই-এর ভোগ নিয়ে তারপর এখানে ভোগ নিই, আজ তো

সেখানেই অনেক দেরি হয়ে গেল! ...সাধু তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন। তাড়াতাড়ি গিয়ে কর্মেতিবাই-এর চরণে লুটিয়ে প'ড়ে নিজের ভুল স্বীকার ক'রে ক্ষমা চাইলেন এবং তাঁকে পূর্বের মতোই ভোগ-রান্নার পরামর্শ দিলেন।

বৃন্দাবন-লীলাতেও দেখ, গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে এঁটো খাওয়াচ্ছেন, ক্রীড়া করতে গিয়ে তাঁর গায়ে পা ঠেকিয়ে ফেলছেন, একটা যেন সমতার ভাব এসে গিয়েছে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গভীর একাত্মতায়। উদ্ধবকে তাঁদের পদধূলি দিতে দ্বিধা হয়নি তাতে যদি শ্রীকৃষ্ণের শিরঃপীড়া কমে। গোপীদের খেলার সময় কৃষ্ণের গায়ে পা ঠেকেছে, কিন্তু তাই ব'লে চলতে গিয়ে তাঁরা কি অবজ্ঞাভরে শ্রীকৃষ্ণের গায়ে পা ঠেকিয়ে চলে যাবেন? তা কখনও করা চলে না। সেখানে অপরাধ হবে। মহাপ্রভুর একজন সেবক গোবিন্দ। মহাপ্রভু শুয়েছিলেন আর উনি সেবা করছিলেন। অন্যপাশে পদসেবার জন্য তিনি নিদ্রিত মহাপ্রভুকে লঙ্ঘন ক'রে গেলেন। কিন্তু ফিরে আর এলেন না। এদিকে খাওয়ার সময় পেরিয়ে গেল। মহাপ্রভু শয়ন থেকে উঠেই বললেন—তুমি ভোজন করতে যাওনি? সেবক গোবিন্দ বললেন—প্রভু, আপনাকে লঙ্ঘন ক'রে কি করে যাই? তাই যাইনি। মহাপ্রভু বললেন — তবে এদিকে এলে কি করে? তিনি বললেন— সেটা তো আপনার প্রয়োজনে প্রভু! প্রভুর প্রয়োজনে প্রভুকে লঙ্ঘন করেছি, কিন্তু নিজের প্রয়োজনে কেমন করে প্রভুকে লঙ্ঘন করি?

কিন্তু সেবা করতে করতে যখন অহংকার আসে, অশ্রদ্ধা আসে তখনই সাবধান হওয়া দরকার। কোনও একটি মঠে একজন পূজারী-সেবক একদিন তার প্রভুকে জানালো...“মহারাজ, আমি কিছুদিন দূরে গিয়ে তপস্যা করে আসতে চাই। আমার অহংকার এসে যাচ্ছে। এখন দেখছি আগেকার সেই সমীহ শ্রদ্ধার ভাবটা নেই আমার সেবার মধ্যে। জলে পা ঠেকে গেছে।

দায় সেরে সেই জলই ঠাকুরকে ভোগ দিচ্ছি।” এই সেবকটির বিবেক জেগেছিল, তাই সে নিজের ভুল নিজে বুঝতে পেরে তপস্যা করতে চলে গেল।

সারদা মা-ও বলেছেন ঃ “সেবা করতে করতে সেবাটা একসময় পুতুলখেলার মতো হয়ে যায়।” সে তখন পূজার বিগ্রহ-দেবতাকে মনে করে পুতুল মাত্র। একটা carelessness, একটা অশ্রদ্ধা এসে পড়ে। তাই মনটাকে আগে বুঝতে হবে। সেবার অহং না প্রেমের অহং, একটু যাচাই করলেই মন ঠিক বুঝতে পারবে সে-কথা। তবে বিবেকটা জাগা চাই।

১১। সাধারণ মানুষ যেমন রান্না করে, স্নান করে, খায়, নিত্যকর্ম করে, তেমনি দু’বেলা হয়তো ভগবানকেও ডাকে। সব নিত্যকর্মের মতো এটাও যেন একটা routine মাত্র। কিন্তু তারা ভাবতে পারে না যে, ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ ওইটুকুই শুধু নয়, তাঁকে আরও নিবিড় করে পাওয়ার আছে।

ভেবে দেখ, স্ত্রী বিবাহ-আসরে স্বামীর পাশে বসল, পুরুত মন্ত্র পড়িয়ে দিল। তারা বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হল। অমনি স্ত্রীটি স্বামীর সঙ্গে চলে গেল ঘর করতে। তাদের মধ্যে একটা নিবিড় সম্বন্ধ গড়ে উঠল, যদিও তার আগে পর্যন্ত হয়তো একে অন্যকে চিনত না জানত না। তেমনি দেখ, ছেলে মা’র পেটে এল। আর-জন্মে সে কোথায় ছিল, কি ছিল, কেউ জানে না। জন্ম নিতেই মা’র সঙ্গে তার নিবিড় সম্বন্ধ হয়ে গেল। মা তাকে বুকের স্নেহ দিয়ে দিনরাত এক ক’রে মানুষ করতে লাগল।

ঠিক সেইভাবেই ভগবানের সঙ্গে একটা যোগসূত্র গ’ড়ে তাঁকে নিবিড় ক’রে কি পাওয়া যায় না? গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়ে সেই মন্ত্রের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে একটা সম্বন্ধ স্থাপন ক’রে তাঁকে কি নিবিড় ক’রে পাওয়া যায় না? এ কথাটা যেন মানুষের ধারণার মধ্যেই আসে না। ভগবানকেও

যে একটা গভীর মধুর সম্বন্ধ গ'ড়ে ভালবাসা যায়, সে কথাটা সাধারণ মানুষ ধারণাই করতে পারে না। অথচ যে সম্বন্ধ ক্ষণভঙ্গুর, শুধু যেখানে স্বার্থের ভালবাসা, সেখানে তাদের সবকিছু নিঃশেষ করে দিচ্ছে। আবার ভগবান যখন ঘরের মানুষ হয়ে আসেন তখন যে তাঁর সঙ্গে মানুষের মতোই ব্যবহার করা চলে, সেকথাও মানুষ বোঝে না।

ভগবান অবতার হয়ে এলেও তাঁকে ঠিক আপন ক'রে নিতে পারে না মানুষ। তাই এত গোলমাল লেগে যায়। তাদের কাছে সাধারণ মানুষের জৈব সম্বন্ধগুলো বৈধ ভালবাসা, কিন্তু ভগবানকে সেইভাবে ভালবাসলে বা তাঁর সঙ্গে সেইরূপ ব্যবহারেই যত দোষ। মানুষ নিতে পারে না।

তার কারণ, ভগবানের প্রতি সে-ভালবাসা নেই। ভগবানকে সাজানো, খাওয়ানো ভগবানকে নিয়ে আনন্দ-আহ্লাদ, এগুলোকে বলবে বাড়াবাড়ি যত। নিজের স্বামীকে ছেলেকে নিয়ে, তাদের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক নিয়ে সব-কিছুই করা চলে, তাতে কোনও দোষ হবে না। অথচ ভগবান, যিনি জগৎস্বামী, তাঁর সঙ্গে পতি ভাবে সাধন, মধুর ভাবে সাধন, এ যেন লোকে মেনে নিতে পারে না। তাঁকেই যে গোপাল ভাবে দেখা যায়, নিজের ছোট ছেলের মতোই তাঁর সঙ্গে ব্যবহার করা যায়, এসব তারা ভাবতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণ যে এসেছিলেন—স্বয়ং ভগবান—লীলা করতে, তাঁর লীলা যে অন্যায় নয় সে-কথা কত ভাবে শাস্ত্রকাররা বুঝিয়েছেন। কারণ, আজও মানুষের মনে সেই খোঁচাটুকু রয়ে গেছে। স্ত্রীর স্বামীর প্রতি অনুরাগ দেখে বলে 'সতীলক্ষ্মী'। অথচ জগৎস্বামী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদের অনুরাগ দেখে তাঁদের কলঙ্কিনী বলল। তাদের আজও বোঝাতে হচ্ছে, জগৎপতি সাক্ষাৎ ভগবানকে ভালবাসা অবৈধ নয়, বৈধ। কারণ, সে ভালবাসা জাগতিক কামনা-বাসনার অতীত, চিন্ময় ভালবাসা।

১২। হে প্রভু, তুমি আকাশ করেছ, ফুল করেছ, বাতাস করেছ, জল দিয়েছ, সব দিয়েছ, তুমি দয়াময়, করুণাময় প্রভু, আমি তোমার ভৃত্য সেবক, এসব ব'লে ভগবানকে খুব উঁচু একটা আসনে বসিয়ে প্রার্থনা জানানোর একটা পথ আছে। কিন্তু তাতে বুকটা যেন ভরে না। এ পথে ঠিক রস পাবার মতো কিছু নেই। ভগবানকে বুকের ভেতরে আঁকড়ে ধরাটা যেন সম্ভব হয় না। মানুষ চায় বুকের ভেতরে একটা কিছু আঁকড়ে ধরতে। যেমন, গোপাল ভাবে ভগবানকে আমরা নিজের ছেলে ব'লে বুকে ধ'রে আদর করতে পারি। মীরাবাঈ-এর মতো গোপাল গিরিধারীকে জাগিয়ে তুলতে পারলে সব অভাব মিটে যায়।

আমাদের আশ্রমে যেমন ত্রিনয়নীকে দেখছ। ছোট্ট মেয়ে! ঠাকুর বললেন—ত্রিনয়নী আমার মেয়ে। এখানে সবাই ওকে কত আদর করে, জড়িয়ে ধরে চুমু খায়, 'তিনু, তিনুঠাকরুন' বলে আদর ক'রে ডাকে। ভগবানকে ওই উঁচু আসনে দূরে বসিয়ে রাখলে এটা সম্ভব হয় না। ভগবানের সঙ্গে একটা নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপন ক'রে তাঁকে নিজের সবচেয়ে আপনজন মনে করে ভালবাসা যায়। এ পথে বুকটা ভরে যায়।

১৩। সংসারটা জোয়ার-ভাটার রাজ্য ... জোয়ার-ভাটা থামানোটাই তো সাধনা।

১৪। বিয়ের পর নতুন-বউ দু'হাত ভর্তি চুড়ি প'রে শ্বশুরবাড়ি যায় কিন্তু আসলে ওগুলো চুড়ি নয়, জেলখানার বেড়ি। লোহার শেকলের বেড়ি যেমন কয়েদির দু'হাতে পরিয়ে দেয় আর খন্ খন্ শব্দ হয়, এও যেন ঠিক তাই।

১৫। একটু তলিয়ে চিন্তা করলে দেখা যাবে মেয়েদের পক্ষে বৈরাগ্যটা সহজ। কারণ, মেয়েদের নিজস্ব ঘর বলতে কিছুই নেই। যতদিন বিয়ে না হয় ততদিন সে থাকে বাপের বাড়িতে। বিয়ে হয়ে গেলে চলে যায় স্বামীর

ঘরে। তারপর বয়স হয়ে গেলে, স্বামী চলে গেলে ছেলের কাছে থাকে, তখন ছেলের ঘর।

কোনও ঘরই তার নিজের নয়। বাপের ঘর, স্বামীর ঘর, ছেলের ঘর, কোনোটাই তার নিজের ঘর নয়। এক যদি সে স্বাধীনভাবে কিছু ক'রে নিজের উপার্জনে ঘর করে তো সেটা আলাদা কথা, কিন্তু তা ভিন্ন তার নিজের বলতে কিছুই নেই। তবু মেয়েরা ঘর বাঁধতে চায়। ঘর বাঁধার বাসনাটা তাদেরই বেশি। সেই ছোটবেলা থেকে মেয়েদের কানে মন্ত্র দেওয়া হয়, পরের ঘরে যেতে হবে, পরের মন জুগিয়ে চলতে হবে। অথচ সেই পরের ঘরে গিয়ে সে সবকিছু আঁকড়ে ধরতে যায় নিজের ব'লে। তাদের এই নিজের ব'লে আঁকড়ে ধরার মনোভাবটা মহামায়াই দিয়েছেন। পরের সংসারে থেকেও সেটাকে তারা আপন ব'লে চালাতে চায়। এটি মহামায়ারই ইচ্ছা। তা না হলে তো দলে দলে মেয়েরা সন্ন্যাসী হয়ে যেত, সংসার কেউ করত না। মেয়েরা কোনও-না-কোনও একটা ছোট্ট বন্ধনের মধ্যে নিজেকে বাঁধতে চায়। অথচ ছেলেরা যদিও নিজেরা উপার্জন ক'রে সব করছে, নিজের বাড়ি বলে দাবি করার right আছে, তবু তাদের মধ্যে সে-বন্ধনটা বড় একটা থাকে না। তাদের সব থাকতেও তারা মনে মুক্ত, উপার্জন ক'রে সংসারে দিয়েই খালাস, আঁকড়ে ধরার ভাবটা বড় একটা থাকে না। ছেলেদের আছে অথচ আঁকড়ে ধরার মোহ নেই। মেয়েদের কিছুই নেই অথচ এই আঁকড়ে ধরার ভাবটা আছে, ঘর বাঁধার বাসনা আছে—এই দুয়ের সম্মিলনে মহামায়ার খেলাটি চলছে।

১৬।। আসলে নিজের চাহিদা কি, বুঝতে হবে। নিজের ছেলে-স্বামীর প্রতি ভালবাসা আছে। কিন্তু ঠিক ভগবানের প্রতি ভালবাসা সহজে আসে না। সেটা জাগাতে হয়। কিন্তু সংসারে অনেক বিপরীত atmosphere-এর মধ্যে চলতে হয়, তাই এত কঠিন।

১৭।। ধর্মরাজ্যে এগোতে হলে পথটাকে ভালবাসার চেষ্টা কর। ভালবাসা না এলে এগোনো যাবে না। পথটা ভালো না লাগলে সবই বৃথা। কারণ, একটা পথ ধরে তো এগোতে হবে। যে রূপ ভাল লাগে, যাঁর প্রতি একটা আকর্ষণ বোধ ক'রছো, তাঁকেই ভালবাসতে চেষ্টা কর। গুরুকে ধর।

১৮।। জপ প্রার্থনা এসব যদি লোকের কল্যাণের জন্য সংকল্প ক'রে বসে না-ও করা হয়, তবু আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাব সূক্ষ্মভাবে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে কাজ করবে। সূর্য উঠলে যেমন আলো আপনি ছড়ায়, তেমনি যারা আধ্যাত্মিকতায় প্রতিষ্ঠিত হয় তাদের প্রভাব আপনিই ছড়ায়। হিমালয়ের সাধুরা আলাদা ক'রে কিছু করুন আর নাই করুন, তাঁদের অবস্থিতিতেই জগতের কল্যাণ সাধিত হচ্ছে। আবার সংসারেও দেখা যায়—এক এক জন সৎ-মানুষের প্রভাব এমনি যে, তাঁরা থাকতেই বাড়িতে একটা দিব্যভাব ধর্মের ভাব একটা কল্যাণের ভাব থাকে। অনেক বাড়িতেই দেখা যায় একজন বয়স্ক মানুষ, তিনি নিজে হয়তো কিছুই করতে পারেন না, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবেই তিনি সকলকে ধ'রে আছেন আর তাঁর চলে যাওয়া-মাত্র সব যেন ভেঙ্গে যায়।

১৯।। ইতিহাস আর কাব্যে একটা মস্ত বড় পার্থক্য আছে। ইতিহাস matter of fact-কে তুলে ধ'রে নিছক ঘটনাটুকু দিচ্ছে। কিন্তু কাব্য—ইতিহাস ছাড়া আরও কিছু। সেখানে শুধু ঘটনা নয়। ঘটনার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বা স্বরূপটা তুলে ধরা হয়। একজন আর একজনকে একটা আঘাত করল। ইতিহাস শুধু ঐ ঘটনাটুকু ব'লেই চুপ করবে। কিন্তু কাব্য সেই আঘাতের পেছনে কি উদ্দেশ্য, কি প্রয়োজন, কি তাৎপর্য, সবটা ফুটিয়ে তুলবে।

ইন্দ্রিয় দ্বারা দেখার পরে অনুভূতির রাজ্যের জিনিস তুলে ধরে কাব্য। তাই কাব্য নিছক ইতিহাসের সীমা বা গণ্ডীকে ছাড়িয়ে যায়। গভীর

অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে এবং কল্পনার আশ্রয় নিয়ে সে ঘটনার মধ্যেও একটা কিছু নূতন জিনিস খুঁজে বার ক'রে তার নিজস্ব অবদান রেখে দেয়। তাছাড়া, রসসৃষ্টিটা কাব্যের একটা মস্তবড় দিক। কাব্যের ভিতর থাকে রস, যেটা কবির নিজস্ব সৃষ্টি। শুধু ইতিহাস নিয়ে যারা মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করে তারা ঠিক রসের আস্বাদ পায় না।

২০।। চৈতন্যঘনসত্তা ভগবান পৃথিবীতে নেমে আসেন সৃষ্টির সঙ্গে তাল মিলিয়ে।

২১।। 'ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে'—এটাও যেমন সত্য, তেমনি এটাও মস্ত বড় সত্য যে, পিতার মধ্যে লুকিয়ে আছে শিশুর শিশুত্ব। পরিণত বয়সেও এই শিশুত্বটি বীজাকারে থেকে যায়; দেখা যায়, বার্ধক্যের অসহায়তার মানুষ শিশুর মতোই হয়ে যায়, শিশু আর বৃদ্ধে বিশেষ প্রভেদ থাকে না। এটা হচ্ছে সেই আদি শিশুত্বের কথা, অর্থাৎ যে শিশুত্ব নিয়ে সে এই জগতে প্রথম এসেছিল। সাধনার চরম কথা এই শিশুত্ব-অর্জন। কারণ, ভগবান নিজেই হলেন বিরাট শিশু।

২২।। বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে শরীরের যেমন একটা যোগ আছে, তেমনি মনেরও একটা যোগ আছে। কিন্তু সাধকের মনটাকে এমন একটা স্তরে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যেখানে প্রকৃতির চঞ্চলতা মনের ওপর কোনও অদিব্য প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। বরং সেই দিব্য মনের রঙে প্রকৃতিই রেঙে উঠবে। সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না যে-কোনও ভাবই থাকুক না, সবই থাকবে দিব্যভাবে ভাবিত।

২৩।। সামান্য ফুলগাছ তৈরি করতে কত পরিশ্রম দরকার, কত জিনিস দরকার—ভালো মাটি, সার, আলো, জল, মালী—কত কি চাই। আর মানুষ তৈরি করতে গেলে কি এমনি-এমনি হবে? আধারও চাই, পরিবেশও চাই, তবেই তো সদ্‌গুরুর কৃপা কাজ করবে।

২৪।। দেখ বাবা, দেবস্বপ্ন সত্য। এগুলো তাঁর কৃপা। সব সময় যে স্বপ্নের গভীর অর্থ থাকবে এমন কোনও কথা নয়। অনেক ক্ষেত্রে হয়তো অর্থ থাকে, আবার অনেক ক্ষেত্রে শুধু কৃপা করার জন্যই তিনি দর্শন দেন। ভক্তকে এগিয়ে নেবার জন্য আকর্ষণ করার জন্যই স্বপ্নে কৃপা করেন।

২৫।। প্রাণ-শক্তিকে জাগানোর জন্য নাম-শক্তিই যথেষ্ট। কুণ্ডলিনী জাগানোর চেষ্টা আর ওইসব ক্রিয়ার কোনও দরকার নেই।

২৬।। চেষ্টা করার ইচ্ছা হারিয়ে গেলে জোর ক'রে আনতে হবে, সেটাই তো চেষ্টা, সেটাই তো পুরুষকার।

২৭।। Struggle আছে মানেই এগিয়ে যাওয়া আছে। Struggle না থাকলে বলা যায় এগোনোটা থেমে গেছে। Struggle বা সংগ্রাম হচ্ছে আধ্যাত্মিক জীবনের মূল কথা।

সংসারের মাঝে থেকে নিরন্তর বাইরের পরিবেশ এবং নিজের অন্তরের পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করতে করতে ধর্মপথে এগিয়ে যাওয়া—এর একটা আলাদা মূল্য আছে। এটা না থাকলে সেই পরম-পাওয়ার ঠিক মর্যাদা দেওয়া যায় না।

২৮।। ভাববে—মন তোমার না তুমি মনের? শ্রীরামকৃষ্ণদেব একটা গান গাইতেন, তার একটা লাইন হচ্ছে ঃ 'তবে বলি বাপু বাছা বাপের ঠাকুর মনের মতো মন হবি'। এই 'মনের মতো মন' হওয়ার মানে কি? শুদ্ধ বুদ্ধির কথা মেনে যখন মন চলবে তখনই মনের মতো মন।

২৯।। জীবনের উদ্দেশ্যটাও শুভ করতে হবে, আবার সে-উদ্দেশ্যে পৌঁছনর পথটাও শুভ করতে হবে। শুভ উদ্দেশ্য কখনও অশুভ পথে সিদ্ধ হয় না।

৩০।। আজকের দিনে টাকার মূল্য যদি বা ছাব্বিশ পয়সা আছে, মানুষের মূল্য এক ছিদেমও নেই।

৩১।। সুখ আর দুঃখের একটা মিলন-বিন্দু আছে। যার সুখ আছে সে যদি শান্তিকামী হয়, আর যার দুঃখ আছে সে যদি স্বেচ্ছায় ত্যাগপথকে বরণ ক'রে নেয়, তাহলে তাদের সুখ আর দুঃখ শান্তির বিন্দুতে এসে এক হয়ে যাবে।

৩২।। বেশি চেয়ো না। এ জগৎটা পাওয়ার জগৎ নয়, হারানোর জগৎ। পাওয়ার চেয়ে হারানোর ঝুঁকিটাই বেশি। ঠাকুর নিজে থেকে যা দেননি তা জোর করে চাওয়া ঠিক নয়। যার যেটা ভাগ্যে না থাকে সেটা হয় না ঠিক। কাজেই শান্তি এবং সন্তুষ্টি নিয়ে থাকার চেষ্টা কর, প্রার্থনা কর শান্তির জন্য। তোমাদের পক্ষে যা মঙ্গলকর, ঠাকুর তাই করবেন।

৩৩।। উদ্ধার মানে মুক্তি। পাকা গুরুর পাল্লায় পড়লে আখেরে মুক্তি হবেই। আধিকারিক পুরুষেরা কৃপা করলে ব্যাপক মুক্তির ঢেউ বয়ে যায়। গিরিশ ঘোষ বললেন, এবার মুক্তির ছড়াছড়ি। কিন্তু শুধু সেটাই তো কাম্য নয়। মুক্তি তিনি দিতে পারেন ঠিকই, কিন্তু ভক্তি দিতেই কাতর হন। বড় কথা হচ্ছে, দেহে থেকে আধ্যাত্মিক জগতে প্রতিষ্ঠা। এই দেহে থেকে ভগবৎ-আস্বাদন যারা করতে চায়, যারা ভগবানকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তাদের ভক্তি-বিশ্বাসের আলাদা রূপ হবে।

৩৪।। ধর্মজীবনে শুচিতার প্রয়োজন আছে, শারীরিক দিক থেকেও, আবার মানসিক দিক থেকেও। চারিদিকে এতরকম রোগবীজাণু ছড়িয়ে রয়েছে যে, শুচিতা না রাখলে শরীর অসুস্থ হয়ে যেতে পারে। আবার কতকগুলি অশুচি অদিব্য লোকের স্পর্শে আধ্যাত্মিক ক্ষতি হয়ে যায়, এদের স্পন্দন মনকে নিম্নমুখী ক'রে দেয়। সেরকম স্পর্শ একটু বাঁচিয়ে চলতে হয়। তাই ব'লে শুচিতার নাম ক'রে যেন শুচিবাই না এসে পড়ে, যেন শুচিতা রাখতে গিয়ে কোনও রকম ক্ষুদ্রতা না এসে পড়ে। আমাদের ঠাকুর শুচিতাকে নিয়েছিলেন সাধনার অঙ্গ ব'লে, সেখানে শুচিবাই বা ক্ষুদ্রতা ছিল না।

৩৫।। ন্যায়টা এখন ব্যষ্টির মধ্যে সীমিত হয়ে গেছে, আর অন্যায়টা সমষ্টির মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। মানুষের নৈতিক স্তর অত্যন্ত নেমে গেছে। এত বড় একটা দেশ-জোড়া নৈতিক অধঃপতন; দু'চারজনের চেষ্টায় তো আর সমস্ত মোড় ঘোরানো সম্ভব নয়। দু'চারটি সৎমানুষের চেষ্টা আর কতটুকু? তা ছাড়া মানুষের ক্ষমতাই বা কি?

আসলে সবটা নির্ভর করছে চক্রটা যাঁর হাতে তাঁরই ওপর। সুদর্শনচক্রটি যিনি ঘোরাচ্ছেন, তাঁর যখন ইচ্ছা হবে তখনই সম্ভব হবে সব মানুষের মন ঘোরানো। তাই আমাদের করণীয় হচ্ছে নিজেদের তৈরি করা আর ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করা।

নিজেদের যদি আমরা তৈরি করি, পবিত্রভাবে চলি, সদ্‌ভাবে চলি তাহলে প্রতিটি জীবনই হবে আদর্শস্বরূপ এবং তখন সেই আদর্শ-জীবন-গুলির প্রভাবেই অবস্থা কিছু বদলাতে পারে। শুধু লেখালেখি বা বক্তৃতায় এরকম ধরনের অবস্থায় খুব একটা ফল হবে ব'লে তো মনে হয় না। আমাদের নিজেদেরকে তৈরি করতে হবে। সবচেয়ে আগে এটিই দরকার। আর প্রার্থনাও রাখতে হবে—ঠাকুর সকলকে শুভবুদ্ধি দিন।

৩৬।। ন্যায়পথে চাকরির উন্নতি চাইব তাতে দোষ নেই। কিন্তু অন্যায়পথে কিছু পাওয়ার ইচ্ছাটা যেন না থাকে। আসলে আমাদের প্রয়োজনের একটা সীমা ঠিক ক'রে নিতে হবে। মানুষের সাধারণভাবে বাঁচার জন্য প্রয়োজন তিনটি—খাবার, পরনের কাপড়, মাথা গুঁজবার মতো একটুখানি ঠাঁই। তাছাড়া, দরকার অসুখবিসুখে ওষুধ, আর একটু জ্ঞানের আলো। এগুলো যদি মোটামুটি চলে যায়, তাহলে আর অন্যায় পথে বেশি টাকার জন্য কেন তার চাহিদা থাকবে?

৩৭।। এরা কথায় কথায় বলে 'ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র'। কিন্তু আসলে ধর্মনিরপেক্ষ তো হচ্ছে না, হিন্দুধর্ম-বর্জিত হয়ে যাচ্ছে। এটা কখনও একটা

নীতি হতে পারে না। হিন্দুধর্মের মূল সুরই এদেশের মূল সুর। সেই সুর হচ্ছে আধ্যাত্মিকতা। তাই সেটাকে বাদ দিয়ে কোনও নীতিই দাঁড়াতে পারে না। ধর্মনিরপেক্ষতা একটা রাজনৈতিক বুলি মাত্র হয়ে গেছে। ধর্মনিরপেক্ষতার দোহাই দিয়ে ধর্ম-বর্জনের যে নীতি এখন চলছে, তার জন্যই সর্বস্তরে দুর্নীতি ছেয়ে গেছে। দেশটাকে যেন তলায় তলায় খেয়ে যাচ্ছে, একটা বিরাট ধ্বস নেমে যাচ্ছে। নীতিবোধ, ধর্মবোধ চলে যাচ্ছে ব'লেই এই অবস্থা। ওপরে একজন আছেন সে ভয়ও যদি থাকত, পাপ-পুণ্য বোধটা যদি থাকত তা হলেও খানিকটা রক্ষা হ'ত। ওপরে একজন আছেন, যিনি সব দেখছেন, ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করছেন, এটা মানতেই হবে।

আবার একবার পেছন ফিরে তাকাতে হবে আমাদের ইতিহাসের দিকে। বৈদিক ঋষিদের বাণী—শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ—আমাদের নতুন ক'রে মনে করতে হবে। ধর্মের পথে, আধ্যাত্মিকতার পথে নতুন ক'রে চলতে হবে। তবে ধর্মের নামে ভণ্ডামি—সে না; সত্যিকার ধর্মকে অবলম্বন করতে হবে।

৩৮।। দেশটা আমাদের—এই বোধ যতক্ষণ না প্রত্যেকটি মানুষের মনে জাগছে ততক্ষণ দেশের এই অবস্থার উন্নতি কখনওই সম্ভব নয়। ছোটবেলা থেকেই ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই বোধটা জাগাতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশে তো তা হয় না। মা বাপের মধ্যেই সে-বোধ নেই, তো ছেলেমেয়েদের মধ্যে কি ক'রে হবে?

ঠাকুর ওদেশের একটা গল্প আমাদের বলতেন—একটা ট্রেনের কামরায় একটি মা তার ছেলের সঙ্গে যাচ্ছে। ছোট ছেলে টফি খাচ্ছে, লেবু খাচ্ছে আর খোসাগুলো চলন্ত ট্রেনের জানলা গলিয়ে গলিয়ে ফেলছে। ট্রেন যখন একটা প্ল্যাটফর্মের কাছে এসেছে, তখন মা'টি তার ছেলেকে খুব

মিষ্টি ক'রে বলল, বাবা তোমার প্ল্যাটফর্ম আসছে, খোসা ফেলে সেটি নোংরা কোরো না যেন। ছেলে সঙ্গে সঙ্গে হাত গুটিয়ে খাওয়া বন্ধ ক'রে বসে পড়ল। ছোট থেকেই মা তাকে বোঝাচ্ছে যে, প্ল্যাটফর্মটি তার নিজের। আমাদের দেশে এই বোধ বা sense-টা জাগানোই প্রথম দরকার।

৩৯।। প্রশ্ন ঃ ইষ্টলাভ বলতে কি বোঝায়?

উত্তর ঃ ইষ্টলাভ বলতে যা বোঝায় সেটা সবারই ক্ষেত্রে একরকম নয়। কারো হয়তো ইষ্ট-দর্শন বা ভগবৎ-দর্শন হলেই ইষ্টলাভ হ'ল। আবার কেউ হয়তো ইষ্টের সঙ্গে একীভূত হতে চায়। ইষ্টকে কেউ নানানভাবে আস্বাদন করতে চায়। যেমন, কেউ দুধের কথা শুনে দুধ কেমন তা দেখতে চায়। আবার কেউ সেই দুধ খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হয়। তাই অনেক রকমের আছে। আর কৃপার দর্শন এমন একটা কিছু যা সবাইকে একরকম বলা যায় না। যে পাবে সে নিজেই বুঝবে। তার অন্তরটা ভ'রে যায়।

আবার তার কাছে যে যাবে সেও তার কিছু বুঝবে। আগুনের কাছে গেলে যেমন তাপ লাগে, তেমনি যার ইষ্টলাভ ঠিক-ঠিক হয়েছে তার কাছে গেলেই কিছুটা অনুভূতি হয়। তবে উপনিষদের কথায় বলা যায় যে, যেদিন ইষ্টলাভ হবে, সেদিন হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হয়ে যাবে, সর্বসংশয় মুক্ত হয়ে যাবে। তখন সব প্রশ্নের, সব সন্দেহের নিরসন হয়ে যাবে।

৪০।। প্রশ্ন ঃ সদ্‌গুরু মানে শুধু যাঁরা গুরুরূপে বিখ্যাত হয়েছেন তাঁরাই কি?

উত্তর ঃ তা কখনওই নয়। একজনের গুরু সৎ অন্য একজনের গুরু অসৎ, এ কখনওই ঠিক নয়। সচ্চিদানন্দই গুরু। শিষ্যের পক্ষে তার গুরুই হচ্ছেন সাক্ষাৎ ভগবান। এ নিয়ে হালিশহরের সত্যানন্দ সরস্বতী বেশ লিখেছেন তাঁর 'গুরুপূর্ণিমা' বইতে। গুরুর ধ্যান 'ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্তিম্' এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা ক'রে উনি দেখিয়েছেন যে, গুরু

যেমনই হোন না কেন, গুরুর ধ্যান সব গুরুর জন্যই এক। কারও গুরু বৃদ্ধ কি যুবা, গৌরবর্ণ কি কৃষ্ণবর্ণ তাতে কিছু যায় আসে না। গুরুর ধ্যানে কিন্তু রূপচিন্তা সবারই এক। কারণ, সদ্ গুরুর ধ্যানে গুরুর যে বর্ণনা আছে তাতে সদ্ গুরু আর ব্রহ্ম এক। সৎ শব্দটা গুরুর বিশেষণ নয়, সৎ মানে যা নিত্য অর্থাৎ ব্রহ্ম। সদ্ গুরু একটাই কথা। কাজেই শিষ্যের দিক থেকে গুরুকরণের পর গুরু সাক্ষাৎ ভগবান। সেখানে আর তো অসৎ-সৎ-এর প্রশ্নই নেই।

৪১।। প্রশ্ন ঃ সদ্‌গুরু হওয়াটা কি শিষ্যের বিশ্বাসের উপর নির্ভর?

উত্তর ঃ দেখ, আমাদের ঠাকুর আমাদের কাছে সাক্ষাৎ ভগবান। অবশ্য তিনি যে ভগবান সেকথা বললেও বটে, না বললেও বটে। কিন্তু সবাই কি তাঁকে ব্রহ্মস্বরূপ সদ্‌গুরু বলে নিতে পারলো? যারা তাঁকে সদ্ গুরু ব'লে বিশ্বাস ভক্তি করবে না, তাদের কাছে তিনি তো প্রকাশিত হবেন না। আসলে গুরুশক্তির আবির্ভাব অনেকটাই নির্ভর করছে শিষ্যের বিশ্বাস-ভক্তির ওপর।

একটি শালগ্রামশিলা—ভক্তি বিশ্বাস নিয়ে নারায়ণজ্ঞানে পূজো করতে করতে সেটি নারায়ণশিলা হয়ে গেল। অর্থাৎ তার ভেতর সেই সত্তাটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। তাঁর আবির্ভাবের জন্য একটি, দুটি বা অনেকজনের সমষ্টি-আকুলতা এবং ভক্তি-বিশ্বাস প্রয়োজন। সাধারণভাবে শিষ্য বা ভক্তে বিশ্বাসের ওপর অনেকখানি নির্ভর করে তাঁর সদ্‌গুরু হওয়াটা। শিষ্যের যদি গভীর বিশ্বাস হয় তবে যে কোনও আধারেই গুরুশক্তির অবতরণ হবে। এর প্রমাণ আমরা অনেকক্ষেত্রেই পাই। চাষী-শিষ্যের বিশ্বাস-ভক্তির জোরে, তার গুরুর চরণামৃত খেয়ে, একজন্য সাপে-কাটা মরা মানুষ বেঁচে উঠল, অথচ আর এক ক্ষেত্রে গুরু নিজে দিলেন তাতে ফল হ'ল না।

অবশ্য ভগবান যখন নেমে আসেন, তিনি ভক্তের ভক্তি-বিশ্বাসের অপেক্ষা না রেখেও প্রকাশিত হতে পারেন। কিন্তু ভক্তশিষ্যদের ভালবাসার আকুলতা ছাড়া তাঁরও মন ভরে না। আমাদের ঠাকুর সত্যানন্দদেব তো স্বয়ং ভগবান। কিন্তু তিনিও অপেক্ষা করছিলেন ভক্তের বিশ্বাস ও ভালবাসা জমাট বাঁধার জন্য। আটত্রিশ-উনচল্লিশ বছর বয়সে যখন তিনি প্রকট হলেন, তখন স্থানে স্থানে ভক্তকুল তাঁর শরণ নেবার জন্য তৈরি হচ্ছে।

৪২।। প্রশ্ন ঃ শিষ্যের পক্ষে গুরুকে বিচার করার মানদণ্ড কী হবে?

উত্তর ঃ এই মানদণ্ডটা হচ্ছে ভক্তি-বিশ্বাস আর ভালবাসা। শিষ্য দেখবে কার কাছে গিয়ে তার বুকটা ভ'রে যায়, কে তাকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করছে। যার কাছে গিয়ে বুকটা ভ'রে যাবে, একটা গভীর আকর্ষণ অনুভব করবে—বুঝবে ইনিই আমার গুরু। তা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। যাঁরাই গুরুপদবীতে রয়েছেন জগতে, সবাই সদ্‌গুরু। তবে আমার জন্যে ইনিই সদ্‌গুরু—এটা শিষ্যকেই বুঝে নিতে হবে।

কিন্তু যে মুহূর্তে গুরুকরণ হয়ে গেল, তারপর আর বিচার চলবে না। আবার দেখ, একজন গুরুর কাছে সবারই হয় না। একজনের কাছে কিছু লোক হয়তো পেল, কিন্তু অন্য লোকেরা কিছুই পেল না। তার মানে এ নয় যে, তিনি সদ্‌গুরু নন্। তিনি সদ্‌গুরু কিনা এ বিচার করার শক্তি তো সাধারণ মানুষের নেই। একজনের যোগ্যতা বিচার করতে গেলে, যে বিচার করবে তাকে তো তারও ঊর্ধ্বে উঠতে হবে। কিন্তু তা তো হয় না। আসলে তিনি সদ্‌গুরু ঠিকই, কিন্তু সবারই ভক্তি-বিশ্বাস তাঁর প্রতি ঠিক নেই বলেই তারা তাঁর কাছে কিছু পায় না। তাই গুরুকরণের আগে এটা যাচাই ক'রে দেখা খুবই দরকার যে, আমি তাঁকে ঠিক ভক্তি করতে পারব কিনা।

৪৩।। প্রশ্ন ঃ ভক্তি কি ক'রে বাড়ান যায়?

উত্তর ঃ ভক্তি বাড়াতে গেলে তাঁরই চরণে প্রার্থনা করতে হবে—ঠাকুর, তোমার প্রতি ভক্তিটি দিন দিন বাড়িয়ে দাও। তিনিই জানেন কি ক'রে তিনি ভক্তি জাগাবেন। যে নাক ডুবিয়ে সংসার করছিল দেখা গেল, ঠাকুর হঠাৎ একটা আঘাত দিয়ে তাকে বুঝিয়ে দিলেন সংসার অসার। আবার জ্ঞানপন্থী সাধক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে ঘন ঘন দর্শন দিয়ে ভক্ত ক'রে নিলেন।

কাজেই তাঁরই কৃপায় যাদের ভেতর ভক্তি জেগেছে, তাদের আবার তাঁরই কাছে প্রার্থনা করতে হবে—ঠাকুর, যতটা সম্ভব তুমিই আমার ভক্তি বাড়িয়ে দাও। এ ছাড়া ভক্তিপথের process-এ একটা মস্ত বড় সহায় হচ্ছে 'নাম'। যতটা সম্ভব নামজপ বাড়িয়ে যেতে হবে। ভক্তিটি বজায় রাখতে বা বাড়াতে গেলে তাঁর কাছে প্রার্থনা আর নাম ছাড়া কোনও উপায়ই নেই।

ভক্তি জিনিসটি এমন যা আমাদের হাতের মুঠোতে আছে, আবার নেই। ভগবান যখন অন্তরে আছেন তখন ভক্তিও অন্তরেই আছে। কিন্তু তার প্রকাশটি করতে গেলে ভগবানেরই শরণ নিতে হবে। কারণ, তাঁর কৃপা ভিন্ন শুধু নিজের চেষ্টায় ভক্তিলাভ হয় না। তাই তাঁর কাছেই প্রার্থনা করতে হবে, ভক্তিলাভের জন্য এবং ভক্তি বাড়ানোর জন্য।

৪৪।। প্রশ্ন ঃ কি ক'রে বুঝবো ঠাকুরের কৃপা হচ্ছে—এক এক সময় মনে হয়, কিছুই তো হচ্ছে না?

উত্তর ঃ ঠাকুরের কৃপা তো এমনি দেখা যায় না। সূক্ষ্মভাবে সেটি কাজ করে। আমাদের ঠাকুর সত্যানন্দ হট ক'রে একটা বিশেষ কিছু ক'রে দিয়ে মনটাকে তুলে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। Slow process-এর কথা ঠাকুর বার বার বলেছেন। স্থূলভাবে তো কৃপা ধরা যায় না। ক্ষিদে পেয়েছে, ভাত খেলাম কি মিষ্টি খেলাম, পেট ভরে গেল—বুঝলাম।

এটা তো সেরকম নয়। লক্ষ্য করতে হবে মনের উন্নতি হচ্ছে কিনা। একটা diary বা দিনলিপি করবে। মনের গতি অনুযায়ী একটা চিহ্ন ক'রে failure-গুলি note ক'রে রাখবে। মনের নিম্নগতি, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি কতটা কমল কি বাড়ল সেটা দেখবে। মাসে মাসে দেখবে কতটা progress বা অগ্রগতি হল। আর, diary অন্য কেউ দেখবে না। Diary শুধু গুরু ইষ্টের কাছে খোলা থাকবে আর খোলা থাকবে হৃদিস্থিত হৃষীকেশের কাছে।

ঠাকুরের দিকে এগোনো মানে হচ্ছে—মনের শুদ্ধতা-অর্জন, সূক্ষ্মতা-অর্জন। সেটা ভেতরে হয়। বাইরে থেকে দেখে ঠিক কি বোঝা যায়? তাই চেষ্টা ক'রে যেতে হবে। 'হতেই হবে'—এই মনের জোর নিয়ে এগিয়ে গেলে আস্তে আস্তে ঠিকই হবে।

৪৫।। প্রশ্ন ঃ এমনি-চৈতন্য আর কূটস্থ-চৈতন্যর তফাৎ কি?

উত্তর ঃ ঘটে ঘটে যে চেতনসত্তাটি ছড়িয়ে রয়েছে এবং যেখানে যেখানে চৈতন্যসত্তার প্রকাশ, সে-সবই চৈতন্য। কিন্তু সেই সত্তাই যখন এক নির্বিকার, অচল অটল, অক্ষর অবস্থায় বিরাজ করছেন তখন তিনিই সেই পরমাত্মরূপ কূটস্থ-চৈতন্য। হৃদিস্থিত হৃষীকেশই একভাবে ঘটে ঘটে চৈতন্যরূপ, আবার একভাবে কূটস্থ-চৈতন্যস্বরূপ হয়ে রয়েছেন। গীতায় আছে 'কূটস্থমচলং ধ্রুবম্' 'কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে'। আমাদের ভেতর এই দুটিই আছে—জীবাত্মা-পরমাত্মা রূপে।

৪৬।। প্রশ্ন ঃ সাধুদের শরীরে এত অসুখ-বিসুখ হয় কেন?

উত্তর ঃ প্রথমতঃ দেখ, সাধুদের বেশির-ভাগ বসে-থাকা জপ ধ্যান নিয়ে আর ঈশ্বর-চিন্তা ইত্যাদি নিয়ে। এখন ডাক্তাররা বলে, সব সময় বসে জপ-ধ্যান করলে গ্যাস্ট্রিক আর সুগার হবেই। আবার বেশি চিন্তারাজ্যে বা ভাবরাজ্যে থাকার ফলে হজমটা ঠিক হয় না। দেখা যাচ্ছে এটা ঠিকই। গ্যাস্ট্রিক আর সুগার সাধুদের মধ্যে খুবই। তারপর এটাও ঠিক যে, সাধুদের

এক জন্মেই পূর্ব-পূর্ব-জন্মার্জিত সব কর্মফল ভোগ হয়ে যায়। তাই সেটা শরীরের ওপর দিয়েই যায়। আর তাছাড়া আমাদের ঠাকুর বলতেন যে, যুগের ভোগের বা সমাজের ভোগের একটা অংশ সাধুদের নিতে হয়। এখন, সমাজে যখন রয়েছি তখন সমাজের কাছে কিছু দান নিতেই হয় জীবন ধারণের নিত্যপ্রয়োজন মেটাতে। তাই সমাজের ভোগেরও কিছুটা নিতে হয়। নইলে যে ঋণ থেকে যাবে। কিন্তু ঠাকুর তো তা হতে দেবেন না। সাধুরা তাদের জন্য আলাদা করে কিছু কল্যাণ প্রার্থনা করুক আর নাই করুক, সমাজের ভোগ এবং যুগের ভোগ তাদের কিছু নিতেই হবে। তাই সাধুদের শরীরে এত অসুখ-বিসুখ, এত কষ্ট।

৪৭।। প্রশ্ন ঃ জীবনের মূল্যায়নটা কিসে হয়—সুখে না দুঃখে?

উত্তর ঃ দেখ, সুখের প্রাচুর্যেও শান্তি নেই, আবার দুঃখের আতিশয্যেও শান্তি নেই। যতক্ষণ ভোগের ইচ্ছা বা বাসনা রয়েছে ততক্ষণ বেশি দুঃখে এসে পড়ে ক্ষোভ আর অসন্তোষ, আর বেশি সুখেও অতৃপ্তিটা বেড়ে যায়। যতক্ষণ না একটা বিরাট আদর্শ সামনে থাকছে ঠিক মূল্যায়নটা হয় না। সে চাইছে সুখ, অথচ দুঃখটা তার ভাগ্যগুণে এসে পড়ছে। তার ফলে তার মনে ক্ষোভ আসছে। তবে দুঃখের অনেক সুফল আছে। দুঃখ মানুষের চাহিদাকে কমিয়ে দেয়, অল্পতেই সন্তুষ্ট হতে শেখায়। একটি দরিদ্র ভিখারি চার-আনা পেলেই কত খুশি, প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করবে। কিন্তু একটি ধনীর কাছে এ চার-আনার কোনও মূল্যই নেই। একটা নির্জন প্রাণীহীন মরুভূমিতে একটা কাকের ডাকও প্রাণে আনন্দের সাড়া জাগায়। একটা গভীর অন্ধকার কূপে যে পড়ে রয়েছে তার জন্য শুধু একটা দেশলাই-এর কাঠির আলোই যথেষ্ট। দুঃখের মধ্যে থাকে ত্যাগের শিক্ষা। তাই দুঃখটাই মহৎ হয়ে যায় যদি সেটা কেউ স্বেচ্ছায় বরণ করে নেয়। অবশ্য একটা বড় উদ্দেশ্য থাকা চাই। সেটা যে আধ্যাত্মিকই হতে হবে তার কোনও মানে

নেই। যে-কোনও একটা বড় উদ্দেশ্যের জন্য দুঃখকে বরণ করে নিলে সেটা মহৎ হতে পারে; যেমন, দেশের জন্য স্বার্থবোধহীন ত্যাগ।

৪৮।। প্রশ্ন ঃ ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠি কি?

উত্তর ঃ ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠি করা সত্যিই মুশকিল, কারণ, ন্যায়-অন্যায়ের বোধটা হচ্ছে relative। সমাজে এক এক স্তরের লোক এক এক ভাবে ন্যায়-অন্যায়ের ব্যাখ্যা করে।

কিন্তু কতকগুলো জিনিস আছে যেগুলো সাধারণজ্ঞানেই বোঝা যায়। যেমন ধর, রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ একজন আর-একজনকে ছোরা মারল, একদল ব্যবসাদার বাজার থেকে বেবিফুড উধাও করে দিয়ে দাম বাড়িয়ে বিক্রি করল, এগুলো যে অন্যায় তা সাধারণজ্ঞানেই বোঝা যায়। ওষুধে ভেজাল, খাবারে ভেজাল, এসব ক'রে অনৈতিকভাবে লাভ করছে। এসব যে অন্যায় তা আমরা সহজেই বুঝতে পারি।

নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থে আর-পাঁচজনের ক্ষতি করাটা যে নীতিবিরুদ্ধ সেটা সকলেই বোঝে। আমার সন্তান যদি ক্ষুধায় কাঁদে তখন আমার যেমন লাগে, অপরের সন্তানের ক্ষুধার চিৎকারও আমার বুকে সমানভাবে বাজবে, এটাই নীতিবোধ।

সেই বোধ সেই চেতনা, আধ্যাত্মিকতা এবং ধর্মের ভেতর থেকেই আসবে। বিশেষ ক'রে আমাদের দেশে ধর্মের সঙ্গে নীতির একটা গভীর সম্পর্ক আছে। ধর্মবিশ্বাসটি চলে যাওয়াতেই এত অন্যায়ের প্রসার। একটি ঊর্ধ্বতম সত্তার প্রতি গভীর বিশ্বাস রাখা উচিত যেখানে সমস্ত নীতির মান নির্ধারিত হচ্ছে। সে বিশ্বাস অন্তরে দৃঢ় হলে আপনিই মানুষ ন্যায়পথে চলবে।

ছড়ানো মুক্তো : তৃতীয় খণ্ড

প্রকাশকের নিবেদন

(প্রথম প্রকাশ)

আমাদের মায়ের একান্নতম শুভ জন্মদিবস উপলক্ষে মা'র শ্রীমুখ নিঃসৃত বেদবাণীর কিছু সঞ্চয়ন এই তৃতীয় খণ্ডটিতে প্রকাশিত হল। হৃদয় দিয়েই মানুষের মর্মে পৌঁছানো যায়। অনুভূতিতে যাঁরা মহৎ ও অসাধারণ, তাঁদের পক্ষেই সম্ভব মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করা, নাড়া দেওয়া এবং শুভ্র আলোয় উদ্ভাসিত করা। আমাদের একান্ত প্রার্থনা—এই দিব্যবাণীর অন্তর্নিহিত শক্তি মানুষের বুদ্ধিকে শুভপথে পরিচালিত ক'রে, তাকে পরম প্রাপ্তির লক্ষ্যে পৌঁছতে সহায়তা করুক।

শ্রীসত্যানন্দার্পণমস্তু।

৭ শ্রাবণ, ১৩৮৫

জুলাই, ১৯৭৮

ছড়ানো মুক্তো

(৩য় খণ্ড)

১।। ভগবৎ-চরণে সমর্পিত যে প্রসাদী ব্যক্তিত্ব—তার অসাধারণ শক্তি।

২।। ধর্মকে ভোজবাজির আওতারে ফেলো না। অনেকের উদ্দেশ্যই থাকে একটু ভোজবাজি দেখিয়ে আকৃষ্ট করি। আবার লোকেও চায় যে, সাধুরা সিদ্ধাই শক্তি বা অলৌকিক কিছু একটা দেখিয়ে দিক্ তবেই মানব, না হলেই বিশ্বাস চলে যাবে। ধর্মের কাছে অনেকেই এটা আশা করে, কিন্তু এটা তো ঠিক নয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সিদ্ধাইকে কখনোই স্বীকৃতি দেননি। স্বামীজিরাও ক্বচিৎ কখনও বিশেষ প্রয়োজনে দেখিয়েছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সংবরণ ক'রে নিয়েছেন সেই শক্তি। জানবে সিদ্ধাই দ্বারা যা পাওয়া যায়, তা সব সময় শুভজনক হয় না, চিরন্তনীও হয় না। ভগবৎকৃপায় যা পাওয়া যায় তাই চিরন্তনী। আর সিদ্ধাইয়ের পথে ভগবৎলাভও হয় না। আমাদের ঠাকুর তাই সিদ্ধাই-এর প্রকাশ কখনও করতেন না। সিদ্ধাইকে প্রশ্রয়ও দিতেন না।

৩।। দশ জায়গায় ঘুরলে কিছুই পাওয়া যায় না। এটা ধরতে ওটা ফসকায়, ওটা ধরতে এটা ফসকায়। কাজেই যদি কিছু পেতে চাও, এক জায়গায় নিষ্ঠা নিয়ে পড়ে থাকতে হবে।

৪।। নিত্যদিনের বিলাসের মাঝে যারা গা ভাসায় তারা চোখের জলের মর্ম জানে না। পল্লীগ্রামে চোখের জলটা বেশি। হরিনাম শুনলে চোখের জলে ভাসে। গ্রামের দিকেই বেশির ভাগ দেখা যায় চোখের জলের মর্মানুভূতিটা আছে। তাই দুঃখে বা আনন্দে দুটোতেই তারা চোখের জল ফেলে। কলকাতায় বা দিল্লিতে এতটা নেই। শহরের জীবনে একটা কৃত্রিমতার ভাব থাকে। তারা বাস্তবটুকুকে নিয়েই থাকে। অত্যধিক

বিলাসিতার স্রোতে গা ভাসায় যারা, তাদের কোনও রকম অনুভূতিপ্রবণতাই থাকে না।

ওদের দেশে এই কৃত্রিমতা বা artificial ভাবটা আরও বেশি। বার্ণার্ড শ' মারা গেলেন। তাঁর স্ত্রী করিডোরে বেরিয়ে এসে হাজার হাজার অপেক্ষারত মানুষের সামনে হ্যাট খুলে জানিয়ে দিলেন, শ' মারা গেছেন অমুক সময়ে। সবাই হ্যাট্ খুলে শ্রদ্ধা জানিয়ে ফিরে গেল। 'ওগো তুমি কোথায় চলে গেলে গো' বলে চিৎকার করে কেঁদে উঠল না। আমাদের গ্রাম্য জীবনে এই সাজানো ভাব, aftificial ভাবটা নেই। সহজ স্বাভাবিক একটা ভাবাবেগ আছে। এই ভাবাবেগকে যদি ঈশ্বরের জন্য মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া যায় তাহলে সহজে এগোতে পারা যায়।

৫।। ছেলেমেয়েদের মধ্যে ছোট থেকে ধর্মের ভাব জাগানো দরকার। ধর্মকে স্কুল কলেজের পড়া থেকে উঠিয়ে দিলে ধর্মভাব সৎভাব জাগবে কেমন করে? অনেকে ভাবে—ধর্ম করলেই সাধু হয়ে যাবে। সাধু হওয়া কি অত সোজা? মা বাবারও বলিহারি! ছেলে চোর ডাকাত হবে ক্ষতি নাই, কালোবাজারি করবে,অসৎ হবে ক্ষতি নাই, কিন্তু সাধু হয়ে যাবে সেটাই যত ভয়ের কারণ।

একটি মা আশ্রমে আসেন। তাঁর নাতি ধর্মমুখী, আমার কাছে মাঝে মাঝে আসে। তো সেই মা'টি একদিন আমার কাছে এসে বললেন আপনি না কি ছেলেদের সাধু হতে বলেন! আমি বললাম—সাধু হতে বলব না তো কি অসাধু হতে বলব? তবে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হতে বলি নাই। সন্ন্যাসী হওয়াটা অত সহজ নয়। তবে সাধু সবাই হতে পারে। সাধু হওয়া মানে সদ্‌ভাবে চলা। সেটা সবারই উচিত এবং সৎ হবার সংস্কারটা ছোটবেলা থেকেই গড়ে তুলতে হবে। মা বাবারও উচিত ছেলেদের সেই শিক্ষাই দেওয়া।

৬।। সন্ন্যাসী হয়ত সকলে হতে পারে না, কিন্তু সাধু সকলেই হতে পারে। সাধু হতে তো কোন বাধা নেই। সংসারে থেকে সদ্‌ভাবে চলবার চেষ্টা করবে। কারও মনে কষ্ট দেবে না, কারও চুরি করবে না, যদি পার একটু কারও উপকার করারই চেষ্টা করবে। আর কিছু না পারলেও অন্ততঃ মানুষের প্রতি মিষ্টি ব্যবহারটা রাখবে, সহানুভূতি রাখবে—এতে তো কোন বাধা নেই।

৭।। সদ্‌গুরুর কাছে দীক্ষা হলেই গুরু ইষ্টের সঙ্গে একটা যোগ হয়ে যায়। তবে সেখানে দেহের নৈকট্যটাই বড় নয়। অন্তরের যোগটাই বড়। তোমার কাজ তুমি ক'রে যাও, গুরুর কাজ গুরু করছেন। পবিত্রতা আর নাম জপ—এ দুটি ঠিক রেখে যাও।

৮।। জীবনটাকে করতে হবে একটি নিটোল পাত্র। স্বর্ণময় পাত্র। তাঁর করুণা ধরবার জন্যে পাত্র, সেটায় কোনও ছিদ্র থাকলে চলবে না। যেমন, দেখ এই হাতের অঞ্জলি। এর আঙুলের মাঝে যদি ফাঁক থাকে তাহলে এতে কিছু ধরা যায় না। হাতের ফাঁক দিয়ে গলে যাবে। কৃপাবারি ধরতে গেলে নিটোল আধার হওয়া চাই।

৯।। জীবনে ওঠা নামা থাকবেই। ঢেউ থিতোলে বা থামলে নাম করব—এই বলে বসে থাকলে তো হবে না। ঢেউএর মধ্যেই নাম ক'রে যেতে হবে। সাগরের ঢেউয়ের চেয়েও এ ঢেউ বেশি। এটি ভবসাগর। ভবসাগরের ঢেউয়ের ধাক্কা আরও বেশি। নামের দ্বারাই ঢেউ কাটবে। রামকৃষ্ণ নাম সুখে দুঃখে সমান ভাবে ধরে রাখতে হবে। সুখে রামকৃষ্ণ, দুখে রামকৃষ্ণ। নামকে ছাড়লে চলবে না। নামকে ধরে রাখতে হবে সব অবস্থায়।

সংসারে অশান্তি লেগেই আছে। ছেলে মনের মত না হলে মায়ের অশান্তি স্বাভাবিক। কিন্তু ছেলের জন্য অশান্তি হলেও কতকটা ছেড়ে দিতে হবে। ভাববে—তারও তো কর্মফল আছে। সে তোমার ছেলে ঠিকই কিন্তু

তার নিজস্ব কর্মফলও তো আছে। সেটা তো সে ভুগবেই। খানিকটা গার্ড দাও, খানিকটা ছেড়ে দাও। ছেলেকে মানুষ ক'রে দিয়েছ, বড় ক'রে দিয়েছ, মেয়েদের বিয়ে থা দিয়েছ—তারপর আর কেন? তারপর তাদের ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দাও। সব ছেলে তো সমান হয় না। তাদের সংস্কার আছে, কর্মফল আছে। সবাই তো নিজের সংস্কার নিয়ে আসে। কাজেই তারই মধ্যে একটু গুছিয়ে নিয়ে, খানিকটা ছেড়ে দিয়ে, একটু ঠাকুরের কাছে গিয়ে বসে থাকবে চুপচাপ। আর সব সময় নাম ক'রে যাও। খুব নাম ক'রে যাও।

১০।। যে যেখানেই থাকো, মনে প্রাণে পবিত্র হবার চেষ্টা করবে। মনে প্রাণে পবিত্র হতে পারলে গুরুর সান্নিধ্যেই থাকা হবে। ঠিকঠিক পবিত্র হয়ে তাঁর দিকে মনটা রাখতে পারাই সত্যিকার তাঁর কাছে থাকা।

১১।। ভাল হওয়া মানে মনে প্রাণে সৎ হওয়া।

১২।। নামের পেছনে একটি বস্তু আছে, একটি solid বস্তু বা substance আছে। স্থূল জগতে যেমন ইঁট কাঠ প্রভৃতি প্রত্যেক বস্তুর নাম এবং solid অস্তিত্ব দুইই আছে, তেমনি আধ্যাত্মিক জগতেও নাম বললেই তার পেছনে যে নামী, তার অস্তিত্বটাও রয়েছে। আগে বস্তু তবে তো নাম। স্থূল জগতেই দেখ—ছেলে হল, তারপর তার একটা নাম দেওয়া হল। বস্তুটিকে হাতে পেয়ে নাম দিই।

স্থূল জগতে বস্তুর সঙ্গে তার নামের ঘনিষ্ঠ যোগটা আগেই হয়ে যায় তাই বুঝতে কষ্ট হয় না। কিন্তু সূক্ষ্ম জগতে বস্তুটিকে দেখতে পাই না বলে অসুবিধা হয়। সূক্ষ্ম জগতে আগে নামকে ধরে এগিয়ে যেতে হয়। নামীর সত্তাটি প্রথমেই ধারণায় আসে না। কাজেই খুবই অসুবিধা হয়।

কিন্তু বিশ্বাস আর চেষ্টাটি রেখে যেতে হবে। এক্ষেত্রে ভালবাসাটা খুবই কঠিন। গুরু ইষ্টনাম দিলেন। কিন্তু নামীকে হাতের কাছে তো পাচ্ছি

না। কাজেই নামের মাধ্যমেই ভালবাসাটা আনতে হবে। নাম করছি পাখিপড়ার মত, তার কারণ, পেছনের বস্তুসত্তাটির ধারণা নেই। বিশ্বাসটি আনতে হবে সর্বপ্রথম এবং ধীরে ধীরে ভালবাসাটা বাড়াতে হবে নামীর প্রতি। —নাম করতে করতেই এটা হবে।

১৩।। তিনি ভক্তের, ভক্ত তাঁর। এ সম্পর্ক জগতের সব সম্পর্কের চেয়ে নিত্য এবং চিরন্তন। সংসারের মধ্যে তিনি ভক্তদের রেখে যেমন নানা অবস্থায় ফেলে পরীক্ষা করেন ভক্তির, তেমনি সংসারকে ধন্য করার সুযোগও দেন। তাই ভয় পাবার কিছু নেই, বিশেষ করে যারা ভগবানকে গুরু রূপে, জীবন্ত জাগ্রত রূপে পেয়েছে, তারা আরও বেশি ভাগ্যবান, তাদের রক্ষা তাঁকে করতেই হবে। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক— সব বিপদ থেকে তিনি রক্ষা করবেন আমাদের।

আমাদের কর্তব্য শুধু তাঁকে নিত্য দিনের স্মরণ-সাথী করে রাখা। আর চেষ্টা করা তাঁর আদেশগুলি পালন করে যাওয়ার। এ যুগ রামকৃষ্ণ-সত্যানন্দের যুগ। এযুগে তাঁর কৃপা সব যুগের চেয়ে বেশি। তিনি তো জানছেন এ যুগের মানুষ বড় অসহায়, তাই তাঁর কৃপার দরজা সর্বদা তাদের জন্য উন্মুক্ত। আমাদের প্রতিটি কথা তিনি কান পেতে শুনছেন। আমাদের হাত ধরে আছেন।

১৪।। মানুষকে যা দেবে তা হারিয়ে যেতে পারে কিন্তু ভগবানকে যা দেবে তা চিরন্তন হবে। ভগবানের দরবারে যে গান ভেট দেবে তা সার্থক হবে। সাধারণতঃ মনে হয়—এই ছোট্ট আশ্রমের চার দেওয়ালের ভেতর গান গেয়ে কি হবে! এখানে কেই বা গান শুনছে। বাইরে বড় বড় আসরে শত সহস্র শ্রোতাদের মাঝে গান পরিবেশন করলে তার একটা মানে আছে। কিন্তু এইখানে এই ঠাকুরের চরণে বসে যারা গান গেয়ে যায়, তারা তাঁর কৃপাতেই সব পেয়ে যায়।

১৫।। ডাক্তার তাকেই বলবো যে রোগীর কাছে দেবদূতের মত এসে দাঁড়াবে, যাকে দেখলেই রোগীর মনে হবে তার অর্ধেক রোগ ভাল হয়ে গেছে, তার কথায় থাকবে আশ্বাস, রোগীকে সে ভরসা দেবে, শান্তি দেবে। মরণ বাঁচন তো ঠাকুরের হাতে। ডাক্তারের কখনও উচিত নয় রোগীকে হতাশ করা বা তার প্রতি অবহেলার ভাব দেখানো।

শুধু গুচ্ছের বড় বড় উপাধি হলেই যে ভাল ডাক্তার হবে তার কোনও মানে নেই। অভিজ্ঞতাটাই আসল। বড় বড় সব পাশ থাকলে আর ঝুড়ি ঝুড়ি উপাধি থাকলে তার ফী-টা হয়ে যায় দশগুণ। তখন সাধারণ মানুষ ক'জন তাদের নাগাল পাবে? বড় ডাক্তার মানে শুধু কতকগুলো ধনীলোকের ডাক্তার, তা তো নয়। সে যদি সাধারণ মানুষের সেবাতেই না লাগল তবে তার ডাক্তারি পাশ করাটাই বৃথা। ডাক্তারি পাশ ক'রে ডিগ্রী নেওয়ার সময় তাদের অনেকগুলি প্রতিজ্ঞা করতে হয়—বলতে হয়, আমি জনগণের সেবক, জন-কল্যাণটাই হবে আমাদের মূলমন্ত্র অথচ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় বড় বড় উপাধি, ডবল F. R. C. S. এসব হলেই তখন তাদের জনসেবার মন্ত্রটা ভুল হয়ে যায়।

ওদেশে এ্যালবার্ট সোয়াইৎজার নামে একজন খুব বড় ডাক্তার ছিলেন। কুষ্ঠরোগের রিসার্চ করেছিলেন উনি। কিন্তু মুষ্টিমেয় কতকগুলি ধনীলোকের চিকিৎসায় তাঁর জীবনকে আবদ্ধ না রেখে তিনি চলে গেলেন আফ্রিকার অনুন্নত দেশে গরিব রোগীদের চিকিৎসার ভার নিয়ে। সেখানে সারাজীবন দরিদ্র জনসাধারণের সেবা ক'রে শেষে নিজেই কুষ্ঠ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ওদের মাঝেই দেহত্যাগ করলেন। সেবার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার এই উদাহরণটাই হওয়া উচিত ডাক্তারদের আদর্শ।

তবে সবাইকেই তো এতটা করতে বলা যাবে না, বা তা সম্ভবও নয়। তবে sincerely তার নিজের এলাকাটুকুতে সে যদি সেবার ভার

নিয়ে রোগীর চিকিৎসায় আত্মনিয়োগ করে, তাহলেও অনেকখানি করা হবে।

১৬।। মেয়েদের মধ্যে মাতৃত্বটা বীজাকারে রয়ে গেছে। দেখ না, বিয়ের দুচার বছরের মধ্যে ছেলে না হলেই যেন পাগল হয়ে যায় মা হবার জন্যে। মেয়েদের মধ্যে ঐ মাতৃরূপটা দেখার চেষ্টা করবে। মায়েদের মহৎরূপ পবিত্ররূপটি সমাজের কাছে তুলে ধরতে হবে।

ওই যে একটা জাগতিক রূপের দিকে, ভোগমুখিনতার দিকে গতি, সেটি সমাজকে নিম্নদিকে নিয়ে যাচ্ছে। কাব্যে, সাহিত্যে, উপন্যাসেও ঐ একটিই গতি—নিম্নমুখী গতি। মেয়েদের পবিত্র রূপটি কি ফোটানো যায় না সাহিত্যে—যা আমরা পুরোনো দিনের সাহিত্যে কিছু কিছু পেয়েছি? তাদের মাতৃরূপ, কন্যারূপ, ভগ্নীরূপ, এগুলোও তো উপন্যাসের বিষয়বস্তু হতে পারে।

তাই কলমটাকে পবিত্র করতে হবে। সাহিত্যিক সুন্দর সুন্দর লেখা লিখবে। এমন লেখা লিখবে যা মা বাবা ভাই বোন সবাই একসঙ্গে বসে পড়তে পারবে, শুনতে পারবে। রেডিওতে নাটক একসঙ্গে বসে শুনছে বাড়ির সবাই। সেখানে নাট্যকারদের একটু কলমের রাশ টানা দরকার নয় কি? এমন কিছু সেখানে থাকা উচিত নয় যা বাবা মা তাদের ছেলেদের কাছে বসে শুনতে সঙ্কুচিত হবে। আমরা চাই একদল এমন সাহিত্যিক গড়ে উঠুক যারা প্রতিভাকে দিব্যতার মুখে নিয়ে যাবে।

১৭।। ঠাকুর কেন প্রচ্ছন্ন থাকেন জানো? সৌন্দর্য্যের মুক্ত প্রকাশের চেয়ে, যে কোন সৌন্দর্য্যই একটা পাতলা veil-এর ভেতর থেকে প্রকাশিত হলে সেটা যেন আরও আবেদনময় হয়ে ওঠে। ভগবানও তাই প্রকাশিত হন একটা আবরণের মধ্যে দিয়ে। তবে সে আবরণ স্থূল আবরণ হলে হবে না, হতে হবে সূক্ষ্ম মিষ্টি দিব্য আবরণ। বিশ্বপ্রকৃতির দিকে চেয়ে দেখ, তার

মধ্যে যেন ভগবান কথা কইছেন। দেখ, আকাশকে দু'হাত দিয়ে ধরা যায় না, একটা হাল্‌কা বিস্তৃতি মাত্র। কিন্তু তার দিকে চাইলেই ভগবানের স্বর্গরাজ্যের কল্পনা যেন সেখানেই মূর্ত মনে হয়। ছোট্ট একটি ফুল, লতা, পাতা, সবারই মধ্যে যেখানে সৌন্দর্য্যের মিষ্টতা আছে অথচ অহংকারের স্থূলত্ব নেই, সেখানে তার প্রকাশ আবেদনময়। তাই এত ভাল লাগে তাদের। মানুষের মধ্যেও যেখানে সরলতা মিষ্টতা দিব্যতা সেখানে তাঁর প্রকাশ মধুর হতে-মধুরতর হয়ে ওঠে।

১৮।। এখানে যা আছে সেখানে তাই আছে। সেখানে যা আছে এখানে তাই আছে। স্বর্গ আর নরক এখানেই তৈরি হয়ে যায়। ভগবান প্রত্যেকের ভেতরেই আছেন। কিন্তু একটু আবরণের মধ্যে আছেন। আমরা আমাদের নানারকম অশুভ প্রবৃত্তি দিয়ে বাসনা দিয়ে আড়াল টেনে রেখেছি। প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে যদি সৎভাবে চলে তাহলে এই অন্তরেই স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে। এভাবে individually হতে হতে যদি দুটো পাঁচটা লোকও সৎ vibration সৃষ্টি করে তো এখানেই অন্ততঃ আংশিকভাবে একটা স্বর্গরাজ্য গড়ে ওঠে। সমস্ত জগতের অবস্থা ভেবে কি দরকার? আমরা যে পরিবেশটায় আছি সেটুকুকে সুন্দর ক'রে তুললেই তো আমাদের শান্তি।

এই দেখ না, যখন হঠাৎ বৈদ্যুতিক বিপর্যয়ে চারদিক অন্ধকার হয়ে যায় তখন আমরা কি করি? নিজেদের ঘরে একটা প্রদীপ কি মোমবাতি জ্বালি। অন্ততঃ কিছুটা জায়গা তাতে আলো হয়। সমষ্টির অন্ধকার না ঘুচলেও ব্যষ্টির অন্ধকার তো ঘুচবে। আমাদের কাজ তো তাতেই চলে যাবে। কাজেই আমাদের সেই চেষ্টাটি করতে হবে।

ব্যষ্টির ভেতরে ভগবান জাগলে এবং একটি একটি ক'রে ঘরে কল্যাণ-দীপ জ্বললে, দিব্য ভাবের প্রতিষ্ঠা হলে, অন্ততঃ সে স্থানটি আলোকিত হবে। শান্তি আনন্দ পবিত্রতার আলোয় যদি খানিকটা আলো

হয় তবে তাতেই আমাদের অনেকখানি প্রয়োজন মিটবে। যে স্বর্গ অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হ'বে, ওপারে গিয়েও ঠিক সেই স্বর্গটি পাবে।

এই ব্যষ্টির দিব্যতাই ক্রমে ক্রমে পরিণত হবে সমষ্টির দিব্যতায়। তখন আংশিক স্বর্গের পরিধিই একদিন হয়ে উঠবে জগৎ জোড়া।

১৯।। দেখ, রাত্রে একটা ভয় থাকে আতঙ্ক থাকে। যতই প্রদীপ জ্বালো, আলো জ্বালো, তবু ভয় যায় না। রাত্রের অন্ধকারে ভয় করে, কতরকম আশঙ্কা জাগে। মানুষের জ্বালানো আলোতে আঁধারের ভয় কাটে না। কিন্তু ভগবানের আলো জ্বললে অর্থাৎ ভোরের সূর্য উঠলে সে ভয়টা কেটে যায়।

তেমনি, মনের ভেতর অজ্ঞান সংস্কার প্রভৃতির অন্ধকার যতক্ষণ আছে, ভয় আছে। ভগবানের আলো অন্তরে জ্বলে উঠলে, বিশ্বাসের আলো, জ্ঞানের আলো অন্তরে জ্বলে উঠলে আর কোনও ভয়ই থাকে না।

২০।। গৃহী ভক্তরা কম নয়। তারা গৃহের বোঝাও টানছে আবার ঠাকুরের বোঝাও টানছে। আমাদের জানা বহু আশ্রমে, মঠে গৃহী ভক্তরা যা করেছে বা করছে তা অতুলনীয়। তাই তারাও ঠাকুরের বিশেষ কৃপায় ধন্য হয়েছে এবং হবে। আর শুধু দান নয়, তাদের জ্ঞান, ভক্তি, ত্যাগ, তপস্যা এবং উদারতা অনেক ক্ষেত্রে আদর্শ।

২১।। ভগবানের জন্য জ্বালা কি অত সোজা? প্রেম ভালবাসার আগুন জ্বললে অন্য সব আগুন নিভে যায়। কামনা বাসনার আগুন, ক্রোধ, হিংসা, বিদ্বেষের আগুন, ঈর্ষার আগুন সব নিভে যায়। তখন কোনও কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাই থাকে না। ভগবানকে যে ঠিক ঠিক চায়, সে আর কিছুই চায় না। সেটা অত সহজ নয়। সে প্রেমের আগুন জ্বললে সব রসই শুকিয়ে যায়, এক এক সময় চোখের জলও থাকে না। সে অনেক উঁচু অবস্থার কথা।

আমরা ভগবৎ-বিরহের কথা অতি সহজভাবে ব্যবহার করি, কিন্তু সত্যিকার ভগবৎ-বিরহ যার হয় সে যেন মরমে মরে থাকে। তার কোনও জাগতিক ক্ষোভ থাকে না। সবচেয়ে কঠিন হচ্ছে ভগবানকে ভালবাসা। শ্রীমতী বলেছিলেন—তোদের শ্যাম কথার কথা, আমার শ্যাম অন্তরের ব্যথা। তাই শ্যামকে অন্তরের ব্যথা করতে হলে নিজের ব'লে আর কিছু রাখা চলে না। আমাদের শুধু সেই মহান প্রেমকে আদর্শ ক'রে চেষ্টা করে যাওয়া।

২২।। কখনও কোনও মহাপুরুষের নিন্দা করো না। কারণ, সেখানে হয়তো তাঁর শিষ্যরা বসে আছেন, তাঁর ভক্তরা রয়েছেন। যে কোনও গুরুকে আঘাত করলে সে আঘাত গুরু পরম্পরায় গিয়ে সেই আদি গুরু সচ্চিদানন্দকেই লাগে।

২৩।। গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, এটা বলা খুবই শক্ত। গুরুর প্রতি ব্যক্তিগত ভালবাসা এবং সর্বস্ববোধ, অর্থাৎ গুরুই আমার সর্বস্ব, এই বোধটা না এলে গুরুকে ভগবান বলাটা মুখের কথা মাত্রই হয়। সত্যিকার ভগবৎ-বোধ সেইখানে যেখানে শিষ্যের প্রাণে একনিষ্ঠ ভক্তি আছে, গভীর ভালবাসা আছে। গুরু কি দীক্ষা দিলেন, দীক্ষাতে আধ্যাত্মিক উন্নতি হল কিনা, কতটা হল, এসব কিছুই সে আর দেখে না। তিনি আমার গুরু, আমার একমাত্র অবলম্বন, আমি তাঁর সন্তান, এই গভীর ভালবাসা এলে তবেই সম্ভব গুরুকে ব্রহ্ম জ্ঞান করা। শিষ্যের অনেকখানি ভক্তি প্রয়োজন গুরুকে ব্রহ্ম বলতে হলে। উন্নত শিষ্য ভক্তির দ্বারাই টেনে আনতে পারে পরব্রহ্মকে গুরুর আধারে।

২৪।। মধুর ভাব সাধন বলতে যা বোঝায় সেটা ঠিক এই সংসারের দৃষ্টিতে মধুর ভাব নয়। মধুর ভাব সাধনে ভগবানকে পতিরূপে কল্পনা করে, পতিরূপেই তাঁকে দেখে এটা ঠিকই—কিন্তু সেটা শুধু দৈহিক সম্পর্কেই

শেষ হয় না। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতীর মধুর ভাব শুধু দৈহিক সম্বন্ধেই শেষ হয়ে যায়নি, সেখানে একটা আত্মিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে। এবং সে সম্বন্ধ চিরন্তন। বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ চিরকিশোর, শ্রীরাধা চিরকিশোরী এবং কৃষ্ণের বারো বছর বয়সেই বৃন্দাবন লীলার শেষ।

কৃষ্ণ বারো বছর বয়সেই বৃন্দাবন ছেড়ে চলে গেলেন দ্বারকায়, আর স্থূলভাবে ফিরে এলেন না কোনও দিন। এর একটা তাৎপর্য আছে। বৃন্দাবনের রাধা এবং গোপীদের কাছে কৃষ্ণ চিরকিশোর রূপেই থেকে গেলেন। অথচ শ্রীকৃষ্ণের বাস্তব জীবনে স্থূল দেহে জরা বার্ধক্য সবই এসেছে। কিন্তু বৃন্দাবনের কৃষ্ণ ভাবরাজ্যে চিরকিশোর রয়ে গেলেন। মনে হয়, মধুর ভাবকে প্রতিষ্ঠা দেবার জন্যই তাঁর বৃন্দাবন ত্যাগ ক'রে চলে যাওয়া।

শ্রীরাধার চিরবিরহের মধ্যে ভগবানের প্রতি মধুর ভাবটি প্রতিষ্ঠা পেল। সেখানে ভক্ত-ভগবানের মিলন দেহের নয়, সে মিলন দেহাতীত সত্তার। তাই মন্দিরে মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি আজও পূজিত হচ্ছে। বৃন্দাবনের কৃষ্ণ-রাধাই ভক্তের পূজার বস্তু হয়ে আছে। কাজেই মধুর ভাবকে জাগতিক স্তরে নামিয়ে আনা চলে না এবং মধুর ভাব দেহাতীত বলেই ভগবানের সঙ্গে মধুর ভাবের ছেদ নাই, এটি চিরন্তনী। মধুর ভাব বিরহের সঙ্গে মিলনের এক অপূর্ব সমন্বয়ের ভাব। এখানে দেহটাই সব নয়। দেহ জরা-জর্জরিত হয়ে গেলেও ভাব রাজ্যে ভক্ত-ভগবানের ভাব-সম্মিলন চির মধুরই থাকে। ঠাকুর বলেছেন, মধুর ভাবে সব ভাবেরই সমন্বয় হয় এবং এই ভাব অন্য সব ভাবের চেয়ে ঊর্ধ্বে, কিন্তু সাধারণের পক্ষে এভাব নিয়ে সাধনা করাটা বেশ কঠিন। পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত না হলে হয় না।

২৫।। ঘুম কমানো বা রাত্রি জাগা অবচেতনকে জয় করার পক্ষে প্রয়োজন। ঘুমের মাঝে চেতন মন ঘুমিয়ে পড়ে, তাই অবচেতন মনের কাজের সুযোগ

হয়। একে control করতে ঘুম জয় করতে হবে। জাগরণের ফলে চেতন মনের পরিধি বেড়ে যায়, চেতন মনের কাজ বেড়ে যায়। রাত্রে অবচেতনের প্রকাশ বেশি। আমাদের ঠাকুর সত্যানন্দদেব বলতেন, রাত্রে যেমন অবচেতনের প্রকাশ বেশি তেমনি আবার বহু সাধু মহাপুরুষরা সূক্ষ্ম শরীরে এসে দেখে যান। অলক্ষ্যে তাঁরা আশীর্বাদ করে যান, কৃপা ক'রে যান। সে সময় সচেতন থাকলে তাঁদের কৃপা পাওয়া যায়। বিশেষ করে রাত্রি ১টা থেকে ৩টের মধ্যে আমাদের ঠাকুর জেগে জপ করতে বলতেন। রাত্রি জাগরণটা সাধকের প্রথমেই চেষ্টা করা উচিত। ঠাকুর বলতেন, ঐ সময়টায় যতটা পারবে সংকল্প ক'রে জপ করবে। বিশেষ সংকল্প ক'রে জপ করতে বলতেন। আমরা দেখেছি, বিশেষ সংকল্প ক'রে ওই সময় জপ করলে বহু ক্ষেত্রেই ফল পাওয়া যায়।

২৬।। জায়গার কোন দোষও নেই। স্থানটি সবসময়ই innocent. মানুষ তীর্থকে জাগায়, আবার মানুষই তীর্থকে নষ্ট করে।

২৭।। বৈরাগ্য এসেছে, অথচ একটা দোটানা রয়েছে, সব বন্ধনটা কাটছেনা, সংসারের কর্তব্যগুলি রয়েছে। সেক্ষেত্রে একমাত্র উপায় প্রার্থনা। প্রার্থনা করতে হবে, "ঠাকুর, আমার মনে বৈরাগ্য দাও, কর্ম বন্ধন কমিয়ে দাও; আর ঠাকুর, আমার পরিবেশ সেরকম ক'রে দাও, যাতে তোমার দিকে এগিয়ে যেতে পারি।"

২৮।। মর্কট বৈরাগ্য অর্থাৎ যে বৈরাগ্যটা ঘা খেয়ে হ'ল এবং পরে মুছে গেল। বৈরাগ্যটা পাকা না কাঁচা তা সময়ে বোঝা যায়। তবে সেটাও ভাল। সামান্য একটুকুও যদি ভগবানের জন্য কর, ভগবান সেইটুকুই সোনার বাক্সে তুলে রেখে দেবেন। পরের জন্মে যখন শুভ সংস্কার জাগবে তখন হয়ত ঐ মর্কট বৈরাগ্যেরও শুভ ফল কিছুটা ফলবে। তাঁর জন্য যেটুকুই করা যায় সেটাই লাভ। তবে চিরস্থায়ী হতে গেলে নিজেকে চেষ্টা করতে হবে, সময় দিতে হবে।

২৯।। বৈরাগ্য এলে সংসারের কাজে অসুবিধা হয় ঠিকই, কিন্তু স্ত্রী যদি সতী হয়, তার প্রতি কর্তব্য আছে, ঋণ আছে। তার খাওয়া পরা ওষুধ ইত্যাদির ব্যবস্থা করতেই হবে। এগুলো চিন্তা করতেই হয়। তীব্র বৈরাগ্য না এলে এটা এড়িয়ে যাওয়া চলে না। তীব্র বৈরাগ্য হলে ভগবান ভার নেন। এটা নির্ভর করে সাধকের বৈরাগ্যের ওপর। যখন কোনও কিছুই মনে রেখাপাত করছে না, সে রকম ক্ষেত্রে দেখা যায় ভগবান ঠিকই ব্যবস্থা করেন। পরিবেশও সেরকম ক'রে দেন। কিন্তু যতক্ষণ কর্তব্য বোধ আছে, ততক্ষণ কর্তব্য কর্ম ক'রে যেতে হবে।

তীব্র বৈরাগ্য এলে কর্তব্য বোধটাই থাকে না। মহাপ্রভুর এক ভক্ত গোবিন্দ তার শিশু কন্যাকে ফেলে যেতে পারছে না। বৈরাগ্য এসেছে অথচ মা-মরা মেয়ের কথাও মনে আসছে। হঠাৎ দেখে তার সামনেই একটা টিকটিকির ডিম পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে ফেটে বাচ্চাও হ'ল আর তৎক্ষণাৎ সেই বাচ্চাটির মুখের কাছে ছোট্ট একটি পোকা পড়ল, টিকটিকির বাচ্চা সেটিকে খেয়ে নিল। এটা দেখেই সে শিশু কন্যাকে ফেলে দিয়ে চলে গেল তীব্র বৈরাগ্য নিয়ে। বুঝেছে যে, সৃষ্টিকর্তা যিনি তিনিই সব ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন, তিনি ঠিকই ভাবছেন।

কিন্তু যতক্ষণ সংসারে থাকতে হবে ততক্ষণ কর্তব্য সমস্তই করতে হবে। কি সংসারে, কি সন্ন্যাস-আশ্রমে, কর্তব্য থেকে মুক্তি কোথাও নেই। সন্ন্যাস-আশ্রমেও কর্তব্য করতেই হয়। Duty বোধটা যেদিন সম্পূর্ণ চলে যাবে, সেদিন হয় বেরিয়ে গেল পরিব্রাজক হয়ে, নয়তো ধ্যান জপে ডুব দিল। কিন্তু নিজেকে ফাঁকি দিলে চলবে না। জোর ক'রে হয় না, স্বাভাবিক ভাবেই হয়। বৈরাগ্যটা যাতে হয় তার জন্য প্রার্থনা করতে হবে।

৩০।। একজন বড়লোকের ছেলে কি বলে—বাবার কত কৃপা? আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পরমপিতার কাছ থেকে পেয়ে যাচ্ছি সব কিছু। এটা

ঠিক। কিন্তু আমরা বাপকেই ভুলে যাই। ভুলে যাই যে, আমাদেরও তাঁর প্রতি কিছু করণীয় আছে। সবাই বাপের প্রতি শ্রদ্ধাবান নয়। যদিও উত্তরাধিকার সূত্রে পাচ্ছি, তবু মনে রাখতে হবে তাঁর কৃপাতেই বেঁচে আছি। উত্তরাধিকার সূত্রে পাচ্ছি বলে তাঁকে ভুলে গেলে চলবে না। তাহলে তো আমরা অকৃতজ্ঞ সন্তানের দলে পড়ে যাব। যা পেয়েছি তার একটুও অন্ততঃ return দিতে হবে। এর কারণ, তাঁকেও বুঝতে দেওয়া যে, আমরা তাঁর মুখ চেয়ে আছি। আমাদের পূজা নিবেদন, চোখের জল, প্রার্থনা এটি তাঁর প্রিয়। এসব দিয়ে তাঁকে বুঝতে দিতে হবে যে, আমরা তাঁর কৃপাটি অনুভব করছি।

৩১।। প্রশ্ন ঃ ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা এসব আছে কিনা ঠিক কী ক'রে বুঝব? অর্থাৎ সত্যিকার জিনিস আছে না মিথ্যে শো, সেটা চিনব কী করে? বহু স্থানেই তো ধর্মের নামে অনেক গ্লানি এসে গেছে।

উত্তর ঃ যেখানে দেখবে নৈতিকতা, পবিত্রতা, ত্যাগ, নিঃস্বার্থ ভালবাসা, এগুলি আছে অর্থাৎ সেটা অন্তরে উপলব্ধি করতে পারছ কাছে গেলে, সেখানেই বুঝবে কিছু বস্তু আছে। যেমন, আগুনের কাছে গেলে তার তাপটা অনুভব করতে পার, সেটা কাউকে বুঝিয়ে দিতে হয় না বা বলে দিতে হয় না। তবে আর একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, আসল ও নকল চেনার মত চোখটাও দরকার। তা না হলে ভুল হবার সম্ভাবনা একটা থেকেই যায়। যেমন, imitation-এর গয়না আসল হীরের গয়না, এ-দুটোর তফাৎ তো আকাশ পাতাল তফাৎ। একটি অতি সাধারণ মানুষ, সে হয়তো ভুল ক'রে বসতে পারে, কিন্তু যার একটু যাচিয়ে নেওয়ার মত চোখ আছে, একটু চেতনা আছে, তার কাছে ঠিকই ধরা পড়বে কোন্‌টি আসল হীরে আর কোন্‌টি কাঁচ।

আমাদের মুশকিল হয়, বেশির ভাগই দেখা যায় যে, একটা জায়গায়

যদি কোনও রকম গ্লানি বা ভুল ভ্রান্তি দেখলাম তখন সমস্ত পথটাকে সেই একই খাতে বইয়ে দিলাম, বলে বসলাম—ও সব ভণ্ডামি। কিন্তু এটা ঠিক বিচার হ'ল না। এ দোষটা তোমার চেনার চোখের দোষ। এতে হীরের মূল্য কমে না। কাজেই বুঝতে হবে যে, সব দোষটা ধর্মের গ্লানির ওপরই চাপিয়ে দিলে চলবে না। ধর্মগ্রহীতারও অনেকখানি দায়িত্ব আছে। যা দেখলাম সেইখানেই অন্ধের মত ঝাঁপ দিলাম, তারপর ধাক্কা খেয়ে হতাশ হলাম, এটা না ক'রে খোলা চোখ আর খোলা মন নিয়ে আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা নিয়ে খুঁজতে হবে এবং দেখতে হবে বেশ তলিয়ে একটু গভীরে গিয়ে যে, কোনখানে ঠিক মনের সুরটি একটি সমমর্মিতা খুঁজে পাচ্ছে। ঠিক ঠিক চাহিদা থাকলে অর্থাৎ শুধু হুজুগে নয়, দেখবে ঠিক জিনিসটি ধরা পড়বেই, ঠিক বুঝতে পারবে কোনটি আসল কোনটি নকল।

সর্বোপরি আধ্যাত্মিক কিছু পেতে গেলে, আধ্যাত্মিক জগতের উদ্দেশ্যে একটি প্রার্থনা থাকা চাই যে, সে জগতের দরজাটা একটু খুলে যাক। গুরুর ক্ষেত্রেও সেই কথাই বলবো। প্রার্থনা করতে হবে—আমার যিনি দিশারী তিনি এসে দাঁড়ান আমার সামনে, আমার হাত ধরে নিয়ে চলুন। এতে ঠিকই ফল পাওয়া যায়।

তবে অবতার পুরুষ বা আধিকারিক পুরুষরা যখন আসেন তখন তাঁরা কৃপা করে আপনিই অনেকের চোখে ধরা দেন এবং কৃপাও করেন। সেখানে প্রার্থনা থাক আর না থাক, অহেতুক কৃপায় তিনি টেনে নেন। আমাদের জীবনে সেটা দেখেছি। যে বয়সে এসেছি এ-পথে, তখন ধর্ম কী জিনিস, গুরু কী জিনিস, তাও বুঝতাম না। কিন্তু ঠাকুর সত্যানন্দদেবকে দেখামাত্রই একটা অন্য জগতের চাওয়া যেন মনকে অধিকার ক'রে বসলো এবং চিরাচরিত চলার পথ ছেড়ে অন্য পথে এসে পড়লাম। এখানে আমাদের প্রার্থনারও মাহাত্ম্য নয়, মাহাত্ম্যটা সম্পূর্ণরূপে তাঁরই।

৩২।। প্রশ্ন ঃ ভগবানই সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন আমাদের, বিশেষ ক'রে যখন দেহ্ ধরে আসেন তখন তাঁর কাছে মানুষ যে ভালবাসা পায়, নিজের বাপ-মা'র কাছেও তা পায় না। তা সত্ত্বেও কেন মানুষ এদিক ওদিকে মন দেয় বা অন্য ভালবাসা খোঁজে?

উত্তর ঃ এর অনেকগুলো কারণ আছে বলে মনে হয়। স্বজাতিপ্রীতি বা স্বগোত্রপ্রীতি বলে একটা আছে। ভগবান আমাদের স্বগোত্র স্বজাতি এও যেমন ঠিক, তেমনি আবার তাঁর সঙ্গে আমাদের একটি বিভেদ-ও থেকে যায়, এটাও ঠিক। সে বিভেদ স্থূল-সূক্ষ্মের বিভেদ। যার জন্য তিনি মানুষ দেহ্ ধারণ ক'রে এলেও সাধারণ মানুষ তাঁকে ষোলআনা ভালবাসা বা ষোলআনা মন দিতে পারে না। কোথাও যেন একটু দূরত্ব থেকে যায়। মুষ্টিমেয় কতকগুলি প্রাণই তাঁকে আপন ক'রে নেয়। মানুষ দেহ্ ধারণ ক'রে এলেও তাঁর ভেতর একটি ন্যুট্রাল বা নিরপেক্ষ সত্তা বিরাজ করে, যেটা ঠিক বাসনা দিয়ে বাঁধা যায় না। যেমন, একটি মানুষের প্রতি আর একটি মানুষের বিশেষ একটি অধিকারবোধ আসা সম্ভব। কিন্তু সেই অধিকারবোধ ঠিক ভগবানের ওপরে ব্যক্তিগত ভাবে আরোপ করা মুশকিল। কারণ, তিনি সূক্ষ্ম সত্তাতেও যেমন সারা বিশ্বের, যখন দেহ্ ধরে আসেন তখনও সারা বিশ্বের। কাজেই ব্যক্তিগত দাবি নিয়ে, বাসনা নিয়ে তাঁকে বাঁধতে গেলে ব্যর্থ হতেই হবে।

সাধারণ মেয়েদের নিজের স্বামীর প্রতি একটি দাবি থাকে, নিজের ছেলের প্রতি একটি দাবি থাকে। ভগবানও তো একাধারে স্বামী সন্তান মাতা পিতা সব কিছু। কিন্তু তিনি সবার স্বামী সবার সন্তান সবার মাতা-পিতা। এই যে একটি ভাব তাঁতে বর্তমান থাকে, এর দ্বারা যাদের বাসনাদিগ্ধ মন তাদের তাঁকে পেয়ে তৃপ্তি হয় না। তারা তখন খোঁজে একটি নিজস্ব স্থূল বাসনার আধার, সমগোত্রীয় আধার, যে আধার তাকে স্থূল বাসনার

খোরাক জোগাতে পারে। ঊর্ধ্বলোকের আধার সে চায় না।

আমাদের ঠাকুর সত্যানন্দদেব একটি কথা বলতেন যে, "বাসনার দ্বারা অবাসনার বস্তুকে পাওয়া যায় না।" কাজেই তাঁকে যারা ঠিক ঠিক ভালবাসবে তাদের ত্যাগ স্বীকার করতে হবে অনেকখানি। স্থূল বাসনা নিয়ে, স্থূল অধিকার বোধ নিয়ে তাঁকে চাইতে গেলে তাঁকেও পাওয়া যাবে না, মনও ভরবে না। তখনই মন এদিক ওদিক করবে। তাঁকে ভক্তরা যে পায়, একান্ত আপন করেই পায়। কিন্তু সে 'আপন' ঠিক সাধারণ জগতের যে 'আপন' সে রকম নয়। একটি ঊর্ধ্ব লোকের সূক্ষ্মতম লোকের বাসনাবিহীন মনের সে আপনতম ভাব।

বৃন্দাবনের প্রেমলীলায় স্থূলভাবের মতই প্রকাশ দেখি আর আমরা ভুল ব্যাখ্যা ক'রে বসি। মান-অভিমান, বিরহ-মিলন সবই আছে, কিন্তু সবই একটি দেহাতীত সত্তায় প্রতিষ্ঠিত। আর একটি আছে সংস্কারের প্রশ্ন। ভগবান যখন স্থূল দেহে আসেন তখন সকলেই তো তাঁকে দর্শন করে, তাঁর কৃপা পায়, তাঁর স্নেহ ভালবাসা পায়। কিন্তু কে কতটুকু তাঁকে পেয়েছে এটা নির্ভর করে তাদের সংস্কারের সূক্ষ্মতা ও শুদ্ধতার ওপর। সেটা ব্যক্তিগত ভাবে ঠিকই বোঝা যায়। নিজের মানসিক উন্নতির মানদণ্ডে তার বিচার আপনিই হয়ে যাবে। স্থূল দেহধারী ভগবানকে পেয়ে যার বুক ভরে গেছে, তার সমস্ত স্থূলত্ব দূর হয়ে যাবে, নিজেই নিজের মাঝে সে ভরপুর হয়ে যাবে। ভগবানকে একার অধিকারে পাক বা না পাক, সে সব সময় বলতে পারবে—"তুমি আমার হও আর না হও, আমি কিন্তু চিরদিনই তোমার—শুধু তোমার।"

৩৩।। প্রশ্ন ঃ ঠাকুর তো কৃপা করছেন অনবরত, কিন্তু আমরা ধরব কী ক'রে?

উত্তর ঃ দেখ, শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে আছে, কৃপা-বাতাস তো বইছেই,

তুই পাল তুলে দে। এর মানে আর কিছু নয়, তাঁর কৃপার প্রতি আকুল আগ্রহ নিয়ে চেয়ে থাকা, প্রার্থনা করা, তুমি যে কৃপা করছ সেটা বুঝতে দাও। আমরা তাঁর কৃপাটি বুঝতে পারি না, কারণ, খুব সহজ ভাবেই না চেয়েই পেয়ে যাই। এই যে আলো বাতাস আত্মীয়-স্বজনের ভালবাসা এত সহজে আসছে যে, বুঝতে পারি না, টেরও পাই না। দৈনন্দিন প্রয়োজনের জিনিস যেমন আমরা রোজ পাচ্ছি, যেমন ভাত রোজ খাচ্ছি কিন্তু তার মাহাত্ম্য বুঝতে পারি না। কিন্তু অসুস্থতার পর যখন সুস্থ হয়ে প্রথম ভাত খাই তখন ভাতের মর্ম কিছুটা বুঝতে পারি। এই বোধটা জাগ্রত হবে যদি একটু চাহিদা থাকে। জোর ক্রেই উপলব্ধি করতে হবে।

কৃপা বলছো! বুকের ভেতর এই যে ধুক্‌ধুক্ করছে এটি কী! তিনি অন্তরে বসে আছেন, এটাই কৃপা। একথা বলতে গিয়ে মনে পড়ছে—বহুদিন আগে একজন ভক্তকে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, মাথা বড় না হৃদয় বড়—Brain বড় না Heart বড়? তিনি বললেন, মাথা বড়। কিন্তু আমাদের ঠাকুর বললেন—দেখ, মাথাটা এইটুকু আর বুকটা কত বড়। নিজের বুকের দিকে দেখিয়ে বললেন কথাটা। বললেন, বুকটাই বড়। ভদ্রলোক দেখেন—বিরাট বুক, সেখানটা যেন সমস্তটাই আলো হয়ে গেছে। এই হৃদয়ে তাঁর বাস, এই অন্তরে তাঁর বাস। কাজেই এটা জোর করেই বুঝতে হবে। এই নিঃশ্বাসটা যদি বন্ধ হয় তাহলে মরে যাব। এই মুহূর্তে যদি বাতাস একেবারে বন্ধ হয়ে যায়, সমস্ত পৃথিবীটাই মরে যাবে। এটাই তাঁর কৃপা যে, আমরা বেঁচে আছি। তবে কি জানো! বিশ্বাস করতে করতে উপলব্ধি হয়। তিনি কৃপা করছেন এই বিশ্বাস রাখতে হবে। বিশ্বাস আর প্রার্থনা—এরই জোরে কৃপাটি ধরতে হবে।

৩৪।। প্রশ্ন ঃ যদি ঈশ্বরে ভালবাসা না আসে? কী করণীয়?

উত্তর ঃ আমাদের ঠাকুর বলেছেন প্রার্থনা করতে— 'তিনি

কৃপা ক'রে জোর ক'রে নিয়ে চলুন তাঁর দিকে। এই প্রার্থনা—হে ঠাকুর, তুমি চেষ্টাও জাগাও, সব জোগাড় ক'রেও দাও, তোমার যত আছে সব কর, এই প্রার্থনা।' তাঁকেই জোর ক'রে বলতে হবে। তোমারই দেওয়া সংসার, জোর করেই নিয়ে যেতে হবে তোমাকে। সাধারণ মানুষ আমরা, তপস্যা সাধনা পারব না। কাজেই প্রার্থনা করতে হবে। মনের সচেষ্ট ইচ্ছা থাকবে, পারছি না কিন্তু চাইছি। কাজেই বলতে হবে—তুমিই এটা ক'রে দাও।

৩৫।। প্রশ্ন ঃ অনেকে বলে, তাঁর যখন ইচ্ছা হবে আপনিই হবে, আমাকে কিছু বলতে হবে কেন? এটা কি ঠিক?

উত্তর ঃ এটা হয় পূর্ণ শরণাগতির কথা, নয়তো সুবিধাবাদীর কথা। পূর্ণ শরণাগতির ভাব নিয়ে যে বলবে, সে কিন্তু কোনও চেষ্টাই করবে না। ত্রৈলঙ্গস্বামীকে কাশীর নরেশ হীরের বালা পরিয়ে দিয়েছিলেন। একটি চোর এসে খুলে নিয়ে গেল। ওঁর দুটোতেই সমান। কোনটিতেই চেষ্টা নেই। এটি পূর্ণ শরণাগতি, কিন্তু যতক্ষণ অন্য চেষ্টা রয়েছে, চাকরি করছে, দোকান বাজার করছে, বায়োস্কোপ দেখছে, হাত পা নাড়ছে, সব কিছুই করছে নিজের চেষ্টায়, শুধু তাঁর বেলাতেই বলছে—তিনি করিয়ে নিন, আমি বলবো কেন? তা বললে তো হবে না। তিনি তো অহংরূপ সম্পত্তিটি দিয়েই দিয়েছেন। দেখছেন কতটুকু বাজে খরচ আর কতটুকু তাঁর জন্য। মানুষ এই অহংটুকু নিয়ে কিছুটা সংসারে দিয়ে কিছুটা তাঁকে দিতে পারে।

সংসারীদের অনেক সুবিধা। ঠাকুর জানেন, বিশ মণ বোঝা ঠেলে তাকে ডাকতে হচ্ছে, তাই অল্পতেই সন্তুষ্ট। তিনি সকলের দরজায় কাঙাল হয়ে ঘুরছেন কিন্তু আমরা তাঁকে সেটুকুও দিতে পারি না। ঈশ্বরকে ডাকার কথা বললেই বলবে—দাঁড়াও, সময় হোক, তিনি না ইচ্ছা করলে তো হয় না, তিনি যেদিন ডাকবেন সেদিন হবে। কিন্তু আসলে সে-ই চায় না। তিনি ঠিকই দিয়ে যাচ্ছেন। সকলকেই সমানভাবে দিয়ে যাচ্ছেন। যে চাচ্ছে, যে

চাচ্ছে না, সবাই একই আকাশের নীচে একই আলো, একই বাতাস পাচ্ছে। কার্পণ্য তাঁর নয়, কার্পণ্য আমাদের দিক থেকে, এটা বুঝতে হবে।

৩৬।। প্রশ্ন ঃ সংসারজীবনে কিভাবে চললে সিদ্ধি লাভ সম্ভব?

উত্তর ঃ যন সাধন তন সিদ্ধি—সাধনা করলে তবে তো সিদ্ধি লাভ হবে! এখন আমরা সংসারের জন্য আমাদের চোখের জল সমস্ত খরচ করে ফেলি। ছোটবেলা পড়াশুনো, তারপর চাকরি, বিবাহ, ছেলেমেয়ে, এইভাবে বাড়তে বাড়তে জীবনের অর্ধেক সময় চোখের জল বেকার চলে যায়। আকুল আগ্রহ যদি হয় তাহলে উপায়ও মিলে যায়। সংসার করছো কর কিন্তু তার মোড় ফিরিয়ে আনতে হবে ভগবানের দিকে বা ইষ্টের দিকে। মনটাকে রাখতে হবে ইষ্টমুখী ক'রে। যে তারামায়ের ভক্ত সে তারামায়ের প্রতি, যে বৈষ্ণব তার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি, অথবা যার ইষ্ট নির্দিষ্ট ক'রে দিয়েছেন গুরু, তার ইষ্টের প্রতি মনটাকে রাখতে হবে।

যেমন সাধনা তেমন সিদ্ধি। মনকে ইষ্টমুখী করাই সাধনা। তাই প্রথম দরকার মোড় ফিরিয়ে দেওয়া। কথামৃতে যেটি আছে। সংসারের দিকে মন ছুটছে, চাহিদা জাগছে নানান রকমের। কিন্তু কেন? সব চাহিদা সব আকুলতা সংসারকে দেবে কেন? এটা তো ঠিক যে, আমরা কিছুটা অংশ অন্তত: ভগবানের দিকে দিতে পারি। কাজেই সেটা দিয়েই শুরু করতে হবে। "তোমায় আমি পাইনি যেন সে কথা রয় মনে।" সংসার ভগবানই দিয়েছেন, কাজেই করতে হবে। সংসার করতে গেলে কিছুটা মনের খরচ হবেই কিন্তু কিছুটা অংশ রাখতে হবে তাঁর জন্য। অন্ততঃ চার আনা তো রাখতে পার। ঠাকুর বারো আনা মন ভগবানকে দিতে বলেছেন, কিন্তু বারো আনা না পার, চার আনা তো পার। না হয় এদিকটা কমই দিলে, কিন্তু দিতে হবে।

মনের ভেতর—'তোমায় যে পাইনি' এই একটা বেদনা কাঁটার

মত যেন খচখচ করে। প্রত্যেকটি কাজের ফাঁকে ফাঁকে ভাবতে হবে—সময়টা চলে গেল, তাঁকে ডাকতে পারলাম না। এই যে পারছিনা, এই যে ইচ্ছা তাঁকে ডাকার, অথচ পারলাম না,—এটাতেই ভগবৎ চিন্তা সব সময় এসে যাচ্ছে। কাকে ডাকতে পারছি না? ভগবানকে! এখানে স্বাভাবিক ভাবেই ভগবানের কথা চলে এল। সেটাও স্মরণ মননের পর্যায়ে পড়ে গেল। চেষ্টা করবে কাঁদবার। ইচ্ছা ক'রে, চেষ্টা ক'রে চোখের জল আনবে। যেমন চিমটি কেটে বেদনা সৃষ্টি করা হয়, তেমনি চেষ্টা ক'রে কাঁদবে। হয়তো এতে হাসি ঠাট্টা হবে। কিন্তু উদ্দেশ্যটা তো সৎ—মনের ভেতরে জোর ক'রে বেদনা জাগানোর চেষ্টা। প্রার্থনা করা দরকার। ঠাকুর শিখিয়েছেন এই প্রার্থনা—"হে ঠাকুর, তুমি তেষ্টাও জাগাও, সব জোগাড় করেও দাও, তোমার যত আছে সব কর।" যা যুগ, চারপাশের সমস্যায় চেষ্টাও জাগে না, তেষ্টাও জাগে না। তাই সেটির জন্যও প্রার্থনা করতে হবে। মন বসুক আর না বসুক, জোর ক'রে চেষ্টা করে যেতে হবে।

নামসংকীর্তনের সময় খুব উচ্ছ্বাস দেখা যায়। হয়তো সাময়িক কিংবা লোক দেখানোই। ঐ সাময়িক উত্তেজনা, উদ্দাম নৃত্য তারও লাভ আছে। এমনি না এলেও বসে ভেতর থেকে আকুলতা জাগানোর চেষ্টা। সেই চেষ্টাটাই সাধনা। দিনের পর দিন এটা করতে করতে শুভ সংস্কারের সৃষ্টি হবে। মানুষই তো শুভ অশুভ সংস্কারের সৃষ্টি করে তার আচরণের দ্বারা, তার কর্মের দ্বারা। তাই চেষ্টা করতে করতে শুভ চেতনা শুভ সংস্কারের সৃষ্টি হয়ে যায়। সেটাই এগিয়ে নিয়ে যাবে। হয়তো ১৫ মিনিট বসলে। ৫ মিঃ শুভ চিন্তা এল, ১০ মিঃ বৃথা চিন্তায় কাটল। সেই ৫ মিনিটকে বাড়াবার চেষ্টা করবে। করতে করতে দেখা যাবে অশুভ বৃত্তি ইচ্ছা সব খসে গেছে। তখন একটু বসতে না পেলেই কষ্ট হবে। আগে বসতেই ইচ্ছা করতো না। কিন্তু দীর্ঘদিন চেষ্টার ফলে এমন হয়ে যাবে যে, যত কাজই থাকুক, যত

অসুবিধাই থাকুক, বসতে না পেলেই মন ছটফট করবে, কিছুতেই শান্তি পাবে না। তাই চেষ্টা রেখে যেতে হবে।

চেষ্টা ক'রে গেলে একদিন সিদ্ধিলাভ করবেই। সেটা এ জন্মে হোক, আর পরজন্মেই হোক। এ জন্মে যদি নাও হয়, যতটা এগোলো ততটাই জমা থাকবে। পরের জন্মে আবার সেইখান থেকেই সুরু করবে। এ যুগের ঠাকুর অশেষ কৃপাময়, এটা কৃপার যুগ। এমনকি পরলোকে গিয়েও ঠাকুর কৃপা করেন। পরলোক থেকেও তিনি মুক্ত ক'রে দিতে পারেন। সাধারণভাবে পরলোক ভোগক্ষেত্র, কিন্তু এ যুগে সে লোকও মুক্তিক্ষেত্র হতে পারে। ঠাকুরের কতকগুলো উদাহরণ আমরা পাই, যে ক্ষেত্রে অনেকে পরলোক থেকেই মুক্ত হয়ে গেছে তাঁর বিশেষ কৃপাতে। কর্মক্ষয় হতে হতে মুক্তি হয়ে যাবে। কাজেই চেষ্টা ক'রে যাওয়াটা দরকার আর সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনাও ক'রে যেতে হবে তাঁর কাছে।

৩৭।। প্রশ্ন ঃ ঠাকুরের দর্শন পাচ্ছি না। কী করণীয়?

উত্তর ঃ ঠাকুরের দর্শন পাচ্ছ না। এ বিষয়ে একটা কথা মনে রেখ—তুমি যতক্ষণ তাঁকে চিন্তা করছ তাঁর সঙ্গ ঠিকই পাচ্ছ। অলক্ষ্যে তিনি তোমার কাছেই আছেন। কিন্তু স্বপ্নে বা ধ্যানে দর্শন পেতে হলে, স্থূল কাজের মধ্যে থাকলে পাওয়া মুশকিল। তবে তাঁর অহেতুক কৃপায় সবই সম্ভব। ভগবানের দর্শনের জন্য প্রার্থনা ক'রে যাও এবং তাঁর জন্য অপেক্ষা ক'রে থাক শরণাগত হয়ে। তোমার দিক থেকে ত্রুটি যেন না থাকে। তাঁর কাজ তিনি ঠিকই করবেন।

৩৮।। প্রশ্ন ঃ গুরুস্থান ছাড়া অন্য কোনও স্থানেই কি যাওয়া উচিত নয়—সৎ সঙ্গ, আলোচনা বা আধ্যাত্মিক উপদেশের জন্য?

উত্তর ঃ এ বিষয়ে গুরুর নির্দেশ হচ্ছে সর্বোপরি। গুরু দেহে থাকতে যদি বলে গিয়ে থাকেন অন্য কোথাও না যেতে, তবে তো কোনও কথাই

নেই। কিন্তু যদি তিনি কিছু না বলে গিয়ে থাকেন, তাহলে সব কিছুই নির্ভর করবে আধারবিশেষের উপর। অনেকে আছে, যারা বলে—গুরু করেছি অতএব অন্য কোথাও আর যাব না। যা পাবার এখানেই পাব। কিছু না পেলেও গুরুস্থান আঁকড়ে থাকব শেষ পর্যন্ত। আবার আমাদের ঠাকুরের অনেক ভক্ত আছে যারা বলবে বা বলে যে, আমরা এমন একটা কিছু দেখেছি, যা দেখে চোখ ধাঁধিয়ে গেছে। আমাদের অন্য কোথাও যাবার দরকারই নেই। এটি এক ধরণের নিষ্ঠা।

কিন্তু এর মানে এই নয় যে, প্রয়োজন হলেও সৎসঙ্গের জন্য অন্য কোথাও যাওয়া চলবে না। গুরুনিষ্ঠাটি ঠিক রেখে সব জায়গাতেই যাওয়া যায়। দেখতে হবে যেখানে যাচ্ছি সেখানে গেলে গুরুনিষ্ঠার হানি হচ্ছে, না পুষ্টি হচ্ছে। যদি কোনও ধর্মস্থানে, দেবস্থানে বা সাধু-সঙ্গে কি কোন সৎ গৃহীর কাছে গিয়ে দেখা যায় যে, তার গুরুর প্রতি নিষ্ঠা ভক্তি দিন দিন পুষ্টি লাভ করছে, তবে সে-সব স্থানে যাওয়া নিশ্চয়ই ভাল। কিন্তু যদি দেখা যায়, সেখানে গিয়ে গুরুনিষ্ঠার হানি হচ্ছে, মনে দ্বিধা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হচ্ছে, তাহলে সে সঙ্গ সম্পূর্ণ বর্জন ক'রে চলবে। এটা মনই ঠিক বুঝে নেবে।

সংসারী, অথচ ধর্মের ক্ষুধা আছে, তাদের সিনেমা দেখে বেড়ানো, ছত্রিশটি অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে দেবস্থানে ধর্মস্থানে যাওয়া অনেক ভাল। গুরুর দেখানো পথ বা আদর্শের সঙ্গে যদি মিল থাকে, তাহলে সৎসঙ্গ করা তার পক্ষে নিশ্চয়ই ভাল। তবে চেখে বেড়ানোর জন্য নয়। এখানে দু'দিন সেখানে দু'দিন, এ করলে হয় না। যেমন, এক জায়গায় কোনও মহাপুরুষ আছেন শুনে সেখানে গেল। দেখে মনে হল, গুরু তো আর নেই, এঁর কাছেই আশ্রয় নিই না। আবার দু'দিন বাদেই আর এক জায়গায় গিয়ে আর একজনকে বেশি ভাল মনে হল। এভাবে একটা ছেড়ে আর একটা, আবার সেটা ছেড়ে অন্য একটা ধরা, এটা চঞ্চলতা।

উদারতা এবং চঞ্চলতা এক নয়। ধর্মের ক্ষেত্রে উদারতা মানে সবাইকে শ্রদ্ধা করা, সম্মান দেওয়া, সমস্ত ধর্মমতের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করা। উদারতার সঙ্গে নিষ্ঠাটি অবশ্যই বজায় রাখতে হবে। সবাইকে শ্রদ্ধা দিয়ে নিজের জায়গায় অটল থাকব, এটাই নিষ্ঠা। আবার নিষ্ঠা আর মতুয়ার বুদ্ধিও কিন্তু এক নয়। মতুয়ার বুদ্ধি হচ্ছে—আমি যা করছি সেটাই ঠিক, আর সব ভুল। আর কাউকে সে শ্রদ্ধা দেখাতেও চায় না। চাঁদ-সদাগরের নিষ্ঠা এই মতুয়ার বুদ্ধির পর্যায়ে পড়ে। কাজেই সৎসঙ্গের উদ্দেশ্যে সবস্থানেই যাওয়া চলে যদি গুরুনিষ্ঠাটি ঠিক থাকে। সেটা নিজেকেই যাচাই ক'রে দেখে নিতে হবে। আর যেখানে যাবে সেখানে ইষ্টনাম জপ করবে, ইষ্টমূর্তির চিন্তা করবে। মন্দির বিগ্রহগুলিতে নিজের ইষ্টমূর্তির কল্পনা করবে। যার গুরু-নিষ্ঠা ঠিক আছে সে যে কোনও মন্দিরে নিজের ইষ্টকেই দর্শন করবে।

৩৯।। প্রশ্ন ঃ স্বয়ং ভগবান যখন অবতাররূপে গুরুরূপে আসেন তখন তাঁর নিজস্ব গোষ্ঠী ছাড়াও অন্য সকল সাধু সমাজের ওপরে কি তাঁর সূক্ষ্ম প্রভাব পড়ে? সব পুজো কি তাঁর চরণেই এসে পৌঁছায়?

উত্তর ঃ প্রত্যেক যুগের যিনি অবতার, সেই সেই যুগের তিনি অধিরাজ। সেই যুগের পরিচালনার ভার তাঁর হাতে। কাজেই তখন বা তাঁর পরেও যে সব সাধু মহাত্মা মহাপুরুষরা আসেন তাঁদের মধ্যে directly বা indirectly তাঁর ইচ্ছাই কাজ করে। তাঁরা তখন তাঁরই প্রতিভূ হয়ে কাজ করেন। শক্তির অবতরণই অবতার। স্বয়ং ভগবানই রামকৃষ্ণরূপে এলেন। তিনিই সে যুগের মালিক। কাজেই ঘটে ঘটে তাঁরই শক্তি কাজ করবে। তাঁর প্রভাব কেউই এড়াতে পারবে না। ধর্ম-সমন্বয়ের যে ভাব এখন এসেছে এ তাঁরই প্রভাব। Directly হোক বা indirectly হোক, তাঁর আদর্শই যুগকে নিয়ন্ত্রিত করবে। এটি আমরা প্রত্যক্ষ দেখেছি।

কোনও বৈষ্ণবপন্থী মহাপুরুষ এখানে এসেছিলেন। কিন্তু তাঁর বলা

কথা ও গল্পের মধ্যে মাতৃভাব পরিপূর্ণরূপে ফুটে উঠল। আসলে রামকৃষ্ণদেবের সূক্ষ্ম ভাইব্রেশন এ যুগে কাজ করছে সবারই মধ্যে। বিশেষ ক'রে অন্য যুগের সঙ্গে এ যুগের একটি পার্থক্য হচ্ছে—অন্য যুগে কোনও একটি বিশেষ ভাবকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এ যুগের বৈশিষ্ট্য—সমস্ত ধর্মকে একটি চরম ঐক্যে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। আর শুধু তাই নয়, যুগদেবতা রামকৃষ্ণদেব সেই সেই ধর্মের সাধনার মধ্য দিয়ে নিজের ইষ্টকেই লাভ করেছেন এবং ব্রহ্মবস্তুর একত্ব উপলব্ধি করেছেন। তাই যে কোন ধর্মমতের পথিক হোক না কেন, প্রত্যেকেই আপন আপন ইষ্টের মধ্যে তাঁর একটা সূক্ষ্ম ভাবসত্তা অনুভব করবেই এবং তাঁকে অন্য ধর্মের বলে ভাবতে পারবে না। সে দিক দিয়ে সব দেবতার পূজাই তাঁর চরণে পৌঁছাবে।

আমাদের ঠাকুর সত্যানন্দদেবের মধ্যেও আমরা দেখেছি সব ভাব, সব রূপ, সব ধর্ম পথের সমন্বয়। হিন্দুধর্মের সমস্ত বৈচিত্র্যকে ঐক্যভূমিতে প্রতিষ্ঠিত ক'রে তিনি দেশ কালের উপযোগী এক সূক্ষ্ম ভাব-স্পন্দন বিস্তার ক'রে গেছেন। এর প্রভাব চলবে যুগযুগ ধরে।

৪০।। প্রশ্ন ঃ তিনি স্বতন্ত্র ইচ্ছাময়, তবে প্রার্থনার কী মূল্য?

উত্তর ঃ তাঁর যেটি ইচ্ছা সেটি ঘটবেই এটা জেনেও মানুষ প্রার্থনা না ক'রে থাকতে পারে না। কারণ, মানুষের চাওয়া আছে। চাওয়া যতক্ষণ আছে সে চাইবেই। বাসনার জগৎ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ বাসনার তৃপ্তির জন্য চাওয়া আছে। এ চাওয়া কামনাবাসনার রাজ্যে সীমিত। সমস্ত জাগতিক কামনা বাসনার ঊর্ধ্বে গেলে সংসারের ক্ষুদ্র চাহিদা শেষ হয়ে যায়। কিন্তু তখন জাগে ভগবৎচাহিদা। ভগবৎরাজ্যে বিরাট চাহিদা এবং এই বিরাট চাওয়ার তৃপ্তির জন্য জাগে বিরাট প্রার্থনা। আবার ভগবৎ লাভের পরও আসে জগৎ-কল্যাণের চাহিদা। কাজেই সেখানেও প্রার্থনা ওঠে লোককল্যাণের জন্য।

কাজেই সব ভগবানের ইচ্ছায় হলেও মানুষের চাওয়ার শেষ নেই। তাই প্রার্থনার অন্ত নেই। বিশেষ ক'রে ভক্তি ভগবান এ-নিয়ে যারা রয়েছে তাদের চাওয়ার শেষ কখনও হয় না। জ্ঞানপন্থীদের হয়ত এটি হবে না। কিন্তু ভক্তদের মনে প্রার্থনা উঠবেই। তাই চাওয়া যখন বন্ধ হবে না, প্রার্থনা যখন উঠবেই, তখন একটি ঊর্ধ্বতম শক্তির কাছে চাওয়াই ভাল। অবশ্য ভক্তের প্রার্থনা ভগবান শোনেন। প্রার্থনা যদি আন্তরিক হয়, ভগবান ঠিকই শোনেন।

আর একটি জিনিস মনে হচ্ছে—সবই দৈব। কিন্তু পুরুষকার রূপে একটি অহংকে তিনি প্রত্যেকটি মানুষের ভেতরে রেখে দিয়েছেন। সেই পুরুষকারকে দৈবাশ্রিত করতে হলে প্রার্থনা একটি মস্ত বড় উপায়। তিনি স্বতন্ত্র-ইচ্ছাময় হলেও আমাদের ভেতর থেকে প্রার্থনাকে সম্পূর্ণ মুছে দিতে চান না। তাই প্রার্থনা চিরন্তন থাকবেই। তবে কতটুকু শুনবেন সেটি তাঁর ইচ্ছা।

ছড়ানো মুক্তো : চতুর্থ খণ্ড

প্রকাশকের নিবেদন

(প্রথম প্রকাশ)

পরমপূজনীয়া শ্রীঅর্চনাপুরী মায়ের তিপ্পান্নতম জন্মতিথি উপলক্ষে 'ছড়ানো মুক্তো'র এই চতুর্থ খণ্ডটি প্রকাশিত হ'ল। সম্যক্ প্রজ্ঞাপ্রসূত এই বেদোজ্জ্বলা বাণী মানুষের অন্তরে মন্ত্রবৎ গেঁথে গিয়ে তাকে শক্তি দেবে দিব্যপথে চলার,তাকে নিয়ে যাবে সত্য-শিব-সুন্দরের দিকে— এই আমাদের বিশ্বাস, এই আমাদের অন্তরের প্রার্থনা।

এই পুস্তক-প্রকাশে সহযোগী মহাপ্রাণদের ঋণ আমাদের চিরদিনের।

শ্রীসত্যানন্দার্পণমস্তু।

৭ই শ্রাবণ, ১৩৮৭
জুলাই, ১৯৮০

ছড়ানো মুক্তো

(৪র্থ খণ্ড)

১।। **অনুৎসাহ যোগ।**

আসক্তি চলে গেলে উৎসাহ চলে যায়, তখন শান্তি ......

(শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত)

উৎসাহ চলে গেলে আসক্তি চলে যাওয়া সম্ভব ......

জপধ্যানাদি সহায়ে জাগতিক উৎসাহ কমাতে হয় ......

উৎসাহ একেবারে গেলে শান্তি—পরা শান্তি।

২।। **তত্ত্বান্তরে ব্রহ্ম।**

তত্ত্বই ব্রহ্ম ......

তাই এক তত্ত্বের তত্ত্বান্তরে রূপায়ণ সম্ভব......

সাধন ক্রমে রূপাদি তত্ত্বে......

অন্য তত্ত্বের উপলব্ধি হয়।

৩।। **স্বপ্নসাধন।**

একটি দেশকালে স্বপ্ন ও বাস্তব অভেদ ......

অন্য দেশকালে তার মিথ্যা স্বরূপ প্রকাশিত হয়।

এই স্বপ্নকে করতে হবে ব্যাপক ......

দেশকাল সরিয়ে নিয়ে ... ভগবৎমুখী মন নিয়ে...

অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ তিনকালই স্বপ্নস্বরূপ হয়ে যাবে।

৪।। বৈরাগ্য, ব্যাকুলতা আর তিন টান এক হওয়া—এদের সবেরই বাদী সুর অনুরাগ। আর একটা কথা, তিন টান এক হওয়া আর ব্যাকুলতা—এদের কিন্তু বৈরাগ্যের অপেক্ষা করতে হয় না। কারণ, ব্যাকুলতা এলে বৈরাগ্য আপনিই এসে যায়। তিন টান এক হলেও বৈরাগ্য আপনা থেকেই হয়ে যায়। কিন্তু বৈরাগ্য এলেই যে ব্যাকুলতা আসবে বা তিন টান এক হবে তা নাও হতে পারে।

বৈরাগ্যের ব্যাখায় ঠাকুর বললেন, ঈশ্বরে অনুরাগ, বিষয়ে বিরাগ। সুতরাং ঈশ্বর লাভ করতে হলে এ-দুটোই পাশাপাশি থাকা চাই। কাজেই অনুরাগটা হল মূল কথা। মহাপ্রভুর পার্ষদ রায় রামানন্দ কত বড় ভক্ত কিন্তু তাঁর বৈরাগ্যের কোনও বহিঃপ্রকাশ ছিল না। ভোগৈশ্বর্য আর বিলাস প্রাচুর্যের মধ্যে থেকেছেন—মহামূল্য পোষাকে পালঙ্কে বসে আলবোলায় তামাক খাচ্ছেন—বৈরাগ্যের কোনও চিহ্ন নেই। কিন্তু কৃষ্ণ কথা, কি হরি কথা শোনা মাত্রই আর সে মানুষটি নেই—তখনই গা থেকে সেই দামী জামাকাপড় ছিঁড়ে ফেলে দিচ্ছেন, ভূলুণ্ঠিত হয়ে প্রেমাবেগে কেঁদে ভাসাচ্ছেন।

মহাপ্রভুরই আর এক ভক্ত পুণ্ডরীকও ঠিক এইরকম ছিলেন—বাইরে থেকে তাঁর বৈরাগ্যের বা অনূরাগের বিষয়ে কিছুই ধারণা করা যেত না। এখানে মনের শুষ্ক বৈরাগ্যের চেয়ে আমরা বলব অনুরাগটাই ছিল প্রবল। দেখ, অনুরাগ হ'ল অন্তরের জিনিস। বৈরাগ্য অন্তরের হলেও তার কিছুটা বহিঃপ্রকাশ থাকেই। কিন্তু রায় রামানন্দের বা পুণ্ডরীকের মধ্যে বৈরাগ্যের কোনও বহিঃপ্রকাশই দেখা যায় নাই। অথচ ভগবৎ-প্রসঙ্গ শ্রবণমাত্র অনুরাগ বা প্রেমের বন্যায় তাঁরা এমন ভাবে ভেসে যেতেন যে, তখন বৈরাগ্যের সমস্ত লক্ষণগুলি আপনা থেকেই চরমভাবে ফুটে উঠত— তখন বিষয়ের লেশমাত্র স্পর্শ আর সহ্য হচ্ছে না। অথচ শুষ্ক

বৈরাগ্যের নজির তো আমরা কত মানুষের মধ্যে পাই। কিন্তু সেখানে তো এমন ঈশ্বরানুরাগ দেখা যায় না। কাজেই বৈরাগ্যকে নির্ভর করতে হয় অনুরাগের ওপর। অনুরাগ না থাকলে বৈরাগ্য টিকবে না। এই তিন টানের পরিমাণ কিন্তু সবারই সমান নয়। এখানে আধারের প্রশ্ন এসে পড়ে। ঠাকুর বলেছেন, এই প্রেমাভক্তি যার যতটুকু আছে ষোলো আনা দিতে হবে। এই ষোলো আনা কিন্তু সবার সমান নয়। এটার মাপ হবে আধার অনুযায়ী। একটি ছোট আধার—তার ঐ তিন টানের সব quantity-র মাপ হবে তার আধার অনুযায়ী। রকফেলার বিরাট ধনী, তাঁর বিষয়ের পরিমাপে তাঁকে বিরাট বিষয়ী বলা চলে। আবার একজন জমিদার সেও বিষয়ী, তারও বিষয়ের প্রতি প্রবল টান। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে এই দুটো টানের পরিমাণকে কি সমান বলা যাবে? রকফেলারের ঐশ্বর্যের পরিমাপে তাঁর বিষয়-টান জমিদারের তুলনায় অনেক বড়। কিন্তু দুজনের বিষয়গুলি যদি কেড়ে নিয়ে দুটো মনকে পাশাপাশি দাঁড় করানো যায় তো দেখা যাবে, বিষয়ী হিসেবে দুটো মনই এক। কাজেই যার যতটুকু আধার সে হিসেবে সে যদি তার সবটুকু অর্থাৎ ষোল আনা দিতে পারে তবে সে ভগবৎ লাভ করবে।

অনুরাগ ভালবাসা বীজাকারে সবার মধ্যে রয়েছে, তিনি দিয়ে দিয়েছেন। কারণ, ভালবাসার ওপরই তো তাঁর সৃষ্টিলীলা চলছে। কিন্তু ভগবান তাকে margosa (নিম) coated ক'রে রেখে দিয়েছেন। অর্থাৎ সংস্কারের প্রশ্ন রয়েছে। সংস্কার-আবরণে সেটা চাপা পড়ে আছে। ঠিক জায়গায় হয়ত ঠিকমত সেই ভালবাসা ফুটতে পারছে না। সাধুসঙ্গ এইজন্যেই দরকার। সাধুসঙ্গে অশুভ সংস্কার কেটে যায়। শুভ সংস্কার গড়ে ওঠে। ফলে ভালবাসার সেই সুপ্ত বীজটি অঙ্কুরিত হবার সুযোগ পায়।

৫।। প্রেমের definition ঠাকুর যা দিয়েছেন—রাগানুগা ভক্তি, তা

জীবের হয় না। কিন্তু অনুরাগ, যেমন, নামে অনুরাগ, জীবের হয়। কারুকে দেখার পর তার প্রতি যে আকর্ষণ বা টান জন্মায় সেটা হল অনুরাগ। আবার বৃন্দাবন-লীলা প্রসঙ্গে চণ্ডীদাসের পদাবলীতে পাই শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণকে দর্শনের পূর্বেই তাঁর নাম মাত্র শুনে আকর্ষণ অনুভব করছেন— "সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম? কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ।" এর নামও অনুরাগ। কোনও মহাপুরুষ বা কোনও দিব্যবস্তুর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করা, কি একটু ভাল লাগা হ'ল অনুরাগ। প্রেম কিন্তু সর্বশেষ কথা। আমাদের ঠাকুর বলেছেন, প্রেম ভক্তি বা ভালবাসা সবার মধ্যে আছে, তবে যেখানে অভাবনীয়ভাবে জমাট বেঁধে আছে তার নাম প্রেমাভক্তি।

প্রেমের definition সংস্কৃত ভাষায় যেমন পাই ইংরেজি ভাষায় তেমন পাই না। প্রেম এমন একটা উচ্চ অবস্থা যে, ঠাকুর বললেন, প্রেম হলে নিজের দেহ যে এত প্রিয় সেটিও ভুল হয়ে যাবে। দেহবুদ্ধি রহিত হয়ে যায়।

৬।। আমাদের ঠাকুর মাঝে মাঝে বলতেন—"বাবা রে! বাংলাদেশ পাণ্ডব বর্জিত দেশ।" তাতে আমরা ঠাকুরকে বলতাম, ঠাকুর, আপনি পাণ্ডব বর্জিত দেশ বলছেন, কিন্তু এত জায়গা থাকতে এই পাণ্ডব বর্জিত দেশের কোথায় কাঁটাশোলা, বাতিকার, কোথায় কুণ্ডলা, রাসবন, দুবরাজপুর, এসব জায়গায় আশ্রম করলেন। তাতে ঠাকুর বললেন, "মহাপুরুষ, অবতার পুরুষ আসার আর একটা বিশেষ কারণ হচ্ছে—তীর্থ সৃষ্টি করা। যেখানে কিছু নেই সেখানে তাঁর ভাবধারার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ধর যেমন, পুরীতে জগন্নাথজী জাঁকিয়ে আছেন, সেখানে আর একটা আশ্রমের খুব একটা প্রয়োজন হয়তো নেই। প্রয়োজন সেখানে, যেখানে ধর্ম বলতে কিছুই নেই। তাছাড়া বিশেষ বিশেষ তীর্থ ক্ষেত্রে গিয়ে প্রভাব বিস্তার করলে হয়তো

অকারণ একটা সংঘাতও বাধতে পারে।”

৭।। সমস্ত কর্তব্যের মূলে হচ্ছে ভালবাসা।

ভালবাসা যার ওপর আসে তার সঙ্গে কোনও আত্মীয়তা থাকুক আর না থাকুক, সেখানে কর্তব্য আপনি গড়ে ওঠে এবং সে কর্তব্যটুকু ছাড়া মানুষ বাঁচতেই পারে না। কিন্তু যেখানে ভালবাসা নেই, সেখানে কর্তব্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। তবে যোগীদের মন এমন যে, তারা এই কর্তব্যটাকে সমানভাবে সকলের জন্য ক'রে যেতে পারে। কারণ, সেই কর্তব্যের ভেতর থাকে একটা মোহহীন শান্ত ভালবাসা। উচ্ছ্বাস থাকে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের কর্তব্য নীরস বা প্রাণহীন হয় না। সংসারের ভালবাসার সঙ্গে যোগীর ভালবাসার এইখানেই তফাৎ। ভালবাসা এবং কর্তব্য আধার-বিশেষে এবং ক্ষেত্রবিশেষে এক একরকম রূপ নেয়। সাধারণ সংসারে কর্তব্য এবং ভালবাসা সীমিত রূপ নেয় কিন্তু একজন দেশপ্রেমিক কিংবা একজন ঈশ্বর-প্রেমিকের ভালবাসা বিরাট রূপ নেয়।

৮।। সেদিন নিজেদের মধ্যে একটি কথা হয়েছিল, রেডিওতে যখন নাটক হয়, তখন class ভাগ ক'রে দেওয়া হয় কি? অর্থাৎ এই নাটকটি এত বছর বয়েসের ছেলেমেয়েরা শুনবে না, এত বছরের যারা, শুধু তারা শুনবে? তা তো সম্ভব হয় না। অথচ যা পরিবেশন করা হল তা সকলের শোনা উচিত নয়, বিশেষ ক'রে ছোটদের তো নয়ই। কাজেই হয় সেগুলি ভাগ ক'রে দিতে হয়, বলে দিতে হয় যে, এটাতে অন্ধকার দিক আছে, এটা এই বয়সের যারা তাদের শোনা উচিত নয়। আর নয়ত এমন জিনিস দিতে হবে যা সকলের পক্ষেই গ্রহণীয়। কিন্তু তা তো হচ্ছে না। বরং এমন সব জিনিস পরিবেশন করা হচ্ছে যার মধ্যে থেকে ভাল বেছে নেওয়া বড়দের পক্ষেই কঠিন, অপরিণতদের পক্ষে আরও কঠিন। হাল্কা জিনিস চট ক'রে তারা ধরে ফেলবে।

এখানে কবি সম্মেলনে একবার একটি কবিতা পাঠ হ'ল, শেষের দিকে এমন কতকগুলো terms বা শব্দ use করলেন কবি যে, সেটা আমরা 'ভাবমুখে'-তে দিতে পারলাম না। কোনও জনসভায় আমরা যখন যাই, তখন ভদ্রভাবে যাই, সেজেগুজে যাই। একটু পালিশ ক'রে আমাদের সভায় যেতে হয়। কারণ, জনসমাজ বলে একটা জিনিস আছে—তার ঐতিহ্য আছে, কৃষ্টি আছে—তাই সেখানে যেতে হলে পরিষ্কার জামা কাপড় পরতে হয়, সাজতে হয়, চুল আঁচড়াতে হয়। নোংরাভাবে, এলোমেলোভাবে যেতে পারি না।

তেমনি সাহিত্যের ক্ষেত্রে, কাব্যের ক্ষেত্রেও অন্ধকার দিকটা যদি বলতেই হয় তো এমন ক'রে বলতে হবে যাতে অন্ধকার দিকটা প্রকট না হয়ে আলোটাই ফুটে উঠবে। আলোটুকু ফোটাবার জন্য যেটুকু দরকার সেটুকুই শুধু বলতে হবে। আসল কথা হচ্ছে, চরিত্রে এই পবিত্র ভাবটি না থাকলে তা হয় না। মনে রাখতে হবে কলমের ভেতর দিয়ে, বাক্যের ভেতর দিয়ে, যে স্খলন সেটাও মনের স্খলন।

কবিতা সাহিত্য মানে বক্তব্য বিষয়টাকে নর্দমায় এনে ছেড়ে দেওয়া তো নয়। কবিতা বললেই মনে হয় আকাশ, ফুল, যা কিছু সুন্দর। বিপ্লবের কথা কবিতায় থাকবে, সমাজের কথা থাকবে, জোরালো ভাষাও কবিতায় থাকবে। স্বামীজির কবিতায় তাও তো ছিল। ভাষাকে সংযত রেখে সবই বলা যায়।

৯।। সাহিত্য বা কাব্যে একটি আদর্শের সৃষ্টি করতে হবে। যেটা বলতে চাইছি সেটায় যেন পৌঁছুতে পারি। কিন্তু বর্তমানে সাহিত্যের মধ্যে সমাজের অন্ধকার দিকগুলোকে বা এলোমেলো জীবনের ছবিগুলোকে তুলে ধরার একটা চেষ্টা দেখা যাচ্ছে। এ যেন রাজপথের চেয়ে নর্দমাটাকেই prominence দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু কেবল নর্দমাকে যদি তুলে ধরি তো

তার থেকে ভালো কি আশা করা যাবে? নর্দমাটা তো ময়লা নিষ্কাশনের পথ—সেটা তো চলবার পথ নয়। চলার পথ হল রাজপথ। সেটা যতদূর সম্ভব আবর্জনামুক্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অবশ্য এটা ঠিক, আদান-প্রদানের ভেতর দিয়েই কৃষ্টি সমৃদ্ধ হয়, কিন্তু কবি বা লেখককে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, অপরের কিছু গ্রহণ করতে গিয়ে নিজের বৈশিষ্ট্য যেন বিসর্জন দিতে না হয়।

রেডিওতে একদিন 'মহিলা মহলে'র একটা আলোচনা শুনেছিলাম। তাতে আশাপূর্ণা দেবী বিশেষ একটা অংশ নিয়েছিলেন। তাঁর একটা কথা আমার খুব ভাল লেগেছিল। ভাষাটা ঠিক মনে নেই তবে ভাবটা হচ্ছে—আধুনিক সাহিত্যকে আমরা শতমান দিই; ঘৃণা করি না। কিন্তু সমস্ত রচনার পেছনে যেন একটা মহৎ উদ্দেশ্য থাকে, একটা বড় আদর্শের দিকে এগিয়ে যাবার ইঙ্গিত থাকে।

উপলব্ধি অনুভূতির সঙ্গে সৃজন-শক্তিটি থাকলে যে কোনও অনুভূতি ব্যক্ত করতে পারা যায়।

১০।। মানুষের এমনি অবস্থা যে, বাসনাকে জীবনের চেয়েও ভালবাসে। প্রতি মুহূর্তে এটা আমরা দেখছি। প্রাণপণ ক'রে টাকার পিছনে দৌড়াচ্ছে। ভোগ লালসা মেটাতে গিয়ে হয়তো রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। লোভের বশবর্তী হয়ে খেতে গিয়ে শরীরটাকে জখম করছে, প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিচ্ছে। এর থেকেই প্রমাণ হয় না কি, মানুষ জীবনের চেয়েও বাসনাকেই বেশি ভালবাসে। অথচ সে কি শান্তি পায়? কিছুতেই পায় না। কিন্তু বাসনাকেও ছাড়তে পারে না।

কাজেই এমন একটা বাসনার সৃষ্টি করা ভাল নয় কি, যাকে দিব্য বাসনা বলা যায়? শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি কথা আছে—ঈশ্বর-কামনা কামনার মধ্যে নয়। তাই দিব্য-বাসনা বাসনার মধ্যে নয়। কারণ, সেখানে

বাসনাটা ভূমার রাজ্যে গিয়ে পড়ছে। সে বাসনা পরিপূর্তির জন্য দেহপাত হলেও সে দেহপাত একটি গৌরবমূলক পরিণতিতে নিয়ে যায়। একটি মহৎ ইতিহাস সৃষ্টি করে। সে জীবনপাত ধ্বংস নয়, ত্যাগের পরাকাষ্ঠা। তার পরিণাম অমৃতত্বলাভ।

১১।। বর্তমান ভারতীয় সমাজের দিকে তাকিয়ে দেখলে বড় নিরাশ হতে হয়। কারণ, ভারত তার ঐতিহ্য হারাতে বসেছে। বর্তমান ভারতের অনেক মানুষকে দেখলে চেনা যাবে না, সে কোন দেশের মানুষ। অথচ কোনও দেশেরই ভাল জিনিসটা কিন্তু সেখানে ঠিক দেখা যাচ্ছে না। বিদেশি হাওয়া একটা এসেছে। লেখাপড়ার মাধ্যমে স্কুলে aristocracy-র নাম দিয়ে কতকগুলি artificial আদবকায়দা শেখানো হচ্ছে। এর ভিতরে কিছুটা discipline বা কিছুটা culture যে সৃষ্টি হচ্ছে না, তাও নয়। কিন্তু একটু তলিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে, তলায় তলায় একটা ঐতিহ্য প্রচণ্ডভাবে ক্ষয়ের দিকে চলেছে।

যার ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, প্রাচীন ভারত তথা প্রাচীন বাঙালি সমাজের মধ্যে aristocracy -র আদবকায়দার ছদ্মবেশে একটা হৃদয়হীন সমাজ সৃষ্টি হয়ে গেছে। একই flat-এর লোক তার সামনের বা পাশের flat-এর লোকের সুখে দুঃখে সম্পূর্ণ উদাসীন। অথচ তফাৎ হয়তো ছোট্ট একফালি করিডোর। ঐ করিডোরের ব্যবধান পাঁচশ মাইলের ব্যবধানের মতোই হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেটুকু পরস্পরের ভিতরে আদান-প্রদান, সেটুকুও artificial, অন্তরের স্পর্শ সেখানে বিন্দুমাত্র নাই। এখনকার যুগের ছেলেমেয়েদের মানুষ করার ভিতরেও এই artificial ভাব চলে এসেছে।

অথচ আমাদের এই দেশে প্রতিবেশী বলে একটা আশ্বাসযুক্ত শব্দ ছিল। বাড়ির ছেলে বিদেশে গেলেও প্রতিবেশীর ওপর ভরসা রাখত, পাশের বাড়ির মানুষটির ওপর আত্মীয়স্বজনের ভার দিয়ে যেত। তখনকার

মানুষ খুঁজতো সৎ প্রতিবেশীযুক্ত পাড়া। প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের একটা অন্তরঙ্গতা স্বাভাবিক ভাবেই গড়ে উঠত।

ইংরাজি শিক্ষার মাধ্যমে কিছু কিছু discipline, যাকে বিদেশি হলেও একদিক দিয়ে ভাল বলা চলে, সেগুলি থাক, বিদেশি জ্ঞানও অর্জিত হোক, ক্ষতি নাই। কিন্তু তার সঙ্গে প্রতিটি বাপ মাকে মনে রাখতে হবে, তাদের সন্তান সন্ততিরা ভারতবর্ষের ছেলেমেয়ে বা বাংলার ছেলেমেয়ে। কাজেই পাশাপাশি ভারত তথা বাংলার ঐতিহ্যপূর্ণ শিক্ষাগুলিও দেওয়া উচিত। বেশভূষায়, আচার আচরণে, ধর্মবিশ্বাসে সবকিছুর মধ্যে দেশীয় বৈশিষ্ট্যকে ঐতিহ্যমণ্ডিত ক'রে তুলতে হবে। শহরের ঘরে ঘরে এখন তুলসীতলা নাই সে কথা সত্যি। কিন্তু দেয়ালে টাঙ্গানো ছোট্ট দেবমূর্তি, অথবা ছোট্ট একটি ঠাকুরের সিংহাসন সাজানো, এটি তো রাখা চলতে পারে, যেখানে গৃহবধূরা সকাল সন্ধ্যা গৃহকোণে একটু ধূপ দীপ দেখাতে পারবে আর বাড়ির ছেলেমেয়েরা সকাল সন্ধ্যা একটু প্রণাম করতে পারবে, প্রার্থনা জানাতে পারবে।

ছোটবেলা থেকেই হিন্দু ধর্মচেতনার মধ্য দিয়েই ভারতের সমাজ গড়ে উঠেছে। আজ তার ব্যতিক্রম কেন ঘটলো জানি না। কে বা কারা এর জন্য দায়ী সে বিচার ক'রেও লাভ নাই। এখন ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেককেই একটু চিন্তা করতে হবে, চেষ্টা করতে হবে কিভাবে আবার সেই দিন ফিরিয়ে আনা যায়। মনে হয়, discipline বলতে যদি নিয়ম-শৃঙ্খলা হয়, তাহলে ভারতীয় সমাজে discipline আনতে গেলে আগে আধ্যাত্মিক চেতনাটা জাগিয়ে তুলতে হবে। শুধু মাত্র শুকনো বিদেশি সভ্যতার অনুকরণের মাধ্যমে ভারতের সমাজে discipline আনা সম্ভব নয়। নিয়মশৃঙ্খলা আনতে গেলে সর্বপ্রথম হিন্দুধর্মাচরণ ও হিন্দুসংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য বাধ্যকরী ভাবে বজায় রাখতে হবে।

১২।। প্রশ্ন ঃ মেয়েদের স্বভাবের মধ্যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কোনগুলি তাদের আদর্শ জীবনের পক্ষে অন্তরায়?

উত্তর ঃ মেয়েদের কতকগুলি সংস্কারজাত স্বভাব আছে যেগুলির আধিক্য ঘটলে সত্যিই তাদের আদর্শ জীবন গঠনে যেমন অসুবিধা হবে, তেমনি চারপাশের পরিবেশকেও অসুবিধায় ফেলবে। অবশ্য সেই দোষগুলি স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে প্রায় সকলেরই কিছু না কিছু থাকে। কিন্তু মেয়েরা সংসার এবং সমাজের ধারয়িত্রী। কাজেই তাদের ক্ষেত্রে যে কোনও দোষেরই আধিক্য ঘটুক না কেন, সেইটি মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায় সুশৃঙ্খল জীবনের দিক থেকে। সেই দোষযুক্ত স্বভাবগুলি হচ্ছে খুবই সাধারণ, যেমন, কথায় কথায় অভিমান, বৃথা জিদ, ঈর্ষা, সীমিত বুদ্ধি ও ক্ষুদ্রতা, দাবি ও অধিকার বোধ, মোহিনী শক্তির বিস্তার ইত্যাদি।

দেবীত্বে বা মাতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হতে গেলে মেয়েদের এই স্বভাবগুলির ঊর্ধ্বে উঠতে হবে। কি আশ্রম জীবনে, কি দিব্য-সংসার জীবনে কেউ যদি আদর্শ নারীর স্থান পেতে চায় তাহলে এগুলিকে বর্জন ক'রে চলতেই হবে।

প্রথম ধরা যাক অভিমান। অনেক সময় এটা কোমল মনের পরিচয় বলেই মনে হয়। কিন্তু অল্প স্বল্প অভিমান কোমল মনের পরিচয় হলেও সেটা যখন চরম পর্যায়ে দাঁড়ায় তখন কিন্তু তার ফল এমন ভয়াবহ হয়ে ওঠে যে, তখন মনে হয় এ অভিমান কোমলতার প্রকাশ নয়, অত্যন্ত কঠিন মনের প্রকাশ। কোমল মনের পরিচয় হবে—যে মনে কোনও কিছুই বেশিক্ষণ শক্ত হয়ে বাসা বাঁধতে পারে না, যে মন একটুতেই গলে যায়। শিশুদের ক্ষেত্রে এটা দেখা যায়।

কাজেই মনে রাখতে হবে, কোমলতা আর অভিমান এক নয়। অহংকারের একটু সরস প্রকাশকেই সাধারণতঃ অভিমান বলা হয়। কাজেই

এটিকে মারাত্মক আকার ধারণ করতে না দেওয়াই ভাল। দিলে এর জল অনেক দূর গড়ায়।

তেমনি বৃথা জিদ আর নৈতিক দৃঢ়তাও এক নয়। এসবগুলি আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে বুঝে নিতে হবে এবং সংশোধন করতে হবে। মেয়েদের স্বভাব কোমল হবে, কিন্তু সেটার প্রকাশ হবে অপরের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ মাতৃভাবযুক্ত মনোভাব, দয়া, সেবা ইত্যাদির দ্বারা। এই কোমলতার অর্থ এই নয় যে, নৈতিক দৃঢ়তাকে বিসর্জন দেওয়া। আবার কোমলতাহীনের অর্থ এই নয় যে, কঠোর জিদপরায়ণ হতে হবে। নৈতিক দৃঢ়তার অর্থ আদর্শ জীবনের নীতিতে দৃঢ় থাকা, আধ্যাত্মিক জীবনে গুরু ইষ্টের প্রতি নিষ্ঠায় দৃঢ় থাকা, মহৎ কাজে বা বড় কাজে অপরের বা নিজের ক্ষুদ্রতাকে পরিত্যাগ করা।

নৈতিক দৃঢ়তা এবং বৃথা জিদ এ দুটির ভেতরে পার্থক্য এইখানেই যে, বৃথা জিদ গঠনমূলক কাজ করতে দেয় না, অনেক কিছুই ভেঙ্গে দেয়। অহংকারের তিক্ত প্রকাশ এই অযথা জিদ। কাজেই কোনও মহৎ কাজ এই তিক্ত জিদের দ্বারা হয় না। কিন্তু নৈতিক দৃঢ়তা ভবিষ্যৎ ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে, একটি মহৎ আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করে।

এরপর ধরা যাক ঈর্ষা। সাধারণভাবে মনে হয়, ঈর্ষা শুধু অপরেরেই ক্ষতি করে। কিন্তু তা নয়। একটু তলিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে, ঈর্ষা নিজের ব্যক্তিত্বকে, নিজের চেতনাকেও খণ্ড খণ্ড ক'রে ফেলে। যে ব্যক্তিত্ব, যে চেতনা একটু উদার দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা চালিত হ'লে একদা মহৎ আবির্ভাব হয়ে দাঁড়াত, ঈর্ষা সেই ব্যক্তিত্বমণ্ডিত চেতন সত্তাকে নিজের গণ্ডীবদ্ধ অন্ধকারে লুপ্ত ক'রে দেয়, প্রকাশ হতে দেয় না। তাই ঈর্ষা নিজের ও অপরের উভয়েরই ক্ষতি করে।

তারপরই দেখি সীমিত বুদ্ধি ও ক্ষুদ্রতার অপকারিতা। সীমিত বুদ্ধি

ও ক্ষুদ্রতা আসে গণ্ডীবদ্ধ জীবন থেকে। মেয়েদের ক্ষেত্রে গণ্ডীবদ্ধ জীবনটাই স্বাভাবিক। বিশেষ ক'রে তাদের সংস্কার হচ্ছে গৃহবদ্ধ হয়ে থাকা। কাজেই তাদের দৃষ্টিটা সে গৃহের গণ্ডীকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না, সীমিত দৃষ্টি তার বুদ্ধিকেও ক'রে তোলে সীমিত। যার ফলে স্বার্থপরতাটা তাদের বেশিরকম প্রকাশ হয়। নিজের সংসারটুকু ছাড়া, নিজের প্রিয়জন ছাড়া, তারা আর কিছু চিন্তা করতে পারে না। কিন্তু একটু আত্মদৃষ্টিসম্পন্ন হলেই মেয়েরা মনের এই গণ্ডীটাকে কাটিয়ে দিতে পারে এবং সেটা সহজ হবে যদি তাদের মাতৃভাবটিকে বিশেষভাবে জাগিয়ে তোলে, মাতৃস্নেহটিকে সবার মাঝে অকৃপণ ভাবে বিলিয়ে দিতে পারে। মানুষ হিসাবে স্নেহ বিতরণের পরিমাণ হয়তো কম বেশি হতে পারে কিন্তু পূর্ণ কৃপণতা থাকবে না। এই মাতৃভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে দেখা যাবে ক্ষুদ্রতা, সীমিত গণ্ডীবদ্ধতা, স্বার্থপরতা এগুলি থেকে বেশ খানিকটা ঊর্ধ্বে ওঠা যাবে।

তারপর দাবি বা অধিকার বোধের কথা ধরা যাক। এই স্বভাবটি প্রত্যেক মানুষেরই কিছু না কিছু থাকে। এটা না থাকলে কেউ কোনও কাজে interest পাবে না। কিন্তু এর একটা সীমারেখা থাকা ভাল। মনে রাখতে হবে, ন্যায্য দাবি বা ন্যায় সঙ্গত অধিকার প্রকাশ ততটুকুই ভাল যেটুকুর দ্বারা কোনও বস্তু বা কোনও জীবনকে একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে পারা যাবে বা সেই দিকে খানিকটা গতি দেওয়া যাবে।

অনেকসময় অধিকার বোধ বা দাবিটা দাঁড়িয়ে যায় বৃথা ক্ষমতাহীন কর্তৃত্ব প্রকাশের মত। যার ব্যক্তিত্ব নেই তার কর্তৃত্ব করার অধিকার বোধ বা দাবি তিক্ততারই সৃষ্টি ক'রে। সে চাপ সৃষ্টি অনাসৃষ্টিই ঘটিয়ে তোলে। বিশেষ ক'রে মেয়েদের এইক্ষেত্রে সাবধান থাকা উচিত। অনেক সময় তাদের অধিকার বোধের জিদ পুরুষদের পৌরুষকে ব্যাহত করে, তার চারপাশের মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও ব্যক্তিত্ব সবকিছুকেই বিঘ্নিত করে,

বিব্রত করে। তারা চায় সবাই নিজের সত্তা বিসর্জন দিয়ে তার খামখেয়ালির খেলার পুতুল হোক, কিন্তু এর ফল অত্যন্ত বিষময় হয়ে দাঁড়ায়। এক্ষেত্রে প্রয়োজন গভীর ব্যাপক দৃষ্টি, objective দৃষ্টিভঙ্গি, সামঞ্জস্য বিধান এবং দূরদর্শিতা।

এরপর বলা যায়, মেয়েদের আর একটি সংস্কার মোহিনী শক্তির বিস্তার। এ সংস্কারের একটি সূক্ষ্ম এবং গভীর কারণ হচ্ছে, মহামায়ার মোহকরী সত্তার চরম প্রকাশ ঘটেছে নারী মূর্তির মধ্যে। তাই এই সংস্কারকে সংহত করা সবচেয়ে কঠিন। তবু যারা দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত হতে চায় তাদের এ বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হতে হবে প্রথমেই। গভীর সচেতনতার সঙ্গে এই মোহিনী শক্তিকে পরিণত করতে হবে মহামাতৃ-শক্তিতে।

এক্ষেত্রেও দেখা যায়, মেয়েদের কোমল চালচলন এবং ব্যবহারের মধ্যে অনেক সময় মোহকরী শক্তির প্রকাশ হয়ে পড়ে। কিন্তু তাই বলে কি নির্মম হতে হবে? না, তা নয়। এই কোমলতাকে পবিত্রতায় পরিশুদ্ধ ক'রে নিতে হবে আর তা প্রকাশ করতে হবে দেবভাবের মাধ্যমে। সেক্ষেত্রে দেবী দুর্গা মেয়েদের আদর্শ স্থানীয়া, যেখানে কোমলতা ও কঠোরতা এক চরম দেবশক্তিতে মহিমামণ্ডিত। প্রত্যেকটি মেয়েকে তার সেই দেবীরূপ সামনে রেখে নিজেদের জীবন গড়ে তুলতে হবে। তার জন্য দৈনন্দিন জীবন যাত্রার চলাফেরার কতকগুলি নীতি অনুসরণ করা প্রয়োজন। যেমন—সকলের সাথে ব্যবহার হবে নম্র, ভদ্র, বিনীত অথচ গাম্ভীর্যপূর্ণ। প্রকাশিত হবে কলহপ্রিয়তাবর্জিত শান্ত তেজস্বিতা। সংযত হবে বেশবাস। আচরণ হবে সরল অথচ পবিত্র আনন্দময়।

শেষ কথা, চিরশুদ্ধ নিষ্কলঙ্ক অকৃত্রিম মাতৃভাবে প্রতিষ্ঠিত হ'লে মাতৃজাতির আসল রূপটি ফুটে উঠবে। তখন সহজেই ক্ষতিকর স্বভাব ও সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠে মাতৃজগতে একটি মহান আদর্শ সৃষ্টি করতে পারবে।

১৩।। প্রশ্ন ঃ রাগ ও অভিমানের তফাৎ কী?

উত্তর ঃ দুটোরই মূলে হচ্ছে অহঙ্কার। তবে এ দুটির প্রকাশভঙ্গির ওপর নির্ভর করে তার নাম। এর ভেতরে আবার কম বেশিও আছে। যেমন, রাগের প্রচণ্ড রূপ যেটি সেটিকে আমরা শুদ্ধ ভাষায় বলি ক্রোধ। সাধারণতঃ কোনও কোনও মানুষের ক্ষেত্রে দেখা যায় হঠাৎ রেগে উঠে মাথা গরম হয়ে গেল কিন্তু সেটা বেশিক্ষণ থাকে না। হয়তো দুটো একটা বলে ফেলল, আবার জল হয়ে গেল। সতের রাগ জলের দাগ। সে রাগে কোনও ক্ষতি হয় না। সেগুলো স্বাভাবিকভাবে প্রত্যেক মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি বা instinct-এ অনুস্যূত হয়ে আছে। কিন্তু এই রাগই যখন প্রচণ্ড আকার ধারণ করে, একটা বিষময় পরিণতির সৃষ্টি করে, তখন সেটিকে বলি প্রচণ্ড রাগ বা ক্রোধ। সেটি একান্তভাবে বর্জন করা উচিত। রাগ হ'ল, দু এক কথা বলে ফেললাম। সেখানেই চুকে গেল ব্যাপারটা। তা না ক'রে এক একটি মানুষ থাকে যারা সামান্য ঘটনাকে নিয়ে মনের ভেতর brood করতে থাকে, জের টেনে রেখে সারা জীবনের মত পুষে রাখে। এই রাগগুলি একান্ত ক্ষতিকর—শরীর ও মন দুটোর জন্যই।

ঠাকুর সত্যানন্দদেব বলতেন, এই ধরণের রাগ ভেতরে পুষে রাখলে মাথা শুদ্ধ খারাপ হয়ে যায়। মানুষ পাগল হয়ে যায়। রোগগ্রস্ত হয়ে যায়। মনের পক্ষে তো এটা ক্ষতিকর বটেই। ঠাকুরের কাছে শুনেছি প্রচণ্ড রাগী একটা মানুষের শরীরের রক্ত টেনে নিয়ে যদি আর একজন মানুষের শরীরের মধ্যে push করা যায় তো তার মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে যায়। এমনি বিষ সে রাগের। কাজেই এ ধরণের যে রাগ বা ক্রোধ, তাকে পরিত্যাগ করা সর্বভাবে কর্তব্য।

আর অভিমানের ব্যাপক অর্থ যদি আমরা করি তাহলে, যেটাকে মহাজনরা বলেছেন, “নরক মূল অভিমান”, সে অভিমান হচ্ছে

অহংকারেরই আর একটি রূপ। যেমন, আমি বড়লোক, আমি ব্রাহ্মণ, আমি কায়স্থ, বড় জাত, বড় বংশজাত, কি আমি পণ্ডিত, জ্ঞানী ইত্যাদি নানা রকমের অভিমান, যার ফলে একটি মানুষের থেকে আর একটি মানুষের একটা বিরাট ব্যবধান এসে যায়। এই অভিমানও আমাদিকে আধ্যাত্মিক পথ থেকে সরিয়ে দেয়। তবে এই অভিমানের যেটি মিষ্টি রূপ বা একটু কোমলরূপ আমরা দেখি, যেমন, আমি তোমাকে দুটো কথা বললাম, তোমার মনে সেটা লাগলো, তোমার অভিমান হ'ল, তোমার দুঃখ হ'ল, তুমি কাঁদতে লাগলে। কোনও সামান্য ব্যাপারে একটু অভিমান হল, সেগুলো ক্ষতিকর নয়।

তবে এই অভিমান এই রাগের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার একটা process আছে আধ্যাত্মিক জগতে। কথামৃতে এটি পাই। যেমন কোনও ভক্ত ঠাকুরের কাছে বিশেষ কৃপা পাচ্ছে। আর একটা ভক্তের তাই দেখে একটু কান্না পেল, অভিমান এল, ঠাকুর, তুমি ওকে দর্শন দিলে, কৃপা করলে আমাকে দিলে না, এই দুঃখ বা অভিমান হয়ে গেল। এই ক্ষোভটা খারাপ না। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব যেমন বলেছেন—'রামপ্রসাদকে দেখা দিলি, আমাকে দেখা দিলি না।' এগুলোতে বরং ভক্তি পথে এগিয়ে যাবার প্রেরণা পাওয়া যায়। তবে কোনও ভক্তকে ঠাকুর কৃপা করলেন, তাই দেখে মনে ভীষণ ঈর্ষা আক্রোশ এলো এবং চেষ্টা করতে লাগল তাকে কী ক'রে সরিয়ে নামিয়ে তার নিন্দে করে ঠাকুরের কাছ থেকে দূরে আনা যায়। এটা কিন্তু খুবই ক্ষতিকর।

ঈর্ষা থাকলে হবে না। ভগবান থেকে নিজেই দূরে সরে যাবে। সেটা হীনতার পর্যায়ে পড়বে, ভক্তির পর্যায়ে পড়ে না। আবার রাগের মোড় ঘোরানোর দৃষ্টান্তও আমরা শাস্ত্রে পাই, যেমন কথামৃতে বলেছেন যে, 'রাগ যদি করতে হয় তো নিজের কামনা বাসনার ওপরে রাগ করতে

হয়।' নিজের ওপর রাগ অর্থাৎ ঈশ্বরের পথে যা বাধা তার ওপর রাগ।

নিজের মনই সবচেয়ে বড় শত্রু। বাইরের শত্রুর চেয়ে শতগুণ বেশি ক্ষতি এই শত্রু করতে পারে। কাজেই রাগ যদি করতে হয় এই বাধারূপী মনের উপর করব।

আবার ভক্তিপথে অনুরাগ মিশ্রিত রাগের দৃষ্টান্ত দেখি মহাপ্রভুর জীবনলীলায়। ভক্ত জগদানন্দের অনুরাগ মিশ্রিত রাগ প্রচণ্ড ছিল। যার জন্য মহাপ্রভুকে মাঝে মাঝে বেশ বিব্রত হতে হয়েছে। মহাপ্রভুর সেবার এতটুকু ত্রুটি হলে জগদানন্দ দিশা হারিয়ে ফেলতেন রাগে। চন্দন তেল এনেছেন মহাপ্রভুকে মাখাবেন বলে। মহাপ্রভু অস্বীকার করায় আছড়ে সে তেল ভেঙ্গে ঘরে খিল দিলেন। মহাপ্রভু তখন সাধ্যসাধনা ক'রে সে রাগ ভাঙ্গালেন। এগুলি আমাদের বিচারের আওতায় পড়ে না। এ রাগ অভিমান লীলার রাজ্যের ব্যাপার। আমাদের যে রাগ বা অভিমান জাগতিক রাজ্যে ঘটে থাকে, তার থেকে সাবধান হতে হবে। তার জন্য ঠাকুর প্রার্থনা, নাম, জপ ইত্যাদি নানা উপায় বলে দিয়েছেন।

১৪।। প্রশ্ন ঃ হোমের উপকারিতা কি?

উত্তর ঃ বৈদিক হোম হ'ল জ্যোতির উপাসনা। এ যুগ বড় অন্ধকার যুগ। হোমের পবিত্র শিখা জ্যোতির প্রতীক। হোমাগ্নি প্রজ্বালিত ক'রে অগ্নিকে যে আহ্বান করা হয়, সে তো জ্যোতিকেই আহ্বান করা, অন্ধকারের বুকে আলোকে আহ্বান করা। আবার অগ্নি তো শুধু জ্যোতিরই প্রতীক নয়, অগ্নি শুদ্ধতারও প্রতীক। "অগ্নিশুদ্ধ" ব'লে তো একটা কথাই আছে। Science-ও তো বলছে আগুনে পুড়লে germ নষ্ট হয়। হোমাগ্নিতে তেমনি মনের কলুষ নাশ হয়।

হোমের একটা practical দিক আছে। সাধারণতঃ দেখা যায়, শুধু জপ করতে বসলে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝিমুনি এসে পড়ে, ঢুল এসে

যায়, কিন্তু আগুন জ্বেলে বসলে মনে হবে একটা বিরাট দায়িত্ব রয়েছে, হোমের আগুন যেন নিভে না যায়—কারণ, হোমের নিয়ম হ'ল যতক্ষণ হোম চলবে ততক্ষণ শিখা অনির্বাণ রাখতে হবে। তাছাড়া হোমের বৈদিক ঐতিহ্য, বৈদিক ঋষিদের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। তাঁদের সঙ্গে মনে মনে একটা যোগসূত্র গড়ে ওঠে,ফলে অবচেতনে সেই ঋষিভাব জেগে ওঠে।

বৈদিক যুগ থেকে হোমের একটা ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে—হোম হ'লে কল্যাণ হয়। দেশে অনাবৃষ্টি দেখা দিয়েছে, হোম হয়েছে, যজ্ঞ হয়েছে। দুর্ভিক্ষ মহামারী হয়েছে, হোম হয়েছে। আর তার ফলও পাওয়া গেছে। তাই ঠাকুর সত্যানন্দদেব হোমের ওপর এত গুরুত্ব দিয়েছেন। আমাদের এখানে যে নিত্য হোম হয়, সেটা নিত্য কল্যাণ-হোম—সবার কল্যাণ কামনা নিয়েই এ হোম হয়।

১৫।। প্রশ্ন ঃ বিরজা হোম কাকে বলে?

উত্তর ঃ বিরজা হোম হ'ল সন্ন্যাসের হোম। এক একটি মন্ত্রোচ্চারণ ক'রে হোমাগ্নিতে আহুতি দিয়ে প্রার্থনা জানাতে হয় এই বলে যে, আমাতে অবস্থিত পঞ্চভূত, পঞ্চবায়ু, আমার পঞ্চকোষ, আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়বিষয়, সংস্কার ও কর্মাদি শুদ্ধ হোক। হে অগ্নি, তোমাতে আহুতি প্রভাবে আমি যেন রজোগুণ প্রসূত সমস্ত মলিনতা থেকে মুক্ত হয়ে জ্যোতিঃস্বরূপ হই।

এইভাবে পবিত্রতা লাভ ক'রে জ্যোতিঃস্বরূপ হওয়ার জন্য স্ত্রী, পুত্র, বিষয়, নাম, যশ এমন কি সুন্দর শরীর লাভের বাসনা ইত্যাদি সমস্ত রকম বাসনা অগ্নিতে আহুতি দিয়ে নিঃশেষে সব কিছু ত্যাগ করার জন্য যে হোমানুষ্ঠান, তাই হ'ল বিরজা হোম। শুধু যে নিজের জ্যোতিঃস্বরূপ হওয়া বা ব্রহ্মপ্রাপ্তি হোক্ তা নয়, সেই সঙ্গে সর্বভূতের কল্যাণ প্রার্থনাও করতে হয়।

১৬।। প্রশ্ন ঃ সবাইকে কি সন্ন্যাস দেওয়া যায়?

উত্তর ঃ আমাদের ঠাকুর শ্রীসত্যানন্দদেব সন্ন্যাসের কঠোর বিধি নিয়ম অনেক সহজ করে দিয়েছিলেন। তবে সেটা ঠাকুরের মত বিরাট পুরুষের পক্ষেই সম্ভব ছিল। তাছাড়া সন্ন্যাস দেওয়ার ব্যাপারে ঠাকুরের খুব কঠোর না হওয়ার আরও একটা কারণ হচ্ছে, সন্ন্যাস প্রার্থীকে একটা chance দেওয়া। এ যুগ এমন যে, সন্ন্যাস লাভের উপযুক্ত অবস্থায় সাধক reach করলে তবে তাকে সন্ন্যাস দেওয়া হবে—এ নিয়ম রাখতে গেলে দেখা যাবে কারুরই সন্ন্যাস পাওয়া হয় না। তাই ঠাকুর কোনও কোনও ক্ষেত্রে মোটামুটি একটু দেখে নিয়ে গৈরিক দিতেন, সন্ন্যাস দিতেন। এতে সে আরও এগিয়ে যাবার প্রেরণা পেত।

কারুকে হয়ত তিন বছর ব্রহ্মচর্য পালন করার পরই সন্ন্যাস দিয়েছেন, আবার কারুকে হয়ত অনেক দেরিতে দিয়েছেন। আবার এমনও হয়েছে, অতও দেখেন নি, তাড়াতাড়ি সন্ন্যাস দিয়েছেন—সে ক্ষেত্রে দেখা গেছে প্রার্থীর হয়তো মৃত্যু যোগ কি একটা বড় রকমের ফাঁড়া ছিল—সন্ন্যাস দিয়ে তার ফাঁড়াটা কাটিয়ে দিলেন, কি হয়ত আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে তাকে রক্ষা করলেন।

কাজেই সন্ন্যাস দেওয়ার ব্যাপারে ঠাকুরকে দেখেছি প্রয়োজনের দিকটার ওপরই বেশি গুরুত্ব দিতে। এখানে ছোট বড়র প্রশ্ন নয়। এত সময় পর্যন্ত অমুক অমুক নিয়ম পালন করতে হবে, সেই অবস্থা লাভ হবে তবে পাবে, এ কঠোরতা নয়। কাকে কখন কী ভাবে দিলে তার পরম কল্যাণ হবে, যতদূর দেখেছি, সেটাই ছিল ঠাকুরের কাছে সন্ন্যাস দেওয়ার বিচার্য বিষয়। তিনি ব্রহ্মস্বরূপ, কাজেই তিনি জানেন কোন শিষ্যকে কখন কি ভাবে guide করলে তার উন্নতি হবে।

১৭।। প্রশ্ন ঃ আচ্ছা, শ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেবের "বহু কথার বহুদোষ/ভেবে চিন্তে কথা কোস্" বাণীটির মানে কি?

উত্তর ঃ দেখো, যারা অত্যধিক কথা বলে, দেখবে তাদের কথাবার্তায় অনেক অসংলগ্ন কথা বেরিয়ে পড়ে, অযথা বৃথা কথা এসে পড়ে, আজেবাজে কথা বেরিয়ে পড়ে। কথা বলাই যাদের স্বভাব তারা উদ্দাম ব'কে চলে। এদের জন্যই ঠাকুরের এই সাবধানবাণী। এ-সব মানুষ যখন রেগে যায় এদের তখন লঘু গুরু জ্ঞান থাকে না। তিনি আমার গুরুজন, তাঁকে এ কথা বলতে নেই—সে কথা তখন তাদের মনে থাকে না।

কিন্তু যারা কম কথা বলতে অভ্যস্ত, তারা রাগলেও নিজেকে সংযত করতে পারে। কাজেই কথা যখন বলবে, ভেবে চিন্তে বলবে, সৎ অসৎ এই দুটো বোধ রেখে বলবে। ভাববে—আমি যা বলছি, সৎ বলছি, না অসৎ বলছি। বলার আগে চিন্তা করবে, যে কথা বলতে চাইছি সে কথা এখানে বলার প্রয়োজন আছে না অপ্রয়োজনেই বলতে যাচ্ছি। সব সময় মনে রাখবে—অনেক কথা বলতে গেলে, ভেবে চিন্তে কথা না বললে, অনেক আজেবাজে কথা বেরিয়ে পড়বে।

এই যে সব শাস্ত্রবাক্য আপ্তপুরুষেরা বলেছেন, সে সবই এক একটা ছোট্ট কথার মধ্যে অনেক কথা। একটা ছোট্ট সূত্র দিলেন, কিন্তু তাঁর সেই বাণীটির কত অর্থ, কত ভাব। দেখো, তাঁরা ছিলেন সংযত-বাক, অল্প কথা বলতেন। বাক-সংযম অভ্যাস করলে কথার মধ্যে একটা শক্তি এসে যায়, জোর এসে যায়—তাই কম কথা বলার অভ্যাস করলে তোমাদের কথাতেও সেই জোর এসে যাবে, লোকে মেনে নেবে।

হাতের তীর একবার ছুঁড়লে যেমন আর ফেরে না তেমনি মুখের কথা একবার বেরিয়ে গেলে আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। ভেবে চিন্তে কথা না বলার জন্য কত সময় দেখা যায় ভাইয়ে ভাইয়ে বন্ধুতে বন্ধুতে ঝগড়া লেগে গেছে, পিতাপুত্রে বিভেদ হয়ে গেছে, সংসারে কত অশান্তি সৃষ্টি হয়েছে, গৃহবিবাদ লেগেছে। একটি অসংলগ্ন অসংযত কথার জন্য

এমন কি দেশে দেশে পর্যন্ত লড়াই বেধে যায়। আর এ-রকম ঘটনা তোমরা তো প্রায়ই দেখেছ যে, দুই বন্ধুতে আজেবাজে কথা হতে হতে হঠাৎ একজনের একটা অসংলগ্ন কথায় অপর জন চটে গেল—তুই কেন বললি এ-কথা? তার পাল্টা ও বলে, তুই কেন বললি ও-কথা? এইভাবে কথার পিঠে কথা বেড়ে যায়, রাগও বেড়ে যায়, শেষে হাতাহাতিতে শেষ পরিণতি।

কাজেই, বর্তমানে এই অসংযত কথার যুগে আমাদের ঠাকুর একটি বিরাট মন্ত্র দিয়ে গেলেন "বহু কথার বহু দোষ/ভেবে চিন্তে কথা কোস" বাণীটির মধ্যে। ঠাকুর ছিলেন আপ্তপুরুষ—তাই আপ্তবাক্য দিয়ে গেলেন।

বড় বড় মহাপুরুষরা দেখবে প্রায়ই মৌনী হয়ে থাকেন। বাক-সংযমের ফলে তাঁদের এমন শক্তি এসে যায় যে, দেখা যায়, মৌনী থাকার পর তাঁরা যাকে যা বলেন সেটা ফলে যায়। সাধু মহাপুরুষ ছাড়াও, অধ্যাত্ম জগতের বাইরেও অর্থাৎ জাগতিক ক্ষেত্রেও যাঁরা বড় হয়েছেন, মহাপুরুষের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছেন, তাঁদের জীবনেও দেখবে অনেকেই কিছু সময় করে মৌনব্রত অবলম্বন করেছেন, মৌন থাকা অভ্যাস করেছেন। মহাত্মা গান্ধী তো প্রত্যেক বছর কিছু দিন করে মৌনী থাকতেন।

আবার বেশি কথা বলার কত দোষ দেখো—আশ্রমে থিয়েটার হচ্ছে—তোমাদের মতই সব অল্প বয়সের ছেলেরা দেখছে, কিন্তু থিয়েটার কি দেখছে? কেবল কলরোল করছে। সামনে দিয়ে কেউ বেরিয়ে গেল, তা তাকে উদ্দেশ্য ক'রে ঠাট্টা করল কি অযথা একটা কিছু বলে দিল। অনর্গল ব'কে যাচ্ছে, কী যে বলছে তা হয়ত নিজেরাই বোঝে না— নিজেরাও দেখছে না, পরকেও দেখতে দেয় না। শত চেষ্টা ক'রেও তাদের থামানো যায় না। ফলে ড্রপ ফেলে দিতে হল। কি অভদ্রতা বলো তো? তোমাদেরই আনন্দ দেবার জন্যে থিয়েটার হচ্ছে, কিন্তু তোমরাই দেখতে পেলে না। সব পণ্ড হল কেবল অনর্গল বৃথা কথা বলার জন্যে।

শিশুরা একরকম কলরোল করে—তারা কিছু বোঝে না। শিশুমন, কাজেই সেটা মেনে নেওয়া যায়—কিন্তু তোমরা তো ঠিক শিশু নও, তোমাদের বোধ হয়েছে, তোমরা যদি শিশুদের মত কলরোল কর তো সেটা কি শোভনীয় হয়?

ভালো আলোচনা করবে, যার যেদিকে taste সে সেই বিষয়েরই আলোচনা করবে। অভদ্র ভাষা ব্যবহার, অলস সময় কাটানো এগুলো যেন এখন মজ্জাগত হয়ে গেছে। এগুলো থেকে সাবধান হবে। এখানে আমাদের এই আশ্রমের স্কুলে যারা পড়ছ তাদের কাছে এটুকু আশা করব যে, তারা অলস ছেলেদের মত এরকম অভদ্র আচরণ করবে না, বিশেষ ক'রে মায়েদের প্রতি তোমাদের যেন একটা সম্ভ্রম বোধ সব সময় বজায় থাকে।

আমাদের একটি সাধু ছেলে সেদিন দিল্লী থেকে ঘুরে এসে বললে, সেখানে একদিন বাঙালী পল্লী দিয়ে তারা বেড়াতে যাচ্ছিল, সেই পাড়ার কতকগুলি ছেলে তাদের গেরুয়াধারী দেখে ব্যঙ্গের সুরে একটা remark করল। অথচ অন্য যে সব অবাঙালী পাড়ার মধ্যে দিয়ে তারা যাতায়াত করেছে সে সব পাড়ার সর্বত্র অবাঙালী ছেলেরা তাদের দেখা মাত্র "নমস্তে মহারাজ" বলে কত ভদ্রভাবে সম্বোধন করেছে। যে সাধুটিকে বাঙালী ছেলেরা অপমান করেছিল সে সাধুটি সঙ্গে সঙ্গে ওদের জিজ্ঞাসা করেছিল—তোমরা বোধ হয় বাঙালী? ছেলেগুলি প্রশ্ন করলে, কী ক'রে বুঝলেন? সাধুটি বললো, তোমাদের ভাষায়। ... কি লজ্জার কথা বল তো! এতে কি আমাদের খুব সুনাম হচ্ছে? এ-সবই ঐ বেশি কথা বলার ফল—স্বভাব খুব হাল্কা হলে—ভাল চিন্তা সৎ চিন্তা করতে পারে না।

১৮।। প্রশ্ন ঃ তিনি সত্য-শিব-সুন্দর, তাহলে এই অসত্য অশিব অসুন্দর এসব এল কোথা থেকে?

উত্তর ঃ সমুদ্রে যদি কিছুটা নর্দমার জল গিয়ে পড়ে তাহলে সেটাও সমুদ্রের রূপ পেয়ে যায়, সমুদ্র হয়ে যায়, তার নিজের অস্তিত্ব কিছু থাকে না। তেমনি তাঁর ভেতর কী আছে বলা যাবে না। যদি অসত্য অশিব অসুন্দর কিছু থাকেও তাহলে সেটাও হয়ে যাবে সত্য শিব সুন্দরেরই রূপ। ভূমায় পড়লে সবই তখন তাঁর সত্তায় সত্তান্বিত হয়ে যায়। অবশ্য এইভাবে সত্য শিব সুন্দর রূপে তাঁকে অভিহিত ক'রেও তাঁকে ঠিক বোঝানো যায় না। এ যেন ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণের মত— ব্রহ্ম কী তা মুখে বলা যায় না— যেমন, সমুদ্রের মধ্যে দাঁড়িয়ে কিছু বলা যায় না। তখন শুধু সমুদ্রের মাঝে হাবুডুবু খাওয়া—যা আছে তাই। কেমন ঘি? না যেমন ঘি। একটা কিছু খেলে তার ঠিক স্বাদটা বলা যায় না, বড় জোর বলা যায় টক, কি মিষ্টি, কি ঝাল। তাঁর মধ্যে বীজাকারে সব আছে।

সর্বোচ্চ তত্ত্বটা বোঝাবার জন্য আমরা relative world-এর মধ্যে থেকেই আমাদের সর্বোচ্চ ধারণা দিয়ে ঐভাবে তাঁর definition দেবার চেষ্টা করি। জগতে যা কিছু ভাল তাই তাঁতে আরোপ ক'রে তাঁকে ধারণা করার প্রয়াস পাই—যেমন, আমরা তাঁকে বলি জ্যোতিঃস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, চিৎস্বরূপ ইত্যাদি। কিন্তু এভাবেও তাঁকে ঠিক বলা হয় না। এতেও তাঁকে limitation-এর মধ্যে আনা হয়। ঠাকুর যেমন বলতেন, একশ হাত নেমে এসে ওঁ বলি অর্থাৎ শুধু বীজ বা প্রণবটুকু বলার জন্যই একশ হাত নেমে আসতে হয়—তাহলে তাঁকে আরো বিশেষণে বিশেষিত করে বলতে হলে আরও কত নেমে আসতে হয়!

কাজেই অসত্য অশিব অসুন্দর যা কিছু তা এই relative world-এ। শঙ্করাচার্যের 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা'র মত relative world-এর মধ্যে থেকে এগুলো উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এগুলো জাগতিক সত্য। ব্যবহারিক সত্য—যেমন, ঠাকুর বলেছেন আমাকে কাঁটা খোঁচা দিল, আমার

গা দিয়ে রক্ত পড়ছে, বুঝতে পারছি লাগছে, তখন কি বলা যায় যে, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা! তখন এই ব্যবহারিক সত্যটাই সত্য। ঠাকুর কাঁটা খোঁচার সহজ উপমা দিয়ে তত্ত্বটি কি সুন্দর বুঝিয়ে দিয়েছেন।

১৯।। প্রশ্ন ঃ প্রকৃত জ্ঞান কী? প্রকৃত জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্য কী? উপায় কী?

উত্তর ঃ ভগবানকে, ঈশ্বরকে জানাই প্রকৃত জ্ঞান। এখন, যোগী ঈশ্বরকে জানেন পরমাত্মারূপে, জ্ঞানী তাঁকে জানেন ব্রহ্মরূপে, আর ভক্ত ভগবানরূপে। তাই যোগীর কাছে আত্মজ্ঞান, পরমাত্মজ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। জ্ঞানীর কাছে ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মোপলব্ধিই প্রকৃত জ্ঞান। তেমনি ভক্ত যে, তার কাছে ভগবানকে জানাই প্রকৃত জ্ঞান। আবার ভগবানকে জানার মধ্যেও অনেক রকম আছে। যেমন, কেউ শিবকে চায়, কেউ রামকে, কেউ কৃষ্ণকে, কেউ বা তাঁকে কালী বা দুর্গারূপে পেতে চায়। অর্থাৎ যার যেটা ইষ্ট, যেটা ভাল লাগে, সে ঈশ্বরকে সেইভাবেই ডাকে বা পেতে চায়। এই তোমরা যে বিদ্যালাভ করছ—এই জ্ঞান, বা পণ্ডিতরা যা জানছেন, scientist-রা যা জানছেন—এ সবই হল জাগতিক জ্ঞান—এর কোনটিই প্রকৃত জ্ঞান বা আসল জ্ঞান নয়। এ জ্ঞানে মানুষের চাওয়ার শেষ হয় না বরং একের পর এক চাওয়া বেড়ে চলে। ফলে মানুষ শান্তি পায় না। মানুষ আনন্দ চায়, মানুষ শান্তি চায়, কিন্তু পায় না। সে বোঝেও না ঠিক কিসে তার শান্তি হবে, কিসে তার আনন্দ হবে। জানে না কিসের পিছনে সে ছুটছে—কী তার জীবনের উদ্দেশ্য? তাই ঠাকুর বললেন, মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য হল তাঁকে জানা। ভগবানকে জানা। তাঁকে জানলে, তাঁকে পেলে আর জানার কিছু থাকে না, চাওয়ার কিছু থাকে না—সব জানা সব পাওয়া হয়ে যায়। আর তখনই ঠিক ঠিক শান্তি হয়, পরম আনন্দ লাভ হয়। তাই প্রকৃত জ্ঞান এবং জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য হল তাঁকে জানা ও তাঁকে পাওয়া।

তাঁর জন্য ব্যাকুল হতে হয়। তাঁকে পাবার উপায় জেনে নেবার

জন্য গুরু খুঁজে নিতে হয়। গুরু পথ দেখিয়ে দেবেন, বলে দেবেন কাকে কি ভাবে কোন পথে চলতে হবে। নিষ্ঠার সঙ্গে সেই গুরু-নির্দিষ্ট পথ ধরে চললে তাঁর কাছে পৌঁছানো যায়, তাঁকে লাভ করা যায়, তাঁকে জানা যায়।

২০।। প্রশ্ন ঃ 'সমন্বয়ী দর্শন'-এ আছে 'একমাত্র যোগ প্রেমযোগ'। জ্ঞানযোগ, রাজযোগ সবই কি প্রেমযোগের মধ্যে পড়ে?

উত্তর ঃ সাধারণ বিচারে জ্ঞানপথ ও যোগপথের মধ্যে একটা পার্থক্য আমাদের চোখে পড়ে। জ্ঞানপথে জ্ঞানীরা ব্রহ্মলাভ হয়েছে এ-কথা বলছেন না, বলছেন 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি'—ব্রহ্মই হয়ে যান, সেখানে হওয়ার কথা। আর যোগ সম্বন্ধে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলেছেন 'যোগী পরমাত্মাকে চায়'। এই 'চায়' যখনই বলা হচ্ছে তখন সেখানে একটি ব্যক্তি বিশেষকে চাই এটাই বোঝায়। সেখানে সাধনা হচ্ছে পাওয়ার সাধনা—আর জ্ঞানীর সাধনা হওয়ার সাধনা। জ্ঞানী সব ত্যাগ করেন—দেহ সুখ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে হওয়ার সাধনায় ডুব দেন। কিন্তু মূলতঃ দুটোর মধ্যে একটা যেন যোগসূত্র রয়ে গেছে। আমরা যখন কোনও কিছুর জন্যে ব্যাকুল হই বা কারো পেছনে ছুটি তখন সেই বস্তুটি বা ব্যক্তির প্রতি আকর্ষণ বোধ ক'রে তাকে পাবার জন্য ব্যাকুল হই—সে আকর্ষণ কিসের আকর্ষণ? সেটা ভালবাসারই আকর্ষণ। এই ভালবাসার আকর্ষণেই তাঁকে লাভ করার জন্য আমরা তাঁর পেছনে ছুটি। হিন্দুধর্মে যত রকমের সাধনমার্গ আছে সবেরই মূল কথা প্রেম—গভীর আকর্ষণ। যখনই কিছু পেতে চাই তখন তার প্রতি একটা আকর্ষণ বোধ করি—একটা কিছু না আঁকড়ে ধরে তো তৃপ্তি হয় না।

'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি'। সেখানেও কি প্রেমকে বাদ দিতে পারি? সৃষ্টির প্রাক্ মুহূর্তে ব্রহ্ম-মনে জাগল 'একাকী ন রমতে'—তাঁর মধ্যেও তো প্রেমসত্তা রয়েছে—নিজে একা তৃপ্ত হলেন না—নিজেকে

ভালবাসলেন, নিজেকে উপলব্ধি করলেন, তাই তো সৃষ্টি বিলসিত হ'ল—সেখানেও প্রেমের বীজ লুকিয়ে আছে। সমস্ত সাধনায় দেখা যাচ্ছে একটা রূপকে না ভেবে হচ্ছে না। জ্ঞানপন্থী শঙ্কর—তাঁকে ঘিরেও পূজোর প্রবর্তন হয়ে গেল। আর তিনি নিজেও তো মহাশক্তির কাছে পরাজিত হয়ে ভবানী স্তোত্র লিখলেন।

২১।। প্রশ্ন ঃ গোপালের মা মাহেশের রথ দেখতে গিয়ে সর্বভূতে গোপালের দর্শন পেয়েছিলেন। সেটা কি প্রত্যেকের মধ্যে গোপালকে দেখা, না সকলকেই গোপালের রূপে দেখা অর্থাৎ সব রূপ আকৃতি মুছে গিয়ে গোপাল রূপটাই দেখা?

উত্তর ঃ এ প্রসঙ্গে ঠাকুরের উদ্ধবের সেই জ্ঞানাভিমান চূর্ণ করার ঘটনাটি মনে আসছে। গোপীরা কৃষ্ণ বিরহে বড় কাতর হয়েছেন। সেই অবসরে উদ্ধবের অভিমান চূর্ণ করার জন্য ঠাকুর তাঁকে পাঠালেন গোপীদের তত্ত্বজ্ঞান শেখাতে। তিনি গোপীদের কাছে গিয়ে তাঁদের বললেন, আপনারা কৃষ্ণ বিরহে কাঁদছেন কেন? তিনি স্বয়ং সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, তিনি সবার অন্তরে রয়েছেন। তখন তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁকে কী ক'রে পাবো? উদ্ধব বললেন, সমস্ত জগত থেকে মন গুটিয়ে নিয়ে অন্তরে তাঁর প্রতি মনকে একাগ্র করতে হবে—সেজন্য বৈরাগ্য সাধন প্রয়োজন। তখন তাঁরা বললেন, বৈরাগ্য যোগ বড় কঠিন, ও আমরা পারব না। তুমি বলছ সমস্ত জগত থেকে মন সরিয়ে আনতে কিন্তু তা তো আমাদের পক্ষে অসম্ভব। কারণ, যখনই যমুনা দেখি, তখনই সেখানে কৃষ্ণ যেমন লীলা করছেন ঠিক সেই লীলাই দেখি আমরা। সংকেত বাটে গেলে এখনও মনে হয়, আবার তিনি ঠিক তেমনি ভাবেই বাঁশি বাজিয়ে সংকেত করছেন। তমাল গাছ দেখে মনে হয় ঐ তো তিনি তমালের নীচে দাঁড়িয়ে বাঁশী বাজাচ্ছেন। কাজেই সমস্ত জগতই যে আমাদের কাছে কৃষ্ণময় হয়ে আছে, এসব থেকে

তো মনকে গুটিয়ে নিতে পারব না। সুরদাসের একটা গান আছে "উধো মন নহী ভয়ে দস বীস"—মন একটাই, আর সে মন তাঁরা কৃষ্ণকে দিয়েছেন, কাজেই মনকে গুটিয়ে আনার কথা তো তাঁদের পক্ষে অবান্তর। আবার গোপীদের এই যে সর্বভূতে কৃষ্ণদর্শন, এখানেও দেখছি যমুনার যমুনাত্ব, সংকেত বাটের বাটত্ব, সবই রয়েছে অথচ লীলার স্ফুরণ হচ্ছে—যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে—শ্যামময় সংসার তাঁরা দেখেছেন। গোপালের মায়েরও এই একই অবস্থা—আকাশ মাটি রথ মানুষ সব রয়েছে অথচ গোপাল রয়েছেন সবার মাঝে মাখামাখি। এটি যে দেখেছে সেই জেনেছে।

২২।। প্রশ্ন ঃ মা, গীতায় দেখি অর্জুন বিশ্বরূপ দর্শন করলেন। ভগবৎদর্শন হ'লে তো সব হয়ে গেল—তারপরও কি বোঝার কিছু প্রয়োজন থাকে? তবে আবার কেন আরও সাতটা অধ্যায় ভগবানকে বোঝাতে হল?

উত্তর ঃ আধ্যাত্মিক রাজ্যে বিশ্বরূপ দর্শন চরম দর্শন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই যে চরম কৃপা করলেন এর পেছনে একটা উদ্দেশ্য রয়েছে। সেটি হচ্ছে অর্জুনকে ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত করা। অর্জুন যখন দেখলেন যে, তাঁকে যুদ্ধ করতে হবে তাঁর নিজের ভাই বন্ধু আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে, তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ধনুর্বাণ ত্যাগ ক'রে তিনি বসে পড়লেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন নানা উপদেশ দিয়ে অর্জুনকে উদ্বুদ্ধ করতে চাইলেন। এই সমস্ত উপদেশের পরও ভগবানের অক্ষয় মাহাত্ম্যের কথা শুধু শুনেই তিনি তৃপ্ত হলেন না। তিনি প্রার্থনা করলেন পরমেশ্বরের ঐশী মূর্তি দর্শনের জন্য। শ্রীকৃষ্ণ তখন অর্জুনকে তাঁর ইচ্ছানুরূপ পথে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁর সেই বিরাট অদ্ভুত রূপ দর্শন করালেন। এই দর্শনের মূল উদ্দেশ্য কিন্তু অর্জুনকে ধর্মযুদ্ধে নিয়োজিত করা। তাই শ্রীভগবান অনাদি অনন্ত মহাকালরূপে তাঁর ভীষণ সংহারমূর্তি দর্শন করিয়ে ঐশী উপলব্ধির সঙ্গে

সঙ্গে একটু ভয়ও দেখালেন। Psychology-র দিক্ দিয়ে যেন একটা shock দিয়ে তাঁর মনকে পরিবর্তিত করলেন। এটার প্রয়োজন ছিল।

বিমুখ ছেলেকে মা যেমন মাঝে মাঝে দু-ঘা পিটুনি দিয়ে ঠিক পথে নিয়ে এসে আবার আদর করে, শ্রীকৃষ্ণও তেমনি কিছুক্ষণের জন্য অর্জুনকে এই ভয়ঙ্কর বিশ্বরূপ দেখিয়ে তাঁর অভিপ্রেত পথে নিয়ে এসে সৌম্যরূপ দেখালেন। সাধারণের ক্ষেত্রে বিশ্বরূপ দর্শন একটি চরম অবস্থা, যার পর আর কিছু বাকি থাকে না। কিন্তু অর্জুনের ক্ষেত্রে এই দর্শনটি একটি উদ্দেশ্যমূলক দর্শন এবং স্থান-কাল-পাত্র হিসেবে এটা তাঁর ক্ষেত্রে চরম নয়। কারণ, তাঁকে দিয়ে যুদ্ধ করাবেন বলেই দেখালেন যে, শ্রীভগবান স্বয়ং লোকক্ষয়কারী মহাকাল। বললেন, তুমি কি হত্যা করছ—আমিই সব মেরে রেখে দিয়েছি। তুমি যুদ্ধ না করলেও তারা মরবেই। সুতরাং ওঠো, মোহ ত্যাগ কর, যুদ্ধ কর। তুমি তো নিমিত্ত মাত্র।

এর পরেই আস্তে আস্তে অর্জুনকে ভক্তিতত্ত্বের উপদেশ দিয়ে শরণাগতির পথে নিয়ে যাচ্ছেন। কারণ, অর্জুনের আধারে ঐ উদ্দেশ্যটুকুই সব নয়। তাঁর কর্ম তখনও বাকি রয়েছে। আধ্যাত্মিক উপলব্ধির চরম পেয়েও পরিপূর্ণতা হয়নি। তাই তাঁকে ভক্তি এবং শরণাগতির পথ ধরিয়ে বলেছেন—

"সর্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।"

দর্শনেরও stage আছে। দর্শন দু'রকম। একটিতে ভগবান ভক্তকে টানেন তাঁর দিকে—তাঁকে পাবার আকুতি জাগিয়ে দেন। আর একটি হল, এরপর সাধনা ক'রে ভক্ত তাঁর দর্শন পেয়ে তাঁকে লাভ করল। তারপর আর পাওয়ার বা বোঝবার কিছু থাকে না। জীবন অমৃতায়িত হয়ে যায়। প্রথম দর্শন দিয়ে ভক্তকে একটা ছোঁওয়া দিলেন, আভাস দিলেন, আস্বাদ

দিলেন। কাজেই ভক্ত সাধারণতঃ যে সব দর্শন পায় সেগুলোও অবিশ্বাস করলে চলবে না—সেগুলো হ'ল এগোবার পথে stepping stone।

২৩।। প্রশ্ন ঃ ঠাকুরকে প্রণামী দেওয়া বা কিছু ভাল জিনিস দেওয়া কি ঘুষ দেওয়ার পর্যায়ে পড়ে?

উত্তর ঃ তোমাদের যদি কোনও প্রিয়জন থাকে—ভাই, বোন, কি বন্ধু, যেই হোক, যাকে খুব ভালবাসো, তাকে যদি কিছু উপহার দাও—টাকা, জামাকাপড় যাই বলো—তখন কি মনে হয় যে, তাকে আমরা ঘুষ দিচ্ছি! না, কখনই তা মনে হয় না। ভালবেসে যদি কোনও জিনিস দেওয়া যায় সেটা কখনই ঘুষের পর্যায়ে পড়ে না।

এই ঠাকুরকে দেওয়ার ভিতরে কতকগুলি প্রশ্ন এসে পড়ে। যেমন, মানত করার ব্যাপারে অনেকেই বলে, অবশ্য ঠাট্টার ছলে, "এ তো ঠাকুরকে ঘুষ দেওয়া হচ্ছে।" এখানেও যে দিচ্ছে তার মনের ওপরে অনেক কিছু নির্ভর করে। যেমন, সামান্য কিছু প্রণামী নামিয়ে দিল; অথচ প্রার্থনার ফর্দ রইল অনেক। সাধারণতঃ মানুষ নিজের জন্য কতটা খরচ করে? একটু চিন্তা ক'রে দেখলেই বুঝতে পারবে যে, তার চাহিদার পরিবর্তে সে কতটুকু ভগবানকে দিচ্ছে। নিজের জন্য মানুষ কতটা খরচ করে, ভেবে দেখো। দুশ পাঁচশ, দু' হাজার, তিন হাজার মাসে—যার যে রকম অবস্থা, সে সেরকম খরচ করে। কিন্তু দেবস্থানে গিয়ে কী দেয়—দু' আনা—চার আনা—ষোল আনা। কিন্তু এই ষোল আনা মানতের পরিবর্তে যদি কিছু return না পায় তবে ভগবান মিথ্যা হয়ে যায়। কিন্তু এটাও ঘুষ নয়। এটাকে বলতে পার 'সকাম উপাসনা'। অসুখ বিসুখ থেকে রক্ষা পাবার জন্য বা চাকরি, পাশ ইত্যাদির জন্য পূজা দিচ্ছি, প্রণামী দিচ্ছি—এগুলো সকাম উপাসনা হলেও কিন্তু অনেক ভাল। কিছু তো দেবতার জন্য উৎসর্গ করা হচ্ছে!

ঘুষ দেওয়া কাকে বলে? ধর, একজন বড় উচ্চপদস্থ অফিসার— তার কাছ থেকে একটা কাজ উদ্ধার করতে হবে বাঁকা পথে। বেশ মোটা কিছু টাকা বা কোনও দামী presentation ধরে দিয়ে সে কাজ উদ্ধার করা হল এবং সেই টাকা, সেই দামী উপহার কিসে লাগল? যাকে ঘুষ দেওয়া হল তার ব্যক্তিগত ভোগে লাগল। কিন্তু ভগবানের কাছে নানা ধরণের চাহিদা নিয়ে যত দামী উপহার বা যত টাকাই দিই না কেন, কোনওটি কি তাঁর ব্যাক্তিগত ভোগে লাগে? তিনি কি সামনে এসে দশ হাত মেলে আমাদের দেওয়া ভোগ বা উপহার গ্রহণ করেন? করেন না তো! তাঁর কাছে নিবেদিত জিনিস, হয় যারা দিচ্ছে তাদেরই ব্যক্তিগত কাজে লাগে, অথবা লোককল্যাণের কাজে লাগে। আমাদের জন্মজন্মান্তরের যে পাপ বা অপরাধ সঞ্চিত আছে, সেগুলি খণ্ডন করতে তাঁকে যদি ঘুষ দিতে হয়, তাহলে কতখানি দিতে হবে সে চিন্তাটা আমরা করেছি কি? আমরা বড়জোর কতটুকু দিতে পারি? পরীক্ষায় পাশ করলাম, ভোগ দিলাম— কি না গোপালের মানত শোধ করলাম, গোপাল বিগ্রহ শুধু চেয়েই দেখলেন, কিন্তু প্রসাদটা পেলাম আমরা, কোনও উচ্চপদস্থ অফিসারের মত এসে তিনি হাত পেতে কিছুই নিচ্ছেন না।

কাজেই তাঁর মত সর্বত্যাগী আর তো কাউকে দেখি না। কোথায় কোন্ স্বর্গে বসে আছেন, অথচ আমাদের জন্যে আলো, হাওয়া, ফুল, ফল প্রভৃতি নানা উপচারে এ জগতকে সাজিয়ে দিয়ে কিছুই গ্রহণ করছেন না; নিজেকে একদম আড়ালে প্রচ্ছন্ন ক'রে রেখে দিয়েছেন। তবু তাঁকে ভক্ত কিছু দিলে তিনি প্রসন্ন হন। তিনি গ্রহণ করেন সেই দানের মধ্যে ভক্তের যে ভক্তি, যে আকুতিটুকু জড়িয়ে আছে, সেইটুকুই। মা ছেলেকে সৃষ্টি করেন। তার ভালবাসাটুকু কি মায়ের চাইবার অধিকার নেই? তাও জাগতিক বাপ-মায়ের যে স্বার্থ থাকে, তাঁর সেইটুকুও নেই। তবু তিনি সৃষ্টি করেছেন

লীলা আস্বাদন করবার জন্য। তাই ভক্তের ভালবাসা, ভক্তি, তিনি পেলে খুশী হন।

আর একটু তলিয়ে দেখলেই আমরা বুঝতে পারব যে, এই ভক্তি ভালবাসার প্রকাশটা মানুষ কি উপহারের মাধ্যমেই করে না? দু'জনের ভিতরে একটা আদান প্রদানের ভাব না থাকলে ভালবাসাটা প্রকাশের কোনও পথই যেন থাকে না। ভগবানের ক্ষেত্রেও মানুষ তাই করে। আবার স্বার্থ নিয়ে তাঁর কাছে যাওয়া—সেটাকে একেবারে বাদ দেওয়া চলে না। সেটাও খুব যে খারাপ, তা নয়। আমরা অসহায়—তাঁকে ছাড়া কাকে জানাব। কষ্টটা কাউকে তো জানাতে হবে। কাজেই ভক্তেরা তাঁকেই জানায়, যেমন ছেলে দুঃখকষ্ট বাবা মাকে জানায়। চাহিদা না মিটলে অভিমানও হয়। কিন্তু কেউ কেউ সম্পর্ক চুকিয়ে দেয়—সেটা ঠিক নয়।

আর একটা কথা—ভগবানকে ঘুষ দেব কী? এতো একটা অসম্ভব ব্যাপার। ঘুষ তো দাম নয়। Excess কিছু দিয়ে কাজ বাগিয়ে নেওয়া। যেটা তার প্রাপ্য নয়। ঘুষ নিলেও অপরাধ, দিলেও অপরাধ। কিন্তু ভগবানের ক্ষেত্রে তো সবই তাঁর। তাঁর তো সব কিছুই পাবার অধিকার আছে। কাজেই তাঁকে আমরা যা দিই, সেটা তাঁর জিনিস নিয়ে তাঁকে দেওয়া, যেমন, গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর বলে যদি আমরা তাঁকে মানি, তাহলে ঘুষ দেওয়ার প্রশ্ন কি কখনও উঠতে পারে?

২৪।। প্রশ্ন ঃ "ক্ষাত্রং দ্বিজত্বং পরস্পরার্থং" এ কথাটার প্রকৃত অর্থ কি এবং বর্তমান যুগে এর রূপায়ণটা কেমন হবে?

উত্তর ঃ কথাটি আমরা বহুবারই শুনেছি ঠাকুরের মুখে। কথাটার অর্থ হচ্ছে ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণ পরস্পর পরস্পরের জন্য জীবনধারণ করবে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ তার যাগযজ্ঞের পুণ্যফল ক্ষত্রিয়কে দান করবে এবং ক্ষত্রিয় তার অর্থ সামর্থ্য সবকিছু দিয়ে তপোবন এবং তপোবনের ঋষিদের রক্ষা

করবে, প্রতিপালন করবে। এই কথার ভিতরে আমরা মানবিকতার মূলমন্ত্রটি খুঁজে পাই। অর্থাৎ প্রত্যেকটি মানুষ শুধু নিজের জন্যই বাঁচবে না, সে তার চারপাশের মানুষদের জন্যও জীবনটাকে কাজে লাগাবে।

এখন যদি ঠিক ক্ষত্রিয় এবং দ্বিজ-র অভিধানগত অর্থ দিয়ে ব্যাখ্যা করতে যাই, তাহলে এই মন্ত্রটি বর্তমান যুগে ব্যর্থ হয়ে যাবে। কারণ, এখন ক্ষত্রিয় বলতে মহাভারত, রামায়ণের যুগের ক্ষত্রিয় বোঝায় না, ব্রাহ্মণ বলতেও ঠিক তাই। কাজেই এখন এর মূল সুরটি ধরতে হবে। সে সুরটি হচ্ছে মানবিকতা। অর্থাৎ প্রত্যেকটি মানুষ, সে ব্রাহ্মণ হোক আর ক্ষত্রিয়ই হোক, বৈশ্য হোক কি শূদ্রই হোক, তার সামর্থ্য অনুযায়ী তার পাশের মানুষটিকে সাহায্য করার চেষ্টা করবে। এখন সব ব্রাহ্মণই তো তপোনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ নয়, আর সব ক্ষত্রিয়ই রাজ-ঐশ্বর্য্যের অধিকারী নয়। কাজেই এখানে সামর্থ্যের প্রশ্নটাই মূল। ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়-র প্রশ্নটা এখানে গৌণ।

আমাদের ঠাকুর সত্যানন্দদেব বলতেন—"দেখো, আমরা সবেতেই ভগবানের ওপর দোষ চাপিয়ে দিই। যা কিছু কর্তব্য সব যেন ভগবানেরই। কিন্তু তিনি যে মানুষকে তাঁর শ্রেষ্ঠ জীব বলে সৃষ্টি করেছেন এবং যে সব গুণ মানুষকে দিয়েছেন তা অন্য জীবকে দেন নি, সেই গুণগুলো মানুষ যদি কাজে লাগায় তাহলে তাঁর সৃষ্টিটা একটু সুষ্ঠুভাবে চলে। আগেকার সাধু সন্তদের জীবনীতে একটা কথা আমরা পেয়েছি, বিশেষ ক'রে up country-তে 'আধা দুধ আদা পুত'। অর্থাৎ তোমার গরু যত দুধ দেবে তার অর্ধেক সংসারের প্রয়োজনে রেখে, উদ্বৃত্ত অর্ধেক পরার্থে দান করবে। সন্তানের ক্ষেত্রেও সেই কথার প্রচলন। অন্তত একটি ছেলেকে দেশের সেবায় দান করবে। তপোবনের যজ্ঞস্থলীতে রাক্ষসরা যখন দানবীয় অত্যাচার করছিল, তখন তপোবন রক্ষার আবেদন নিয়ে বিশ্বামিত্র

গিয়েছিলেন দশরথের কাছে এবং চেয়ে নিয়েছিলেন রাম-লক্ষ্মণকে রাক্ষস-বধের জন্য। বশিষ্ঠের পরামর্শে দশরথ ছেড়ে দিয়েছিলেন তাঁর দুই পুত্রকে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে ততই যেন মানুষ অত্যধিক মাত্রায় আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছে।''

ঠাকুর এটি খুবই লক্ষ্য করেছিলেন বলেই দুঃখ ক'রে এ কথাগুলি বলেছিলেন। এখন একটা কথা উঠতে পারে—বর্তমান মানুষের ব্যক্তিগত জীবন এতই সমস্যা-সঙ্কুল হয়ে পড়েছে যে, অপরের কথা চিন্তা করার তার অবসরই নাই। এ কথাটার উত্তর দিতে গেলে একটু কঠোর ভাষায় বলতে হয় যে, এর জন্য দায়ী হচ্ছি আমরাই, অর্থাৎ এই দেশেরই মানুষ। হৃদয় বলে জিনিসটা একেবারেই বিসর্জন দিয়ে ফেলেছি আমরা। তার সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই বিসর্জিত হয়েছে নীতিবোধ এবং সমাজবোধ। এই তিনটির অভাবে পরিস্থিতি আজ সত্যই জটিল হয়ে গেছে। ফলে, যে কটি সংখ্যালঘু মানুষ চায় এর ব্যতিক্রম হতে, তারাই পড়ে যাচ্ছে বিপদে।

ঠাকুর বলতেন—''তোমরা বলছো—আপনি শুতে ঠাঁই পায় না, শঙ্করাকে ডাকে। আমাকে কে দেখে তার ঠিক নাই, আমি আবার অপরকে কী দেখবো! কিন্তু এ কথাটা একদম ভুল। সাহায্য অনেক রকমের আছে। পাশের বাড়ির লোকের বিপদের সময় এসে শুধুমাত্র দাঁড়ানোটাই একটা মস্ত বড় সাহায্য। সেইটুকুই কি আমরা করি! এমন কি মিষ্টি কথা বলতেও আমরা ভুলে গেছি।''

সত্যিই তাই। বর্তমান সমাজের মানুষ নিজের কথা ছাড়া অপরের কথা চিন্তাই করে না। বুকে হাত দিয়ে কেউ কি বলতে পারে যে, আমার কোনও সামর্থ্যই নেই কোনও ভাবে মানুষের উপকার করার? আসলে যারা একথা বলে তারা নিজের বিবেককে ফাঁকি দেয়। সাহায্য অনেক রকমে করা যায়। নিজের একমুঠি অন্ন থেকে আধমুঠি অন্ন একটি ক্ষুধিতের

মুখে তুলে দেওয়ার ইতিহাস ভারতবর্ষে বিরল নয়। বরং আমরা দেখতে পাই যাদের সত্যিকারের কোনও অভাব নাই তারাই কিন্তু বেশি অভাবী। সে অভাবটা হচ্ছে হৃদয়বত্তার। বর্তমান যুগে সমবন্টন, সাম্যবাদ এসব শব্দগুলো খুবই শোনা যায়। কিন্তু বেশ কিছু মানুষের হৃদয়হীনতা এ কথাগুলিকে অর্থহীন ক'রে দিচ্ছে। এ কথাগুলি শুধু শব্দমাত্রই থেকে যাচ্ছে। একটি দিন-আনা-দিন-খাওয়া মানুষ থেকে শুরু ক'রে কোটিপতি পর্যন্ত এই একই হৃদ্‌রোগে ভুগছে। প্রত্যেকেই সামর্থ্য অনুযায়ী অপরকে সাহায্য না ক'রে, ক্ষমতা অনুযায়ী বঞ্চিত করার দিকে ঝুঁকে পড়ছে। এর ফলে প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাছে ঠকছে এবং প্রত্যেকেই হচ্ছে বঞ্চিত।

আমার জন্য যে আমার চারপাশের একটা পরিবেশ দরকার, এ জগতে আমি একলা বাঁচতে পারব না—এ বুদ্ধিটা যেন যত দিন যাচ্ছে বিলুপ্ত হ'তে বসেছে। কাজেই পরস্পরের জন্য পরস্পরের বাঁচা আর হচ্ছে না। এখন যে লড়াইটা হচ্ছে সেটা শুধুমাত্র নিজেকে বাঁচানোর লড়াই। এই হৃদয়হীনতাকে কমিয়ে হৃদয়বত্তাকে ফিরিয়ে আনতে গেলে একটা নতুন ধরণের চেতনা জাগাতে হবে। অন্ততঃ কতকগুলি মানুষকে ত্যাগ স্বীকার ক'রে একটা দৃঢ় মতবাদ গড়ে তুলতে হবে, একটা নতুন পথ তৈরি করতে হবে। জোর ক'রে চিন্তা করতে হবে যে, আমাদের চারপাশে যারা আছে তারা আমাদেরই দেশের মানুষ। তাদের ঘরে যদি আগুন লাগে, তাহলে তার প্রতিবেশী হিসাবে আমার ঘরেও আগুন লাগতে পারে। তার দুঃখে যদি আমি দাঁড়াই, তার হৃদয়কে যদি আমি ভালবাসা দিয়ে জাগাতে পারি, তাহলে সেও আমার দুঃখে পাশে না দাঁড়িয়ে পারবে না।

এভাবে নিঃস্বার্থ ইচ্ছার কম্পনটিকে সংক্রামিত করতে হবে আমার চারপাশের মানুষের মধ্যে। একদিনে হবে না, দু'দিনে হবে না। কারণ, virus infection-এর মতই যে সামাজিক অপরাধ, স্বার্থপরতা,

দুর্নীতিপরায়ণতা ছড়িয়ে পড়েছে, তাকে নির্মূল করতে হলে কতকগুলি বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব প্রয়োজন। তার জন্য একটা অদম্য চেষ্টা চাই। প্রত্যেককেই চিন্তা করতে হবে—আমার সামর্থ্য অনুযায়ী আমি অপরের ভাল করার, উপকার করার চেষ্টা করব। জীবনের কিছুটা সময়, সঞ্চয়ের কিছুটা অংশ, হৃদয়ের খানিকটা জায়গা অপরের জন্য রাখব। সত্যি যদি এটা sincerely প্রত্যেকে চেষ্টা করে, তাহলে দেখা যাবে তারা নিজেরাও বঞ্চিত হবে না বা ঠকবে না। কারণ, এ জগতের ঊর্ধ্বে যিনি আছেন, তিনি হচ্ছেন ভূমার স্বরূপ। কাজেই যেখানে উদারতা, সেখানে তাঁর করুণা ঠিকই সাহায্য করবে। তার ফলে দেখা যাবে একটা মানসিক শান্তির প্রতিষ্ঠা হচ্ছে।

এছাড়াও আরও একটা দিক বলার আছে, যেটি রাজশক্তির প্রতি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। রাজশক্তি চিরকালই ছিল, এখনও আছে এবং পরেও থাকবে। সেটা গণতন্ত্রের মাধ্যমেই আসুক বা রাজতন্ত্রের মাধ্যমেই আসুক। নেতা বা Leader ছাড়া কখনও দেশ পরিচালনা সম্ভব হয় না। কাজেই এ যুগে নেতৃবৃন্দ বলতে আমরা ক্ষাত্রশক্তি বা রাজশক্তিকেই ধরে নেব। কিন্তু বর্তমান যুগে আমাদের দেশে বিশেষ ক'রে যেটা লক্ষ্য করছি—পুরো দায়িত্ব পালনে এ শক্তি সম্পূর্ণ অক্ষম প্রমাণিত হয়েছে। যা'র ফলে প্রত্যেকটি মানুষ ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে স্বার্থপর হয়ে উঠেছে। তারা রাজশক্তির ওপর ভরসা রাখতে পারছে না। পবিত্র প্রতিষ্ঠান, দেবস্থান, লোককল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি তো বিপন্ন বোধ করছেই, এমন কি সাধারণ মানুষও দিন দিন চরম অসহায় বোধ করছে।

এরজন্য রাজনৈতিক দলগুলি নিশ্চয়ই দায়ী, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। তারাও নিজের নিজের অস্তিত্বকে বজায় রাখার লড়াই ক'রে চলেছে। ফলে সাধারণ মানুষের বা সকলের পক্ষে কোনটা যে ভাল হবে,

সেটা হয় বুঝতে পারছে না অথবা বুঝেও সেটাকে উপেক্ষা করছে ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির খাতিরে। কাজেই দেশের মানুষকে সমাজবোধের শিক্ষা, নীতিবোধের শিক্ষা কে দেবে? রাজাই নীতি রক্ষার জন্য সর্ব যুগে দায়ী হন। সেই রাজাই যদি এ ব্যাপারে অক্ষম হন তাহলে সাধারণ মানুষের কাছে সুনীতির আশা কি করা যায়?

তবু সাধারণ মানুষের কাছে আমাদের বক্তব্য এই যে, স্বার্থসর্বস্ব শাসকগোষ্ঠীর প্রতি যখন আস্থা রাখা যাচ্ছে না, তখন পরম শাস্তা, পরম নিয়ন্তা শ্রীভগবানের ওপর নির্ভরতা রেখে, ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক মানুষকেই মানবিকতার মূল সুরটিকে ধরে নিতে হবে। যুগ যখন গণতন্ত্রের যুগ, তখন গণদেবতাকেই জাগতে হবে, সমাজবোধ নিয়ে, নীতিবোধ নিয়ে, দেশাত্মবোধ নিয়ে এবং সর্বোপরি ধর্মবোধ নিয়ে। এছাড়া দেশকে বাঁচাবার কোনও উপায় নেই।

ছড়ানো মুক্তো : পঞ্চম খণ্ড

প্রকাশকের নিবেদন

(প্রথম প্রকাশ)

পরমপূজনীয়া শ্রীঅর্চনাপুরী মায়ের সাতান্নতম জন্মতিথি উপলক্ষে 'ছড়ানো মুক্তো'র এই পঞ্চম খণ্ডটি প্রকাশিত হ'ল। সম্যক্ প্রজ্ঞাপ্রসূত এই বেদোজ্জ্বল-বাণী মানুষের অন্তরে অন্তরে মন্ত্রবৎ গেঁথে গিয়ে তাকে শক্তি দেবে দিব্যপথে চলার, তাকে নিয়ে যাবে সত্য-শিব-সুন্দরের দিকে—এই আমাদের বিশ্বাস, এই আমাদের অন্তরের প্রার্থনা।

এই পুস্তক প্রকাশে সহযোগী মহাপ্রাণদের ঋণ আমাদের চিরদিনের।

শ্রীসত্যানন্দার্পণমস্তু।

৭ শ্রাবণ, ১৩৯১
27th July, 1984

ছড়ানো মুক্তো

(৫ম খণ্ড)

১।। ভগবানই হচ্ছেন সবচেয়ে আপনজন। তাঁরচেয়ে আপন আর কেউ নেই।

২।। যারা ভগবানকে ভালবাসে, তারাই ঠিক ঠিক মানুষকে ভালবাসে। যারা ভগবানকে ভালবাসে না, তারা মানুষকেও ঠিক ঠিক ভালবাসতে পারে না।

৩।। কৃপা করা না করা তাঁর ইচ্ছা। সেক্ষেত্রে ঠাকুরের কাছে এই বলে order বা হুকুম করা চলবে না—আমি এত করেছি তাই এত দিতে হবে। প্রার্থনা আর order এক নয়।

৪।। কৃপার রাজ্যের কথা আলাদা। ঠাকুর যে কখন কাকে কী ভাবে কৃপা করবেন, তা কেউ বলতে পারে না।

৫।। ভালবাসতে গেলে আঘাত পেতেই হবে। ভগবানের ভালবাসা নিঃস্বার্থ ভালবাসা। ভগবান যখন মানুষরূপে আসেন, তাঁকে আঘাত পেতে হয়। অবতার আসেন ভালবাসার চরম আদর্শ দেখাতে।

৬।। অন্তরে ক্ষোভ বা বাসনা পুষে রাখলে কখনও সার্থক মানুষ হওয়া যায় না। মনকে সব সময় শান্ত রাখতে হবে। লক্ষ্য রাখবে যাতে কোনও বাসনা ঢুকে মনকে অশান্ত করতে না পারে।

৭।। সন্ন্যাসী যে হবে তাকে করতে হবে সব কিছুর সম্যক্ ন্যাস। যার অন্তরের বাসনার সম্যক্ ন্যাস হয়েছে সে-ই সার্থক সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর কোনও ক্ষোভ থাকবে না।

৮।। তীব্র বৈরাগ্য না নিয়ে এলে আশ্রমে কেউ ঠিক ঠিক ভাবে থাকতে

পারে না। আশ্রমে থাকতে গেলে চাই তীব্র বৈরাগ্য।

৯।। একমাত্র আধ্যাত্মিক পথই মানুষকে শান্তি দিতে পারে।

১০।। যার যেমন সামর্থ্য তার তেমনই চলা উচিত। অন্যের অনুকরণ ক'রে নিজের সামর্থ্যের বাইরে কখনোই চলা উচিত নয়। এতে গৃহে অশান্তির সৃষ্টি হয়, মনে বাসনা জেগে ওঠে, তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। যে যার নিজের পথে ঠিকমত চললেই সংসারে শান্তি আসবে। মনে কোনও বাসনার সৃষ্টি হলেই তাকে দূর করার চেষ্টা করতে হবে। এজন্য তীব্র প্রার্থনা করতে হয়।

১১।। সত্যপথে চলাটা জীবনের উদ্দেশ্যে ঠিকই। সত্যপথকে ভিত্তি করেই জীবনে চলতে হবে। কিন্তু শুধু সেটাই সব নয়। এর সাথে ভগবৎ-বিশ্বাস, ভক্তি, ভগবৎ-শরণ, ঠাকুরের প্রতি ভালবাসা এবং নিষ্ঠাকেও যুক্ত করতে হবে। এইভাবেই জীবনের চলা সহজ হয়ে যাবে। সব সময় প্রধান উদ্দেশ্যকেই মনে রাখা উচিত। আমার জীবনের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হবে ঈশ্বরকে লাভ করা। ঈশ্বরকে লাভ করলেই জীবনের সব চলা সার্থক হবে।

১২।। মনের দুটি ভাগ আছে। একটি চোর মন অর্থাৎ যে মন নিম্নগামী। অপরটি পুলিশ মন, যে চোর-মনকে সব সময় সতর্ক ক'রে দিচ্ছে। এরই নাম বিবেক। মনকে একাগ্র করতে গেলে এই বিবেককে সর্বদা কাজে লাগাতে হবে।

১৩।। ঠাকুরের পথে আসতে গেলে নানারকম বাধা আসবে। শরীর যাবে, মন যাবে, নানাভাবে মারের আক্রমণ হবে। যে এইসব বাধা অতিক্রম ক'রে ঠাকুরকে ভালবাসতে পারবে ও ঠাকুরের দেওয়া পথকে গ্রহণ করতে পারবে, সে-ই সার্থক জীবন লাভ করবে।

১৪।। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'ঈশ্বর আছেন, তাঁর জগৎ দেখলে বোঝা

যায়।' এ কথাটা যে কত গভীর এবং এর ভেতর যে কত দ্যোতনা রয়েছে সেটা একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায়। মানুষের ক্ষেত্রেও দেখা যায় ইতিহাসের পাতায় সে বিশেষভাবে চিহ্নিত হয় তার activities-এর মাধ্যমে। সাধারণ একটি লোক গতানুগতিক জীবনযাপন করছে, তার অস্তিত্ব তার মৃত্যুর সঙ্গেই মুছে যাবে। শত বৎসর বাঁচলেও ইতিহাস তাকে চিহ্নিত করবে না। বাল্মীকি, কালিদাস তাঁদের প্রতিভার মাধ্যমেই ঐতিহাসিক পুরুষ হলেন। তাঁদের প্রতিভা না থাকলে কেউ কি চিনতো!

অবতারপুরুষও তাঁর জীবনকে কোন সীমিত গণ্ডীর ভেতর বন্দী ক'রে রাখেন না। তিনি সৃষ্টি ক'রে নেন একটি বিরাট গোষ্ঠীর, এবং যুগ অনুযায়ী তাঁকে নানা ধরণের প্রকাশের মাধ্যম খুঁজে নিতে হয়। তাঁর সেই বিচিত্র activities-ই তাঁকে সর্বজনীন বলে প্রকাশ করে।

এর মধ্যে আর একটা কথা আসে—ঠাকুর তো আসেন তাঁর লীলার রাজ্যে, কিন্তু সেখানেও তো অনেক গোলমাল। সেখানে ভালই তো সব থাকে না, অনেক মন্দও জুটে যায়, যা সাধারণের কাছে বিশেষ প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়। এই গোলমালও কি তাঁর activities-এর মধ্যে পড়ে? আমরা বলব—হ্যাঁ, কারণ, সেগুলিও তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ দিচ্ছে। জগতের ভালমন্দ সবকিছু ঈশ্বরের প্রমাণ দিয়ে থাকে।

একটানা ভাল থাকলে হয়তো মনে হ'ত প্রাকৃতিক একটা নিয়মে জগৎ চলছে। কিন্তু বিপরীত ভাবের বৈচিত্র্য আছে বলে মানুষের মনে দ্বন্দ্ব আসছে, যার থেকে সৃষ্টি হচ্ছে প্রশ্নের । আর সে প্রশ্নের উত্তর আসছে তার নিজের ভেতর থেকেই। সেটি হচ্ছে তাঁর অস্তিত্বে বিশ্বাস। অবতারের ক্ষেত্রেও মন্দের অবস্থিতিটি লীলাপোষ্টাই-এর কাজ করে এবং তাঁর মহৎ সৃষ্টি গুলিকে আরো প্রকট করে তোলে। কথামৃতে ঠাকুর তো বলেছেন, জটিলা কুটিলার প্রয়োজনীয়তার কথা। তাই ঈশ্বর অবতাররূপেও যখন

নেমে আসেন তখন তাঁকেও নানা বিচিত্র লীলার সৃষ্টি করতে হয়। তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে সাধারণ মানুষের মতই তিনি আসেন। আসেন একটি গৃহে, একটি পরিবারের মধ্যে।

১৫।। Situation বা পরিস্থিতিই নিয়ম তৈরী করে। কারণ, জীবনের অর্থই হ'ল নানা বিচিত্র পথ ধরে চলা। কাজেই আবহমানকাল ধরে একই নিয়মে একটানা চলা কোনও মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। সাধারণভাবে একটি মানুষকে দিয়েও যদি আমরা বিচার করি, দেখতে পাব—শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত তার দ্রুত দৈহিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। তার সঙ্গে সঙ্গে তার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অদ্ভুতভাবে বদলে যাচ্ছে। খাওয়া-পরা, আচার-ব্যবহার, সবকিছুই। তেমনি সমাজজীবনে এবং সংঘজীবনেও নানান ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে চলতে গিয়ে বিচিত্র অবস্থার সৃষ্টি হয়। তখন কোনও মতেই সম্ভব নয় একই নিয়মে জীবনটাকে চালানো। সেক্ষেত্রে situation বা পরিস্থিতি অনুযায়ী নতুন নিয়ম আপনিই সৃষ্টি হয়ে যায় বা করে নিতে হয়।

১৬।। তাঁকে এমন একটি সমরস অবস্থায় থাকতে হয়, যাতে মানুষ নিজের নিজের ভাব অনুসারে যে কোনও রস তাঁর ভেতর থেকে আস্বাদন করতে পারে। তাই তিনি অরূপ-সত্তায় থাকেন। সেই অরূপ থেকেই যে কোনও রূপ সম্ভব।

১৭।। যারা সত্যিকার দেশমাতৃকার সেবা করতে শিখেছে, তারা জগন্মাতার সেবাও করতে পারবে। দুটি মা এক হ'লে তবে তো সেবা সার্থক হবে।

১৮।। দেশের বর্তমান অবস্থায় আমরাও বড় বিব্রত। কিন্তু কার কাছে স্মারকলিপি পেশ করব? তাই আমাদের অভিযোগ অভিমান একজনের চরণেই নিবেদন করছি। কারণ, এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে একমাত্র তিনিই পারেন। আর আমরা সাধুরা তো সংখ্যালঘুর দলে গেছি। আমাদের

বক্তব্য এত কোলাহলের মধ্যে শোনাও যাবে না। তাই পিঁপড়ের পায়ের শব্দটিও যাঁর কান এড়ায় না, তাঁকেই জানাচ্ছি, আর অপেক্ষা করছি কবে তিনি নিজে এসে হাল ধরবেন।

১৯।। অভদ্রতা ও অবাধ্যতা বর্তমানে জাতিগত সংস্কার হয়ে দাঁড়িয়েছে। যারা সাধু হতে চায়, যারা সৎ হতে চায়, তাদের by force এটাকে অতিক্রম করতে হবে। নিজের পরিবেশ নিজেকেই সৃষ্টি করতে হবে। ভদ্র পরিবেশ, বাধ্যতার পরিবেশ নিজেদেরই সৃষ্টি করতে হবে।

২০।। আদর্শ স্কুল তৈরি করতে গেলে প্রথমে দরকার ভাল শিক্ষক। দ্বিতীয় দরকার ভাল পরিবেশ যেখানে সততা, নীতিবোধ এবং শান্তি অক্ষুণ্ণ থাকে। এছাড়া প্রয়োজন শিক্ষা ব্যবস্থার ভেতর আধ্যাত্মিকতাভিত্তিক নীতিশিক্ষার প্রাধান্য এবং সেই ধরণের শিক্ষা যাতে সম্ভব, সেরকম বই পাঠ্য হিসাবে রাখা।

২১।। ঈশ্বরে পূর্ণ বিশ্বাসও যেমন কঠিন, তেমনি ঈশ্বরে পূর্ণ অবিশ্বাসও কঠিন। এমন কি পূর্ণ অবিশ্বাসটা আরও বেশি কঠিন।

২২।। ভাগবত, মহাভারত পড়তে গেলে প্রথমেই তোমাদের একটা কথা ধরে নিতে হবে যে, "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"। তা না হ'লে গোলমালে পড়তে হবে। যার জন্য স্বামীজী বলেছেন, ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত না হলে ভাগবত পড়ার অধিকার হয় না। যাঁরাই "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" এই শাস্ত্রবাক্যটি মনে না রেখে ভাগবত এবং মহাভারত নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করতে বসেন, তাঁরা ভাগবতের ও মহাভারতের একটি বিকৃত রূপই সৃষ্টি করেন। কারও চোখে এটি হয়ে ওঠে জৈব ভাবাশ্রিত একটি উপন্যাস, কারও চোখে ফুটে ওঠে সমালোচনার বিদ্রূপ। তাঁদের কথায় কৃষ্ণ একটি সাধারণ মানুষের রূপ ধরেন, যে মানুষ প্রতিপদে ভুলের পর ভুলই ক'রে বসছেন।

কিন্তু "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" এই বদ্ধমূল ধারণাটি নিয়ে যদি কেউ ভাগবত, মহাভারত পড়ে তাহ'লে কৃষ্ণের প্রতিটি কাজই তাদের চোখে অপার্থিব হয়ে ওঠে এবং তারা কৃষ্ণলীলায় তন্ময় হয়ে বলতে পারে—কৃষ্ণলীলা শুধু কৃষ্ণই করতে পারেন, আর কেউ তা নকল করতে পারে না। তখন ভাগবত, মহাভারতের রূপই যায় বদলে, তার সত্য রূপটিই ভক্তের চোখে ফুটে ওঠে, আর ভাগবতলীলার রসাস্বাদনে সে মুহুর্মুহুঃ হর্ষিত হয়।

২৩।। দিব্য ভালবাসা অন্তঃসলিলা। এর বহিঃপ্রকাশ ঠিক সাধারণ মানুষের ভালবাসার মত নয়। দিব্য ভালবাসার মর্যাদা ঠিক সমস্তরের দিব্যভাবাপন্ন না হ'লে দিতে পারবে না।

২৪।। গুরুকরণ এমনি একটি জিনিস যে, সেটা ঠিক জোর ক'রে হয় না। বিশেষ ক'রে তাদের, যারা গুরুকরণকে ধর্মজগতের একটা অঙ্গ বলে মনে করবে। আর যাঁরা সদ্‌গুরু, তাঁরা জোর ক'রে ডেকে কাউকে দীক্ষা দেনও না। দীক্ষা নিতে হয় তখনই যখন অন্তর থেকে দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এমন কাউকে যখন দেখব যাঁর কাছে আমি পরিপূর্ণরূপে surrender করতে পারি বা শরণাগত হতে পারি—তখনই দীক্ষা নেওয়া চলে, তার আগে নয়।

আমাদের জীবনে এর একটা মস্ত বড় প্রমাণ আছে। আমি বা আমার মত বয়সে যারাই সে সময় আমাদের ঠাকুরের কাছে এসেছে তাদের মধ্যে অনেকেরই বয়স তখন এত কম যে, সংসার অসার অনিত্য এ বোধ জাগার কথা নয়। ঝড় ঝাপটা দুঃখ সয়ে সংসারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে চলে আসার মত অবস্থাও তাদের ছিল না। আমরা তো প্রাচুর্যের মধ্যেই মানুষ হয়েছি। অথচ তখনকার সিউড়ির আশ্রম একটি ছোট্ট বাড়ি, যেখানে ঐশ্বর্যের নামগন্ধও ছিল না। ঠাকুর দিনেরাত্রে বেশিরভাগ সময় থাকতেন দোতলার

ঘরে ধ্যানমগ্ন। আমরা গিয়েছি খেলা করতে, বা পরে যখন ছোট্ট স্কুলটি হ'ল, সেখানে পড়তে। সেখানে রিক্ত সন্ন্যাসীর বেশে ঠাকুরকে দেখে এমনই আকর্ষণ অনুভব করেছিলাম যে, তাঁর জন্য সমস্ত ঐশ্বর্য পরিত্যাগ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ হয় নি। যদিও ধর্মপথ, দীক্ষা বা গুরুকরণ এসবের বোধও তখন ছিল না। শুধু একটি গভীর ভালবাসা ঠাকুরের প্রতি এবং তাঁর প্রতি প্রবল আকর্ষণ এপথে টেনে এনেছে। আর এখনও পর্যন্ত তো পড়ে আছি।

কাজেই গুরুকরণ জিনিসটা যেমন সহজ তেমনি কঠিন। সারাজীবন খুঁজেও হয়তো গুরু পাওয়া যায় না। আবার এক মুহূর্তের দর্শনেও গুরুকরণের স্থির সিদ্ধান্ত হয়ে যায়। বিশ্বাস এবং শরণাগতিই সেই সিদ্ধান্তটি এনে দেয়। তবে গুরুকে বাজিয়ে দেখার কথাও আছে। কিন্তু সেটাও একটা বিশেষ সময় পর্যন্ত। শাস্ত্রেও বিধি আছে—গুরুকরণের আগে পর্যন্ত যতখুশি বিচার ক'রে নিতে পারো কিন্তু গুরুকরণের পর আর কোনও বিচার চলবে না। মানুষের বিচার বুদ্ধির সীমা অত্যন্ত গণ্ডীবদ্ধ। কাজেই বাজিয়ে দেখাটাও তার ক্ষমতাতে কুলোনো চাই।

বিবেকানন্দ বাজিয়ে দেখেছিলেন ঠিকই। কিন্তু সে কতক্ষণ। একসময় তাঁকেও এসে একটা সীমাতে থামতে হয়েছিল এবং surrender করতে হয়েছিল। যদিও তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে সুদীর্ঘ বৎসর ধরে পাননি, কিন্তু তাঁর মত বিরাট পুরুষকেও সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল মানবদেহধারী একজন গুরুর কাছেই। মানুষ সরাসরি ভগবানকে দেখতে পায় না। তাই একটি আধারের মাধ্যমেই ভগবানকে পেতে হবে। সদ্‌গুরুই সেই মাধ্যম।

২৫।। পুরোনো বছরের শেষে জীবনের একটা অধ্যায় শেষ হয়। নতুন বছরের শুরুতে নতুন খাতার প্রয়োজন হয়। ঠাকুর এই দিনে দেখতেন

কার কতটা progress হল, বিশেষতঃ সাধুদের জন্যে তো দেখতেনই। ঠাকুরের বাণী ছিল যে, "আমাদের জীবনের খাতার প্রতিটি অক্ষর যেন স্বর্ণময় হয়ে থাকে।"

আমাদের ভাগ্যের খাতা আমরাই লিখি, চিত্রগুপ্ত তো লেখেন না। তিনি সাক্ষীস্বরূপ হয়ে থাকেন। যতগুলি অক্ষর তোমরা লিখছ তোমাদের খাতায়, সেই প্রতিটি অক্ষর যেন সোনার কালিতে স্বর্ণময় থাকে, উজ্জ্বল থাকে; কালো কালি যেন না পড়ে তাতে। প্রতিটি মুহূর্ত যেন হয় আলোর দিকে পদক্ষেপ।

জগতে কতরকম পরিস্থিতি আসবে। পরিস্থিতি অনুযায়ী চলতে হবে। ঠাকুরকে ধরে থেকে পবিত্রতা ও ভাবশুদ্ধি বজায় রেখে তাঁর শরণাগত হয়ে থাকলে ধূলি-মুঠি সোনামুঠি হয়ে যাবে। পুরীর মন্দিরে দেখেছিলাম 'এ ভগবান দর্শন দিজিয়ে' বলে একজন অন্ধ আকুল হয়ে ছুটে আসছে জগন্নাথের দিকে। তার সেই আকুল প্রার্থনাতে সবাই তাকে পথ ক'রে দিল। একজন প্রশ্ন করল—তুমি কী ক'রে দর্শন করবে? সে বলে উঠল—আমি নাই বা দেখতে পেলাম, জগন্নাথ তো আমাকে দেখবেন! এই তত্ত্বটি আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমি নাই বা দেখলাম তাঁকে, তিনি তো দেখছেন আমাকে।

তাঁকেই বলা দরকার যে, তুমিই আমার হাত ধরে থাকো প্রভু। আমরা যদি আমাদের দিক থেকে শিশুর মত পবিত্র থাকতে পারি তাহলেই তাঁর দিকে এগিয়ে যাব। আমরা সব ছেড়ে তোমার শরণাগত হয়ে আছি, এই জোর রাখতে হবে তাঁর উপর। জীবনের খাতার প্রতিটি পাতা থাকবে স্বর্ণময়, উজ্জ্বল। "তুমি আমাদের ধরে থেকো, তুমি যা করাবে তাই করব"—এটা ছাড়া আমাদের কোন প্রার্থনা নেই। (নববর্ষের দিন, ১৩৯১)

২৬।। নৃত্য, গীত ও অভিনয়ের মাধ্যমে মানুষের মন নিম্নমুখী হয়ে যায়—

এরকম একটা ধারণা আছে অনেকেরই মনে। ঠাকুর সত্যানন্দ সেটা ভেঙে দিলেন। ঠাকুর বললেন—"যে সুর এসেছে শিবের কাছ থেকে সে সুর ও সে নৃত্য কখনও মানুষকে নিম্নমুখী করতে পারে না, সে সুর তাকে ঊর্ধ্বমুখী করতেই সাহায্য করে।"

যে নৃত্যগীতের মধ্য দিয়ে সত্য-শিব-সুন্দরের প্রকাশ ঘটে তার দ্বারা পরমার্থ লাভ সম্ভব। সে আদর্শ আমরা দেখতে পাই জয়দেব, পদ্মাবতী, তুলসীদাস, মীরাবাঈ প্রভৃতি সাধক-সাধিকাদের জীবনে। ঠাকুরের কথাই ছিল যে, ছন্দের মাধ্যমে, সুরের মাধ্যমে নিজেকে ভগবানের চরণে নিবেদন করতে হবে, তাহলেই সে সুর, সে ছন্দ হয়ে উঠবে সার্থক।

২৭।। ভালবাসাটা হচ্ছে জীবনের বাদী সুর। দেবস্থানে থাকতে গেলে ভালবাসার প্রয়োজন আরও বেশি। অন্তর থেকে অহঙ্কার বিদ্বেষকে সম্পূর্ণ দূর করলে তবেই ভালবাসা সম্ভব। ধর্মজীবনে, ভগবৎ লাভের পথে, কোনও রকম ক্ষোভ বা কারও প্রতি বিদ্বেষ থাকলে সে পথে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না।

ভালবাসার মূল সুরটা যদি ঠিক থাকে তাহলে মাঝে মাঝে বিচ্যুতি আসলেও পরক্ষণেই আমরা সেই বাদীসুরে ফিরে যাব। সাময়িক গোলমাল হ'লেও সেটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হতে পারে না। সাধু জীবনের শেষ অন্তরায় হচ্ছে মাৎসর্য, ওটাতেই সকলে আটকে যায়। এই ঈর্ষাপ্রসূত অশান্ত মন ভগবানের সঙ্গে বিচ্ছেদেরই সৃষ্টি করে। আর ঠিক ঠিক ভালবাসা উদারতা আনে, যা ভগবৎ পথে অগ্রগতির নিরিখ।

২৮।। ঠাকুর বলতেন—'মানুষ গড়ার কারখানা কর'। ঠাকুর আশ্রমকে বলতেন মানুষ গড়ার কারখানা। অর্থাৎ সত্যিকারের মানুষ একমাত্র আশ্রমে এসেই তৈরি হতে পারে। তার চরিত্রের সমস্ত বিশেষত্বগুলি, শুভ দিকগুলি, ফুটে ওঠে এই আশ্রমের পরিবেশের মধ্যে এসে।

২৯।। সূক্ষ্মত্ব অর্জন করতে গেলে ভেতরের স্থূলত্বকে বর্জন করতে হবে। বাসনা কামনাই স্থূলত্ব। ভেতরের কামনাবাসনার যে স্থূল প্রকাশ হয়, সেইগুলিকে কমিয়ে এনে আস্তে আস্তে সম্পূর্ণ দূর করতে হবে। বীজাকারে কিছু কামনা বাসনা থাকতেও পারে। সেগুলি লীলাপোষ্টাই-এর জন্য। যা কিছু স্থূল, তা থেকে নিজেকে সরিয়ে আনলেই সূক্ষ্মত্ব অর্জন করা সহজ হয়।

স্থূলত্ব নিয়ে ভগবান লাভ সম্ভব নয়। স্থূল প্রবৃত্তিগুলির মোড় ঘুরিয়ে দিতে হবে ভগবানের দিকে। ভালবাসায় প্রতিষ্ঠিত হলে সূক্ষ্মত্ব অর্জন আপনিই হবে।

৩০।। সংসার তো করতে হবেই সকলকে, তবে সেটাকে ঠাকুরের সংসার ক'রে নিতে হবে। রোজ সকালে উঠে বলতে হবে—ভগবান, সংসারের প্রতিটি কাজে তুমি আমার সাথে সাথে থেকো, আমার হাত ধরে থেকো। সারাদিন কাজের মাঝে মাঝে দেখতে হবে ঠাকুরের স্মরণ মনন হচ্ছে কিনা।

শিশু যেমন খেলার ফাঁকে এসে মাকে দেখে যায় যে, মা ঠিক আছে কি না, তেমনি সারাদিনে অন্তত একবারও মনকে সমস্ত কাজের থেকে সুইচ্ অফ্ ক'রে দেখতে হবে—"আছো তো মা তুমি?" রাত্রে শোবার সময় প্রার্থনা করতে হবে—'সারাদিন কাজের মধ্য দিয়ে কেটেছে, এখন আমি তোমার চরণে মাথা রেখে শুতে যাচ্ছি; তুমি আমাকে দেখো।'

৩১।। আজকাল মানুষ অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক এবং স্বার্থকেন্দ্রিক হয়ে উঠছে। নিজেরটুকু ছাড়া সে আর অন্য কিছুর দিকে তাকাবার অবসরই পাচ্ছে না। ব্যক্তিগত সুখের জন্য সবাই প্রাণপণ ছুটছে। আর একজনের সুবিধা অসুবিধার কথা ভাববার কোনও প্রয়োজনীয়তাই বোধ করছে না। রাস্তা দিয়ে মানুষ চলছে। অপর একজন মানুষকে পথ ছেড়ে দিয়ে হাঁটা বা পাশ

কাটিয়ে হাঁটার চেয়ে, তাকে কনুই দিয়ে গুঁতিয়ে ঠেলে ফেলে দিয়ে হাঁটাকেই নীতি ক'রে নিয়েছে। তুমিও বাঁচ, আমিও বাঁচি—এই ভাবটাই যেন চলে যেতে বসেছে। এর ফলে সাধারণ জীবনটাই দুর্বিষহ হয়ে উঠছে দিন দিন। একজন মানুষের প্রতি আর একজন মানুষের মর্যাদাবোধ হারিয়ে যাচ্ছে। এর চেয়ে দুর্দিন আর কী হতে পারে?

৩২।। ডায়েরী যখন লিখবে মনে রাখবে—তাতে যেন কোনও ব্যক্তি-বিশেষের নাম দিয়ে এমন কোনও কথা না লেখা হয়, যাতে ভবিষ্যতে কেউ পড়লে আঘাত পায় বা ক্ষুণ্ণ হয়। সে রকম কোনও ঘটনার কথা লিখলে কখনও কারও নাম দেবে না। সে রকম কিছু লিখতে গেলে লিখবে 'পারিপার্শ্বিক বা পরিবেশ' এই ধরণের কিছু, যাতে পড়ে কেউ বুঝতে না পারে। ডায়েরী একটা বড় সাহিত্য—আর সাহিত্য মানেই হচ্ছে সহিতত্ব। সহিত কথাটা থেকেই সাহিত্য। এক এক যুগের সাহিত্য সেই যুগের সব কিছুকে নিয়ে সেই যুগের একটা প্রতিচ্ছবি। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে তার একটা যোগসূত্র আছে। তাই সাহিত্য এমন হবে যা লোককে দেবে একটা দিব্য আনন্দ, দিব্য প্রেরণা। আমাদের ঠাকুর বলতেন, ঠিক সাহিত্য সেইটেই, যেটার সত্য-শিব-সুন্দরের সঙ্গে যোগসূত্র আছে। প্রত্যেকটি শিল্প তখনই হবে কালজয়ী যখন সেটিতে সত্য-শিব-সুন্দরের ছাপ থাকবে। শুধু বাস্তববাদী হলে হবে না, সেটি হৃদয়গ্রাহী হবে এবং হৃদয়স্পর্শী হবে, তবেই হবে ঠিক শিল্প। ঠাকুর সত্যানন্দ বলতেন—Art for heart's sake. চলতি কথাটা আছে Art for art's sake. কিন্তু আমাদের ঠাকুর বলতেন— Art for heart's sake.

তাই ডায়েরী লেখার বিষয়েও সাবধান থাকবে, যাতে কারও প্রতি কোনও শ্লেষ না এসে যায়। বিশেষ ক'রে কারও নামে কোনও বিরুদ্ধ কথা কখনও লিখবে না।

৩৩।। নিষ্ঠা একটিতেই সম্ভব। 'আমি তোমার, তুমি আমার'—একথা

একজনকেই বলা যায়, দশজনকে নয়। যাঁকে ভালবেসেছি তাঁকে সম্পূর্ণটা দিয়ে দেব, আর কোনও দিকে ফিরেও তাকাব না। তাই বলে কি জগতের কল্যাণ প্রার্থনা করব না, সেটাও করতে হবে। কিন্তু নিষ্ঠাটি একজনের প্রতি স্থির থাকবে। বিশ্বপ্রেম ছড়িয়ে দেবে, সবাইকে আপন ক'রে আঁকড়ে ধরবে, সবাইকে ভালবাসবে—সে কখন, না যখন সর্বভূতে ঠাকুরকে দেখতে পাবে। যেমন, চৈতন্যমহাপ্রভু সবাইকে সমানভাবে ভালবেসে জড়িয়ে জড়িয়ে ধরতেন। তিনি সবকিছুতেই তাঁর ইষ্ট শ্রীকৃষ্ণকেই দেখতেন, তখন আর নিষ্ঠার হানি হল না। কারণ, যাঁকেই ভালবাসছি, শ্রীকৃষ্ণ জেনে ভালবাসছি। যা কিছুকে আঁকড়ে ধরছি, সেই তো শ্রীকৃষ্ণ, তাই নিষ্ঠাটি ঠিক রইল। এটা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল বলেই তিনি হলেন মহাপ্রভু। কিন্তু সে অবস্থা না হওয়া পর্যন্ত খুব সাবধান হতে হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত প্রেম-ভালবাসা একজনের প্রতি দিতে হবে। তা না হলে সেটা ঠিক ভালবাসা হবে না, নিষ্ঠাও হবে না।

৩৪।। আমার মনে হয় বিশ্বপ্রেম যেখানে, সেখানে ঔদাসীন্য থাকবেই। উদাসীনতা না থাকলে বিশ্বপ্রেম হয় না । সবাইকে ভালবাসতে গেলেই অনাসক্তির প্রয়োজন। আসক্তি থাকলে সবাইকে ভালবাসা যায় না।

৩৫।। মাতৃভাবটা এদেশের, বিশেষ ক'রে বাংলাদেশের নিজস্ব জিনিস। মেয়ে ছোট থেকেই নিজেকে মা বলে ভাবতে শুরু করে। নিজের বাবাকে ভাবে তার ছেলে। বাবাও মেয়েকে মা বলেই সম্বোধন করে। বাবা কাকা সবাইকে বসিয়ে বেড়ে খাওয়ানো, পাখা করা, আদর করা এসব বাঙালী মেয়েদের মধ্যে ছোট্ট বয়স থেকেই এসে যায়।

৩৬।। মায়েদের মধ্যে মাতৃত্ব স্বভাবগত। কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, স্বভাবগত মাতৃত্বে যেন একটু ভাটা পড়েছে। কেন মায়েদের ভেতর থেকে এই মাতৃত্বটি চলে যাচ্ছে! আমাদের দেশে সতীলক্ষ্মী মায়েদের ওপরে বহু

অবিচার হয়েছে। সেই সীতা দ্রৌপদী থেকে আরম্ভ ক'রে পরবর্তীকালে সাধারণ গৃহস্থবাড়িতে পতিভক্তিপরায়ণা সতীলক্ষ্মী মায়েদের ওপরে বহুক্ষেত্রে ঠিক মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার করা হয় নি। অনেক চোখের জল পড়েছে। মনে হয়, তারই ফলে মহামায়ার ইচ্ছায় তাঁর বিদ্যাশক্তির প্রকাশ কমে গিয়ে অবিদ্যাশক্তির প্রকাশ বেশি হয়েছে। ফলে মায়েদের বিদ্যাশক্তিরূপ মাতৃত্বটি ঠিকমত জেগে উঠছে না।

তাছাড়া বিদেশী সংস্কৃতি হিন্দু নারীর মূল ঐতিহ্যকে গ্রাস ক'রে ফেলেছে। মেয়েদের ভেতরে এখন বিদেশী culture-এর ঢেউ এসে গেছে। ফলে স্বধর্ম থেকে সরে যাওয়া মায়েদের গর্ভে যে সন্তানদের জন্ম হচ্ছে, তাদের ভেতরেও আর ভারতের মূল সনাতন ভাবধারা, হিন্দুদের মূল ভাবধারা, এগুলো বিকশিত হচ্ছে না। অথচ হিন্দু নারীর ভেতর থেকে ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য একেবারে বিসর্জিত হতে পারে না। সেজন্য মেয়েরা কষ্টও পাচ্ছে। সংসারটাকে সুন্দরভাবে গুছিয়ে তুলতে পারছে না। কিন্তু তার মূল কারণটা কী সেটা তারা বুঝতে পারছে না।

তাই আবার হিন্দু নারীর মধ্যে প্রাচীন মাতৃত্ব যদি পরিপূর্ণভাবে ফিরিয়ে আনতে চাই, তাহলে ধর্মকে ধরতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন ভারতের সুসংস্কৃত ঐতিহ্যগুলিকেও নিজেদের জীবনে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করতে হবে।

মনে রাখতে হবে, যতই আমরা প্রয়োজনবোধে সংসারের ভার বহন করবার জন্য পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নানা বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে চেষ্টা করি, সেটা শুধু যুগের প্রয়োজনে এবং সংসারের আপাত প্রয়োজনের জন্য। কিন্তু স্বধর্ম বিস্মৃত হলে চলবে না। মাতৃত্ব যে নারীর স্বাভাবিক মূলবৃত্তি সেটি বিসর্জন দিলে হবে না। ভগবান দুটি জাতি যখন সৃষ্টি করেছেন, পুরুষ ও নারী, তখন যে কোনও পরিস্থিতি হোক, পুরুষের

স্বধর্ম পুরুষকে যেমন রক্ষা করতে হবে, তেমনি নারীর স্বধর্ম নারীকে রক্ষা করতে হবে। তা না হলে সংসারের অন্দরমহল ও বহির্মহল বলে দুটো স্থান থাকবে না এবং একটা গোছানো সংসার বা একটা balanced life-ও হবে না।

৩৭।। ভগবানকে যারা ঠিক ঠিক ভালবাসে তাদের অন্য চাহিদা থাকে না। সাধু হয়েও যে আমরা লিখেছি, গান করেছি, সুর দিয়েছি, তার জন্য কোনও মোহ নেই। আজ যদি না লিখি, না গাই, না সুর দিই, কোনও দুঃখ নেই। কারণ, ভগবানকে ভালবেসে আমরা সাধু হয়েছি। প্রতিভার বিকাশ তাঁরই কৃপায় চলার পথে হয়েছে। এটাই মূল নয়। তাই ভগবানের ইচ্ছা বলে সব কিছু মেনে নিতে কষ্ট হয় না। কিন্তু সাধারণত যারা ভগবানকে ভালবাসেনি তাদের প্রতিভার বিকাশে বাধা পড়লে খুবই দুঃখ হয়, আবার ক্ষোভ, বিদ্বেষ, এসবও চলে আসে।

৩৮।। সব দেখে শুনে মনে হয়, চারিদিকে একটা অশুভ শক্তি কাজ করছে। আমাদের সেই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে চলতে হবে। আমাদের ঠাকুর বিভিন্ন ধরণের আধারকে নিজের কাছে টেনে নিয়েছিলেন এবং অকুণ্ঠ কৃপা করেছিলেন। তিনি এক হাতে গরল ও আর এক হাতে অমৃত নিয়েছিলেন। তিনি যদি গরল পান করতে পারেন, তাহ'লে আমরা তাঁর ছেলেমেয়ে, আমাদেরও তো কিছু করা উচিত। তিনি যেমন নাম বিলিয়েছেন সকলকে, আমাদেরকেও তাঁর নাম সর্বত্র বিলিয়ে যেতে হবে। তিনি যদি গরল ও অমৃত দুই-ই গ্রহণ করেন, আমাদেরও দুটোকেই নিতে হবে।

৩৯।। শরণাগতি হল একটা পথ। আবার এই শরণাগতিই একটা অবস্থা। ভক্তি পথে শরণাগতিই মূল কথা। এর দুটো stage আছে। যখনই একটা স্বীকৃতি এল যে, একজন অদৃশ্য নিয়ন্তা আছেন তখনই এল বিশ্বাস এবং ধীরে ধীরে এই বিশ্বাস থেকে আসে নির্ভরতা, আনুগত্য এবং বাধ্যতামূলক

মনোভাব। কারও আশ্রিত হলেই একটা আনুগত্যের ভাব এসে যায়, কি বাড়িতে, কি আশ্রমে।

কিন্তু গুরুর প্রতি আনুগত্য বা শরণাগতির সঙ্গে গৃহে মা-বাবা, স্বামীর প্রতি আনুগত্যের মধ্যে একটু তফাৎ আছে। কারণ, জাগতিক ক্ষেত্রে যার প্রতি শরণাগতি এবং যে শরণাগত দুজনেই মানুষ অর্থাৎ কামনা-বাসনাযুক্ত আধার। সেখানে স্বার্থ আছে এবং উভয়েই সমান level-এ রয়েছে। কিন্তু আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে গুরু-শিষ্যের মাঝে আকাশ পাতাল ব্যবধান। গুরুর চরণে শিষ্যের সম্পূর্ণভাবে আত্মনিবেদনই শরণাগতি। সকল কাজে সকল সময় তাঁকেই চিন্তা করা, তিনি যা কিছু বলবেন নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়া এবং তিনি যে কোনও কাজ বলবেন, সেটাই সম্পাদন করা শরণাগতির লক্ষণ।

কোনও রকম দ্বিধাবোধ বা প্রশ্ন শিষ্যের মনে স্থান পাবে না। প্রার্থনা অবশ্যই থাকবে তবে কোনও জাগতিক চাহিদা নয়। এটা শরণাগতির প্রথম অবস্থা। এর পরের অবস্থায় সুখ-দুঃখ যাই আসুক না কেন মনে হবে তিনিই তো করাচ্ছেন। এই অবস্থায় নিজের জন্য আর কোনও প্রার্থনা থাকে না। দেহ-মন-আত্মা সব তাঁর চরণে সমর্পিত হয়ে যায়। আবার জ্ঞানপথেও শরণাগতি আছে। সেটা হল অজগরবৃত্তি। জ্ঞানপথে তো দ্বৈতভাব নেই।

৪০।। সত্যানন্দ সম্পূর্ণ সাফল্যের সঙ্গে তিরিশ বছর ধরে নিজের দায়িত্ব পরিপূর্ণরূপে পালন ক'রে টুক ক'রে চলে গেলেন। আমাদের যে এগারটি মেয়ের বিশেষ দায়িত্ব নিয়েছিলেন তাদের সবকটিকে বাঁচিয়ে রাখলেন, সবদিক থেকে রক্ষা করলেন, মানুষ করলেন। তারপর সবারই যখন একটা বয়স পেরিয়ে গেল—সবচেয়ে যে ছোট তারও তিরিশ পেরিয়ে গেল, তখন তিনি চলে গেলেন। আর একটি বছর থাকলেই শোক পেতে হত।

কাশীপুর বাড়ির কর্তা ঠাকুরের পিতৃদেব একবার ঠাকুরকে বলেছিলেন—"এই যে সব চারিদিকে কলেরা হচ্ছে, অসুখ-বিসুখ হচ্ছে, আর তুমি এই ছোট ছোট মেয়েদের মায়ের দুধ ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছ, এদের কী হবে বাবা? তোমার কি এদের জন্য চিন্তা হয় না?" ঠাকুর সেদিন সুগম্ভীর দৃঢ় কণ্ঠে কর্তাকে বলেছিলেন,—"কিছু চিন্তা করবেন না—নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। আপনি দেখবেন আমি যতদিন আছি ছোটদের একটিও কেউ যাবে না।"

কর্তা তো তারপরই স্বধামে চলে গেলেন। আমরাই বসে বসে দেখলাম—ঠাকুর পরিপূর্ণ মাতৃসত্তা নিয়ে সম্পূর্ণরূপে সফল হয়েই চলে গেলেন। যে ছোট মেয়েদের আনলেন তাদের গার্জেনরা সে সময় অনেকেই খুব চিন্তিত হয়েছিল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। কোনও কিছু অঘটন ঘটলে গার্জেনদের কী জবাব দিতেন? কিন্তু ঠাকুরের এমনি কৃপা যে, কোনও অঘটন ঘটেনি তিরিশ বছরের লীলাকালে।

গুরু হিসেবে অন্য কোনও অবতারে এটা হয়নি। রামকৃষ্ণদেব শিষ্যদের সঙ্গ দিলেন বলতে গেলে মাত্র তিন বছর। কিন্তু আমাদের ঠাকুরের বেলা সেটি হ'ল তিরিশ বছর। কথায় বলে—অনেক ফল যে গাছে থাকে, সেখান থেকে দু-চারটি ঝ'রে প'ড়ে যায়ই। সংসারেও প্রায় এটা দেখা যায়। কিন্তু আমাদের এইসব কমজোরি শরীর, তাতে কত ফাঁড়া গেছে বছর বছর, কিন্তু ঠাকুর ঠিক টেনে টেনে তুলেছেন। তাছাড়া, এই গঙ্গার ধার, খোলা জায়গা, কোনও নিরাপত্তা নেই, অসুখ-বিসুখও ছড়িয়েই আছে চারিদিকে; তার মধ্যে একসঙ্গে এতগুলি ত্যাগী কন্যা ও সন্তানদের জীবনরক্ষা, শরীর সুস্থ রাখা এবং আধ্যাত্মিক জীবন গড়ে তোলা—এ কি কম কথা!

৪১।। ভাল পথে এগোতে গেলে দেখা যায়, অনেক রকম জটিল বাধার

সৃষ্টি হয়। এর সবটাই জানবে ঠাকুরের পরীক্ষা। তিনিই প্রত্যেক মানুষকে এরকম বিভিন্ন বাধার মধ্য দিয়ে পরীক্ষা করেন। দেখেন যে, কে কতখানি প্রস্তুত আছে তাঁর দিকে এগিয়ে আসার জন্য। এই পরীক্ষার মধ্য দিয়েই প্রত্যেকের জোরালো মনের পরিচয় পাওয়া যায়। যদি আমাদের প্রত্যেকেরই তাঁকে পাবার জন্য ব্যাকুলতা থাকে এবং দৃঢ় ইচ্ছা থাকে তবেই আমরা চলার পথের সব বাধাকেই নিমেষে অতিক্রম করতে সক্ষম হব।

আমি তোমাদের একটা practical উদাহরণ দিই। ধর, তুমি মন্দিরে যেতে চাইছ, কিন্তু মন্দিরের পথে ভীষণ ভিড়। তখন তোমায় সেই ভিড়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হলে প্রথমে simply বলতে হবে—দেখি বাবা, একটু পথ দাও। এই বলতে বলতে তুমি যথাস্থানে পৌঁছে যাবে। কিন্তু যদি কেউ মন্দিরের পথে যেতে তোমাকে ইচ্ছে ক'রে বাধা দেয় বা তোমাকে যেতে না দেয়, তখন তোমার পথকে clear করার জন্যে একটু জোর করতে হবে, প্রয়োজন হলে অবস্থা বুঝে হয়তো বলপ্রয়োগও করতে হবে এবং সেটাতে কোনও অপরাধ হয় না।

৪২।। পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যটাই আসল। সেটা ঠিক ঠিক হলে পরে গেরুয়া। আগে গেরুয়া নিলে গেরুয়ার কোনও মর্যাদাই থাকে না। মহামায়া মেয়েদের রূপ ধরে ছেলেদের চোখের সামনে দাঁড়ান। প্রত্যেকটি মানুষকে এইভাবে প্রলোভন দেখান। মহামায়ার সেই রূপটিকেই মা বলে প্রণাম করবে। তখন তিনি নিজেই লজ্জা পেয়ে চলে যাবেন।

মেয়েদের বেলায় এর ঠিক উল্টো। মেয়েদের সামনে মহামায়া আসেন ছেলের রূপ ধরে। তখন মাতৃভাব আশ্রয় ক'রে তাকে সন্তান বলে মনে করবে। একটা কিছু point পেলেই মন নীচে নেমে যায়। ক্ষুদ্র থেকেও ক্ষুদ্র বাসনা আছে। তাই গেরুয়া পরলেই যে ভাল সাধু হয়ে গেল তা নাও হতে পারে। ওদেরও মনে মহামায়ার সাথে যুদ্ধ চলে। সকলের

জীবনেই এটা হয়। আজীবন এই যুদ্ধ ক'রে যেতে হয়। এমনকি ঠাকুর রামকৃষ্ণও নজিরের জন্য এ অবস্থা দেখিয়েছেন।

তাই প্রার্থনা ক'রে যেতে হবে। এই যুগটা প্রার্থনার যুগ। শরণাগত হয়ে প্রার্থনা করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

৪৩।। অন্তরে শুভবুদ্ধির গৈরিকটি পরলে পরে আর বাইরে গেরুয়া না পরলেও ঠাকুরের কাজ করা যায়, গৃহে থেকেও কর্মযোগী হওয়া যায়।

৪৪।। নিত্যলীলা সব সময় চলছে। ভগবানের যে লীলা স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, সেটাই নিত্যলীলা। এ লীলা স্থূল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দেখা যায় না, শোনা যায় না, আস্বাদন করা যায় না। সাধনার দ্বারা যদি কোনও সাধক চিন্ময় দেহ লাভ করেন, তবে নরদেহে থেকেই তিনি ইচ্ছা করলে যখন খুশি ভগবানকে দর্শন করতে পারেন।

৪৫।। আধ্যাত্মিক জগতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথে একটি প্রধান গুণ সহ্যশক্তি। সহ্যশক্তি অর্থাৎ অহংকে নত ক'রে তাঁর চরণে সঁপে দেওয়া। আমি সহ্য করছি, তার অর্থ হল এই যে, আমি আমার অহংকে বিলুপ্ত ক'রে তাঁর চরণে নিজেকে নিবেদিত করছি। ভগবান পরীক্ষা করেন— আমরা কতখানি তাঁর আপন হতে পেরেছি। যতই ঝড়ঝঞ্ঝা বিপদ আসুক না কেন, কতখানি নীরবে সেটি সহ্য করতে পারি। সুখ দুঃখ সবই ঈশ্বরের দান বলে ভাবতে চেষ্টা করতে হয়। কোনও রকমে বহিঃপ্রকাশ ঘটবে না আমার অন্তরের ভাবের।

প্রত্যেক মহাপুরুষের জীবনেই দেখি, কত দুঃখ আঘাত তাঁরা সহ্য করেছেন নীরবে, বিনা প্রতিবাদে। কোনও সত্য বা আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন প্রথমে নিজে সহ্যশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। অপরকে শিক্ষা দিতে গেলে বা অসৎ কিছুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেও তা সফল হবে না, যদি না, নিজের জীবনে এই সহ্যগুণটিকে আয়ত্ত করা যায়।

৪৬।। যে যেটি চিন্তা করে সে সেটি হয়ে যায়। পরিবেশটা গৌণ, মনটাই আসল। যদি বদ্ধ পরিবেশে থেকেও মনে মনে আমি চিন্তা করি 'আমি মুক্ত, আমি মুক্ত'—তবে আমি মুক্তই হয়ে যাব। জ্ঞানীরা 'সোঽহং সোঽহং' চিন্তা ক'রে তারা এভাবে বিচার করতে করতে ঈশ্বরের স্বরূপ প্রাপ্ত হয়।

৪৭।। সব মানুষের আদর্শ এক নয়। বিভিন্ন মানুষের আদর্শ বিভিন্ন রকমের হয়। কিন্তু আদর্শ নানা রকমের হলেও লক্ষ্য এক—সেই ঈশ্বর লাভ। ভগবান তার কাছে কী আদর্শ নিয়ে দাঁড়াবেন সেটা নিজেকেই ঠিক ক'রে নিতে হয়। প্রত্যেক মানুষ তার নিজের জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারলে খুশি। কিন্তু ultimate আদর্শ হচ্ছেন ভগবান। আজ হোক্ কাল হোক্ হাজার জনম পরে হোক্ পৌঁছতে হবে সেখানে। আদর্শ বিবিধ রূপে ছড়িয়ে আছে, ভগবানই সেই আদর্শের উৎস।

৪৮।। সংসারের ভালবাসা স্বার্থের ভালবাসা। ছেলেমেয়ের ঠিক ঠিক কুশল কিসে হবে—মা-বাবা তা বুঝতে চায় না। ঠিক ঠিক ভালবাসা হলে মনে হবে ছেলেমেয়ে যে যেখানে থাকুক, সুখে থাকুক, সৎ পথে থাকুক, ভাল থাকুক। নিজের স্বার্থ-চিন্তা সেখানে থাকে না।

৪৯।। প্রশ্ন ঃ হঠাৎ মনে হ'ল গোপালের ক্ষিদে পেয়েছে, ভোগ দিতে হবে, কি গোপালের ঠাণ্ডা লাগছে—চাদর দিতে হবে, গরম-জলে চান করাতে হবে, অনেকে ভাবে এইগুলো কি সত্যি?

উত্তর ঃ ওগুলো সবই সত্যি। ওগুলোকে কখনও মিথ্যে ভাববে না। গোপালকে কখনও ভাবতে নেই—ও তো ভগবান, ওর আবার ক্ষিদে কি, চান কি, ঠাণ্ডা কি! গোপালকে ভাবতে হবে নিজের ছেলে বলে। ভগবান ভাবলে ওর অভিমান হয়, আর ও তখন চলে যায়।

৫০।। প্রশ্ন ঃ বিশ্বাস কেমন ক'রে হয়?

উত্তর ঃ প্রত্যেক মানুষের ভেতর বিশ্বাসের বীজ তার সহজাত

সংস্কার বা প্রবৃত্তিরূপেই আছে। তা যদি না হত মানুষ পাগল হয়ে যেত, তার সারাজীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ একটি অনিশ্চয়তার মাঝে দিশাহারা হয়ে যেত। কাল সকাল হবে, এ বিশ্বাসটা যদি না থাকত, তাহলে জীবনের প্রস্তুতি বলে কিছুই থাকত না। কাজেই বিশ্বাস আমাদের ভেতরে প্রতিটি মুহূর্তে অনুস্যূত হয়ে আছে। এই বিশ্বাসটাকে ভগবৎ বিশ্বাসে পরিণত করতে হলে তার জন্য আলাদা একটি জীবন তৈরি করতে হবে।

প্রথমেই ধরে নিতে হবে একটি সর্বোত্তম তত্ত্ব আছেন, তা না হলে জগৎ দাঁড়াতে পারত না, পড়ে যেত। একটা গৃহের ব্যবস্থাপনার জন্যেই একজন মালিক যদি দরকার হয়, তাহলে এতবড় এই বিশ্বসংসার মালিকহীন হয়ে পরিচালিত হওয়া কী ক'রে সম্ভব? অর্থাৎ তিনি আছেন, এ বিশ্বাস আমাদের অনাবিষ্কৃত সত্য বলে দৃঢ়ভাবে ধরে নিতে হবে এবং সেই সত্যকে উপলব্ধি করবার জন্য চেষ্টা করতে হবে।

ভগবৎ-বিশ্বাস আনতে গেলে প্রথমে দরকার গুরুকরণ। তাঁর দেওয়া নাম প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে, তাঁর একটি রূপ আছে এটি চিন্তা করতে হবে। জোর ক'রে বিশ্বাস করতে হবে। আমাদের ঠাকুর সত্যানন্দদেব বলতেন—জীবনে একটি অভাববোধ থাকা দরকার, যে অভাবটিকে ভগবৎ-বিরহে রূপান্তরিত করা যাবে। ভগবৎ-বিরহ না হলে বিশ্বাসটা ঠিক পাকা হয় না। একটা কিছু আছে সেটা আমরা পাচ্ছি না, এই অভাবটা যদি জাগাতে পারি জোর ক'রে, তাহলে দেখা যাবে বিশ্বাস আপনি এসে অন্তর জুড়ে বসেছে। এরজন্য প্রার্থনা, কিছু তপস্যা, কিছু ত্যাগ স্বীকার এবং সবের ঊর্ধ্বে গুরুবাক্যে নিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজন। বিশ্বাস আছে, বিশ্বাস থাকবে, শুধু তাকে উদ্বোধিত করতে হবে ভগবৎ বিষয়ে, তাঁর কৃপা প্রার্থনা ক'রে এবং সদ্‌গুরুর চরণাশ্রিত হয়ে।

৫১।। প্রশ্ন ঃ পথে চলতে চলতে শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য ঠিক থাকে না

অনেকক্ষেত্রে—এর কারণ কি?

উত্তর ঃ মানুষের একটা স্বাভাবিক সংস্কার আছে। সেটা হচ্ছে গতানুগতিক জীবনযাপন করা। বিয়ে-থা ক'রে সংসার-ধর্ম পালন করা, সন্তান প্রতিপালন করা, সংসার গোছানো। ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের এই সংস্কার বেশি। তাদের মানসিক গঠন এরজন্য দায়ী। আর একটি কারণ হচ্ছে, দিব্য পথ নিয়ে যারা চোখের সামনে রয়েছে তাদের অনেকেই হয়তো ঠিক একটা মহৎ আদর্শে পৌঁছতে পারে না, যেগুলি তাদের দৈনন্দিন জীবনের আচরণের মধ্যে প্রকাশ পায়। যারা একটু চিন্তাশীল তাদের দিব্যজীবন গ্রহণ করার পথে থমকে যাওয়ার এটাও একটা কারণ।

ঐ উদাহরণগুলি দেখেই তাদের অবচেতন মনে একটা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় যে, তাহলে দিব্যপথ নিলে আমাদেরও তো ওরকম ভুলভ্রান্তি বা আদর্শবিচ্যুতি ঘটতে পারে এবং না পাওয়ার একটা frustration-ও আসতে পারে। যার ফলে বহু বৎসর পরেও মনে হতে পারে যে, এর চেয়ে সংসারধর্ম পালন করাই হয়তো ভাল ছিল। এইসবের জন্যই আমাদের ঠাকুর সত্যানন্দদেব কয়েকটি মাত্র পরিবারের মায়েদেরই আশ্রয় দিলেন। বর্তমান যুগের ভয়াবহতা, সামাজিক অব্যবস্থা এসব দেখে পরিপূর্ণভাবে ত্যাগব্রত অর্থাৎ গৈরিকবস্ত-জীবন নিতে অল্পবয়সের ছেলেমেয়েদের একটু ভয় হয়। সেজন্যই তারা হয়তো ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পিছিয়ে আসে। অথচ যারা বিচক্ষণ বা যাদের বিবেকবুদ্ধি জাগ্রত তারা পরিপূর্ণভাবে গৃহীজীবন নিতেও হয়তো ভয় পায়। সেখানেও প্রশ্ন—সে দায়িত্বও পালন করতে পারব কিনা? দুটো ক্ষেত্রেই কিন্তু প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে, জোরালো মনের অভাবই এর মূল কারণ। নিজের জোরালো ইচ্ছার উপর ভরসা না থাকলে ঠিক এইরকম দ্বন্দ্ব-দোলার মাঝে সময় কেটে যায়। আমি পথে নেমে যদি চিন্তা করি আজকের যাত্রাটা আমি কোন্ দিকে শুরু

করব, তাহলে একবার উত্তর, একবার দক্ষিণ বা পূর্ব পশ্চিম, সবটাই একটু একটু ক'রে এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এসে একটি জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, কোনও দিনই চলা আর হবে না। কিন্তু আমি পথে নামবার আগেই যদি আমার গন্তব্যস্থলটি ঠিক ক'রে নিই এবং তার সঙ্গে ঠিক ক'রে নিই যে, আমার পক্ষে কোন্ পথে গেলে সেই গন্তব্য স্থলে যাওয়া বেশি সুবিধাজনক, তাহলে এই আধপথে যাওয়া আর ফিরে আসা, আবার অন্যপথে যাত্রা শুরু ক'রে ফিরে আসা, এই দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে।

অনেক সময় পারিপার্শ্বিকের চাপে হয়তো জোরালো ইচ্ছাকে রূপ দিতে পারা যায় না। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় নিজের অস্থির মতির জন্যই পারিপার্শ্বিক অনুকূল হয়েও প্রতিকূল অবস্থারই সৃষ্টি করে। আমাদের ঠাকুর একটা কথা বলতেন,—"sincerity of purpose চাই"। এই sincerity-র অভাব এখন এযুগে, বিশেষ ক'রে আমাদের দেশে, বড় বেশি। ভোগ-সর্বস্ব এই যুগ কিছুতেই মানুষের মনকে একটা দিব্যলক্ষ্যে স্থির থাকতে দেয় না। কাজেই এর প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া বড় মুশকিল। সেক্ষেত্রে জোরালো মন, জোরালো ইচ্ছা, সবকিছু নিয়ে ভগবৎ চরণে একটা স্থির উদ্দেশ্যে পৌঁছনোর প্রার্থনা নিত্য করা উচিত।

সব সময় ত্যাগব্রত মানেই যে পরিপূর্ণ সন্ন্যাস তা নাও হতে পারে। নানারকম সৎকর্ম বা নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ানোর মত কর্ম করেও দিব্যজীবন, পবিত্রজীবন কাটিয়ে দেওয়া যায়। তবে মূল কথা হল, ভেতরে যে একটি কোমল চাহিদা মেয়েদের থাকে স্বামী এবং সন্তানের, সেই চাহিদা যদি না থাকে বা জয় করা যায়, তবেই এটা সম্ভব। তা না হলে নিজের মনকে যাচাই ক'রে নিয়ে সংসার পথই গ্রহণ করা ভাল। নিজের মনকে নিজে না বুঝলে কোনও উপায় নেই। গুরু আছেন, ইষ্টও আছেন কিন্তু মনটি যদি সংসারের জন্য আকুল হয়ে থাকে ভেতরে ভেতরে, শুধু একটা

দিব্য প্রভাবে পড়ে সাময়িকভাবে মনে হচ্ছে হয়তো এই পথটাই ভাল, সেখানে সারাজীবন পবিত্রভাবে কাটানো মুশকিল। কাজেই লক্ষ্যটি স্থির করতে হবে এবং দৃঢ় ইচ্ছা ও প্রার্থনা ঠিক রাখতে হবে। যাচাই করতে হবে নিজের মনকে যে, আমি যে দিব্যজীবনে থাকতে চাইছি, সেটা কোনও দিব্যজীবনের প্রভাবেই সাময়িকভাবে হচ্ছে, না সত্যিকারই আমার অন্তরে বিশেষ একটা চাহিদা আছে ঐ জীবনের প্রতি।

এইটি স্থির হলে তারপর প্রার্থনা করা উচিত দিব্যজীবনের জন্য। প্রার্থনা করা উচিত যে, কোনও দিনই যেন পথচ্যুত না হই। কোনও পারিপার্শ্বিকই যেন আমাকে টলাতে না পারে। ঠাকুর একটা কথা বলতেন,—marginal সাধু। তাদের মনটা পড়বার জন্য তৈরি হয়েই থাকে। যে কোনও একটা ছুতো পেলেই সে ত্যাগপথ ছেড়ে ভোগের পথ ধরে ফেলে। এইরকম 'marginal' সাধুর মন নিয়ে অবিবাহিত জীবনযাপনের কোনও অর্থ হয় না।

৫২।। প্রশ্ন ঃ মাতাল স্বামীর সতী স্ত্রী মারধোর খেয়েও স্বামীর পায়ে মাথা রেখে যেতে চায়। এটা কি সতীত্ব?

উত্তর ঃ শিবস্বামী হলে তবেই সতীত্ব সার্থক। নইলে এ-ধরণের সতীত্ব অসার্থক। শিবতুল্য স্বামী না হলে, সতী-স্ত্রীর সতীত্বটা বড় হবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু যে সতীকে আমরা দুর্গা-শক্তির সঙ্গে তুলনা করি সেই রূপটি ঠিক ফুটবে কিনা এতে আমার একটা সন্দেহ আছে। তবে আর একটা কথা এরই পাশাপাশি মনে হয়—এই যে চিরন্তন স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ভিতরে স্ত্রীর ঐকান্তিক নিষ্ঠার আদর্শটি আমাদের হিন্দুধর্মে বড় করা হয়েছে, নিশ্চয়ই এর পেছনে একটা কিছু নিগূঢ় কারণ আছে।

যে সত্যিকার সতী-স্ত্রী তার ভাবের সিংহাসনে তার স্বামী দেবতার

স্থানই করে নেয়, সে যত নিকৃষ্ট স্তরের মানুষই হোক্ না কেন। এই যে ভাব সত্তায় আরোপিত উপাধি, এটা কিন্তু পাথরে প্রাণ জাগানোর মতই একটি সাধনা। এখানে স্বামীর দেহটা একটা আধার মাত্র। স্বামীর যে নিকৃষ্ট সত্তা সেটা সেখানে গৌণ হয়ে যায়। সতী-স্ত্রীর ঐকান্তিক নিষ্ঠাভক্তির শ্বেত-চন্দনে সে রূপ দেবতায় পরিবর্তিত হতে পারে অন্তত সতী-স্ত্রীর চোখে।

কিন্তু এই জিনিসটি খুবই দুর্লভ। কারণ, বেশিরভাগই দেখা যায়, স্বামীর প্রতি যে ভালবাসা সেটি মোহযুক্ত ভালবাসা। অসৎ স্বামীর বা মনের মত না-চলা স্বামীর স্ত্রী তাকে ঠিক দেবতার আসনে বসাতে পারে না। আবার তাকে ছাড়তেও পারে না। মোহটাকে সতীত্বের একটা মুখোস পরিয়ে দেয়। স্বামীর নিন্দাও করে অথচ কান্নাকাটিও করে। এই সতীত্বকে সেই আদর্শ সতীত্বের পর্যায়ে ফেলা যায় না। তবে সমাজে শৃঙ্খলার জন্য স্বামীর প্রতি আনুগত্যেরও একটা প্রয়োজন আছে। সেটা একদিক থেকে মন্দের ভাল।

৫৩।। প্রশ্ন ঃ "ভাগবত ভক্ত ভগবান—তিনে এক, একে তিন।" শ্রীঠাকুরের এই বাণীর তাৎপর্য কি?

উত্তর ঃ ভাগবত ভক্ত ভগবান—তিনটিই এক সত্তার প্রকাশ। ভগবানেরই কথা আছে ভাগবতে আর ভক্তের ভেতরেও রয়েছে তাঁরই সত্তা। নাম নামী অভেদ। তেমনি ভগবান ও ভাগবত অভেদ। ভক্তের হৃদয় হচ্ছে ভগবানের বৈঠকখানা। ভক্ত এবং ভগবান—এ দুটি এমন কথা যে, একটিকে বাদ দিয়ে আর একজনের অস্তিত্ব ভাবা যায় না। ভগবান আছেন বলেই ভক্ত আছে, আবার ভক্ত আছে বলেই ভগবান আছেন। নইলে ভগবান সম্বন্ধে কোনও ধারণাই হ'ত না, তিনি নিরাকার ব্রহ্মরূপেই থাকতেন, শুধু যা আছে তাই অবস্থা। ভক্ত যেমন ভগবানের উপর নির্ভর, তেমনি ভগবানও ভক্তের উপর নির্ভর। ভক্ত ছাড়া তাঁর নাম প্রচার, নাম

গুণগান কে করবে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি দর্শনের কথা আমরা জানি। অক্ষয় শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র। পূজা করছেন ও ভাগবত পাঠ করছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব দেখলেন শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি থেকে একটি জ্যোতি এসে তাঁর বুকে স্পর্শ করল এবং সেই জ্যোতিরেখাই এসে ভাগবতকে স্পর্শ ক'রে একটি ত্রিকোণ রচনা করল। তখনই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল 'ভাগবত-ভক্ত-ভগবান'। শ্রীঠাকুরের সব বাণীই এমনি এক একটি দর্শন। তাই এই কথাটি সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি সাপেক্ষ। Realisation ছাড়া একথা বলা যায় না, বোঝা যায় না।

৫৪।। প্রশ্ন ঃ অতিরিক্ত মাত্রায় আত্মবিশ্বাস হলে সেটা কি অহং-এর পর্যায়ে পড়ে? এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে অহং-এর কি কোন যোগ আছে?

উত্তর ঃ আত্মবিশ্বাসটা সাধারণভাবে দেখলে সেটা নিশ্চয়ই অহংকারের মতই দেখায় এবং এর সঙ্গে অহংকারের যে কোনও যোগ নেই তাও বলা যায় না। কারণ, আত্ম মানেই একটি অহং সত্তা। কাজেই ব্যাপক দৃষ্টিতে ব্যাপকভাবে বিচার করলে আত্মবিশ্বাস মানে নিজের প্রতি আস্থা অর্থাৎ অহং তত্ত্বের প্রতি আস্থা।

অথচ দেখা যায়, জীবনে উন্নতি করতে হলে আত্মবিশ্বাসের একান্ত প্রয়োজন। সাধারণভাবে জাগতিক ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে অহং-এর যোগ থাকলেও এ নিয়ে আত্মবিশ্বাসীর মনে কোনও প্রশ্ন জাগে না। সে অহংপ্রসূত আত্মবিশ্বাসের জোরে এগিয়ে চলে এবং সাফল্যমণ্ডিত হলে মনে করে প্রবল আত্মবিশ্বাসই তাকে সাফল্য এনে দিয়েছে। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে অহং-এর যোগসূত্র আছে কিনা, ও-প্রশ্নটা বিশেষ ভাবে ওঠে ধর্মপথের পথিকদের মনে। সে ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে, আত্মবিশ্বাস নিশ্চয়ই প্রয়োজন কিন্তু সে আত্মবিশ্বাস আশ্রয় করবে ভগবৎতত্ত্বের অহংকে। তখনই এর সম্পূর্ণ রূপটা পালটে যাবে। তখন আমার আত্মবিশ্বাসটা—আমি ভগবানের

আশ্রিত, আমি তাঁর সন্তান, আমি তাঁর দাস, এই ভাবের উপর দাঁড়িয়ে আছে।

এ আত্মবিশ্বাসে একদিকে যেমন এগিয়ে যাবার প্রেরণা ও অটুট মনোবল থাকে তেমনি আর একটি দৃষ্টি থাকবে তাঁর ইচ্ছার, তাঁর ইঙ্গিতের দিকে, তাঁর চিন্তা জড়িয়ে থাকবে তাঁর প্রতি গভীর অনুরাগ ভরা বিশ্বাসের সঙ্গে। এতে শক্তিও আছে আনন্দও আছে। এই আত্মবিশ্বাস কখনও সাধককে নিরাশার অন্ধকারে ডুবে যেতে দেয় না। অনেকেই মনে করে এই অসাফল্য যেন ভগবানের দেওয়া ক্ষণিক বিরতির ইঙ্গিত। তবে একটা কথা, ভগবানের শরণাগত আত্মবিশ্বাসীর সংখ্যা খুবই কম বলা চলে। কারণ, দেখা যায় সাধনার পথে বা দিব্য কর্মপথে নানা বাধাবিপত্তির আক্রমণে ভক্ত বা সাধক মাঝে মাঝে বেশ হতাশ হয়ে পড়ে। মনে হয়, এই বুঝি ভগবান তার সামনে থেকে সরে গেছেন। সেই মুহূর্তে সে আত্মবিশ্বাসও হারিয়ে ফেলে।

একটি সাধারণ মানুষের আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ভক্তের আত্মবিশ্বাসের এইখানেই মস্ত বড় তফাৎ। কারণ, ভক্তের আত্মবিশ্বাস ভগবৎ-বিশ্বাসের আশ্রয়চ্যুত হওয়ার সম্ভাবনাতেই দারুণভাবে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। তার তখন একমাত্র অবলম্বন আকুল প্রার্থনা। ভগবৎ-বিশ্বাসের প্রার্থনা, মনোবল ফিরে পাওয়ার প্রার্থনা, সবই সে করে ঈশ্বরের দিকে দুহাত বাড়িয়ে। আত্মবিশ্বাসী ভক্তের আত্মবিশ্বাস একটি মাতৃক্রোড়াশ্রিত শিশুর বিশ্বাস। মাতৃক্রোড়ের স্পর্শটুকু যতক্ষণ অনুভব করতে পারে ততক্ষণ তার বিন্দুমাত্র শঙ্কা বা বিন্দুমাত্র ভয় থাকে না। অতএব ভক্তের আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কাঁচা অহং-এর কোনও সম্পর্ক নেই। তার আত্মবিশ্বাস ভগবৎ-চরণে আত্মবিক্রীত বিশ্বাস। আমাদের ঠাকুর সত্যানন্দদেবের বাণীতে যেটা পাই "আমার অহংটি ইষ্টের চরণের ছায়া।"

৫৫।। প্রশ্ন ঃ উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন, পতির জন্য পতি প্রিয় হয়

না, পুত্রের জন্য পুত্র প্রিয় হয় না, আত্মার জন্যই পতি বা পুত্র প্রিয় হয়। সেই আত্মাই তো প্রতিটি মানুষের ভেতরে আছে, তবু কেন প্রতিটি মানুষ মানুষের প্রিয় হয় না?

উত্তর ঃ আত্মা প্রত্যেকেরই ভেতরে আছে সত্যি, কিন্তু মহামায়ার মোহকরী শক্তিতে প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে দেহাত্মবোধের একটি আবরণ সৃষ্টি হয়েছে। যার ফলে সে প্রথমে সেই আত্মাকে কেবলমাত্র নিজের ক্ষুদ্র দেহের মধ্যে উপলব্ধি করতে পারে এবং সবচেয়ে সে নিজেকেই ভালবাসে। সেই দেহাত্মবোধ আর একটু বিস্তৃত হওয়ার ফলে তার দেহকে কেন্দ্র ক'রে যে পরিবারবর্গ রয়েছে—পতি, পুত্র ইত্যাদি রূপে, তাদের প্রতি মমত্ব বোধ জেগে ওঠে।

এই দেহাত্মবোধ যতক্ষণ তার ভেতরে গণ্ডিবদ্ধ অবস্থায় থাকে ততক্ষণ সে সবার মধ্যে সেই আত্মতত্ত্বকে উপলব্ধি করতে পারে না এবং সবাইকে সমান ভালবাসতে পারে না। যারা সাধন পথের পথিক, তাদের এই দেহাত্মবোধ ক্ষুদ্র গণ্ডী ভেঙে ধীরে ধীরে বিশ্বাত্মবোধে পরিণত হয়। অবশ্য এটি বিরাট একটি সাধনার চরম পরিণতি— সহজে হয় না। যার জন্য গীতায় বলা আছে—"সর্বভূতে ঈশ্বরদর্শনকারী মহাত্মা সুদুর্লভ।"

৫৬।। প্রশ্ন ঃ রামকৃষ্ণদেব বলেছেন, "সংসারে থেকেও ঈশ্বর লাভ হয়" এবং আমাদের ঠাকুর সত্যানন্দদেব বলেছেন, "সব ছোড়ে তো সব পাওয়ে"— এই দু'টির মধ্যে সামঞ্জস্য কি?

উত্তর ঃ একটা কথা মনে রাখতে হবে—শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন বটে যে, সংসারে থেকেও ঈশ্বর লাভ হয়, তার অর্থ এই নয় যে, গভীরভাবে সংসার-পাঁকে নিমগ্ন থেকে ঈশ্বর লাভ হয়। সংসারে থেকে ঈশ্বর লাভ করতে গেলে কিভাবে সংসারে থাকতে হবে তার উদাহরণ ঠাকুর বহুভাবে দিয়েছেন। একটা উদাহরণ, যেমন—পাঁকাল মাছের মতো সংসারে থাকা অর্থাৎ পাঁকে আছে তবু গায়ে পাঁক লাগছে না। হাতে তেল মেখে কাঁঠাল

ভাঙ্গার উদাহরণ, যে তেল কাঁঠালের আঠায় হাতকে জড়াতে দিচ্ছে না। এই যে অবস্থা—এটি সাধারণের পক্ষে খুবই কঠিন। ঈশ্বরের প্রতি কতখানি অনুরাগ হলে এই অবস্থা লাভ করা যায় সেটা বেশই চিন্তার বিষয়। গায়ে পাঁক না লাগার মতো তৈলাক্ত দেহ, বা হাতে আঠা না জড়ানোর মতো তৈলাক্ত হাত, এইগুলিকে ঠাকুর ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিরূপ তেল বলে বোঝাতে চেয়েছেন। সংসারে থাকতে হবে অথচ মনটিকে তুলে রাখতে হবে ঈশ্বরের পাদপদ্মে। এইটি সহজে হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব আর একটি উদাহরণ দিয়েছেন যে, জলে মাখন রাখলেও জলের সঙ্গে মাখন মিশে যায় না, জলের উপরে ভেসে থাকে। এই যে সংসারে থাকা, এটি সংসারে না থাকারই সামিল। এর উদাহরণ যেমন নাগমশাই বা আরও অনেক গৃহী সাধকের জীবনবেদে আমরা পাই; যারা গৃহে থেকেও সন্ন্যাসী। কর্তব্য কর্মটুকু ক'রে যাচ্ছে অথচ মনে কোন রেখাপাত করছে না। সংসারে থেকে এ বড় কঠিন। আমাদের ঠাকুর সত্যানন্দদেব যে বললেন,—"সব ছোড়ে তো সব পাওয়ে", এটা তো সেই একই কথা বললেন, অর্থাৎ মন থেকে সব কিছু সরিয়ে দাও, সে মনে তখন ভগবানের প্রতি ভালবাসা আপনিই আসবে।

আমাদের ঠাকুর তো আগেই বলেছেন যে, ভগবানকে ভালবাসা সবচেয়ে কঠিন। তার কারণ, মনে আমাদের সংসারের ভালবাসার বস্তুগুলি বাসা বেঁধে বসে আছে, সেখানে ভগবানের স্থান কোথায়। আমাদের ঠাকুর এর কারণও অবশ্য বলেছেন যে—ভগবান সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব; তাই মানুষ তাঁকে সব সময় হাতের কাছে পায় না এবং সে স্থূল বস্তুর প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সংসারে থাকব অথচ স্থূল বস্তুর প্রতি মন থাকবে না, এটা তো সবার পক্ষে সম্ভব নয়।

তাই সর্বত্যাগের উপদেশটি মহাজনেরা দিয়ে থাকেন, ভগবানকে পাওয়ার জন্যে। কিন্তু আবার সবার পক্ষে সংসার ত্যাগ করা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে কেউ যদি সংসারে থেকে মন থেকে সমস্ত কিছু সরিয়ে দিয়ে

ঈশ্বরকে নিয়ে পড়ে থাকে তাহলে সেখানে থেকেও হতে পারে। অতএব আমাদের ঠাকুরের বাণী এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী উভয়ের তাৎপর্য এই যে, সংসারে থাক আর সংসারের বাইরে থাক, ভগবানকে পেতে হলে ষোল আনা মন তাঁকে দিতে হবে। অর্থাৎ "সব ছোড়ে তো সব পাওয়ে"র অর্থ ঈশ্বরকে পেতে হলে মন থেকে সব ঝেড়ে ফেলতে হবে।

৫৭।। **প্রশ্ন** ঃ বিবেক জাগ্রত না হলে ধর্ম পথে মানুষ এগোয় না, কিন্তু যারা ধর্ম পথে এগিয়েছে তাদেরও অনেকের নানা ধরণের সংকীর্ণতা বা ধর্ম পথ থেকে পিছিয়ে আসা ইত্যাদি কেন দেখা যায়?

উত্তর ঃ এর কারণ, উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আকাশে সূর্যও আছে মেঘও আছে। সূর্য থাকা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে মেঘ এসে সূর্যকে ঢেকে ফেলছে। তার মানে এই নয় যে, সূর্য নেই। মেঘ ঢেকে ফেলার দরুণ মাঝে মাঝে সূর্যকে দেখা যাচ্ছে না, অন্ধকার লাগছে; তেমনি অন্তরে ভগবান যখন আছেন প্রত্যেকেরই মধ্যে, তখন ভগবানকে পাওয়ার যে বৃত্তিগুলি সেগুলিও বীজাকারে প্রত্যেকের ভেতরই আছে। সেই হিসেবে বিবেক প্রত্যেকের ভেতরই আছে। সেই বিবেককে ঢেকে ফেলছে মাঝে মাঝে সংস্কারের মেঘ। কাজেই মনে হচ্ছে, বিবেক-বোধ হারিয়ে গেছে। তখনই ধর্ম পথে নানা ধরণের গোলমাল এসে পড়ে।

কিন্তু বিবেক তো ঠিকই আছে, সংস্কারের মেঘটিকে যদি নাম, প্রার্থনা ইত্যাদির দ্বারা সরিয়ে দিতে পারি তাহলে আবার বিবেক জেগে উঠবে। তবে তার জন্য সজাগ দৃষ্টি একটি রাখতে হবে, যে দৃষ্টি প্রতি মুহূর্তকে লক্ষ্য করবে। সদ্গুরু আশ্রিত যারা তাদের এটি সহজে হওয়া উচিত। যদি তারা আন্তরিকভাবে চায় যে, ধর্ম-পথে ঠিক ঠিক মতো এগিয়ে যাবে, তাহলে মাঝে মাঝে একটু আধটু ভুল হলেও আখেরে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমাদের ঠাকুর যেমন বলেছেন,—"ঠিক ঠিক চাইলে ঠিক ঠিক পাবে; তিনিই এদিক ওদিক ক'রে ঠিক ক'রে নেবেন।"

ছড়ানো মুক্তো : ষষ্ঠ খণ্ড

প্রকাশকের নিবেদন

(প্রথম প্রকাশ)

পরমপূজনীয়া শ্রীশ্রীঅর্চনাপুরী মায়ের বেদবাণী সঞ্চয়নের আর একটি স্তবক ভক্ত শিষ্যমণ্ডলীর হাতে পুস্তিকাকারে তুলে দিতে আমরা আনন্দ অনুভব করছি। এই বাণীগুলির বেশির ভাগই দেবায়তন বার্ষিকী 'অপাবৃণু'তে প্রকাশিত হয়েছে সময়ে সময়ে। বহু প্রশ্নের সর্বজনগ্রাহ্য উত্তর শ্রীমা'র সঙ্গে কথোপকথনের মধ্যেই ধরে রাখা হয়েছে মাঝে মাঝে। সেগুলির বেশ কিছু 'ছড়ানো মুক্তো'র এই ষষ্ঠ খণ্ডটিতে স্থান পেয়েছে। শ্রীমায়ের এই বাণীগুলি সকলের জন্য এবং সর্বকালের জন্য। এই দিব্য বাণীর মাধ্যমে ভক্তপাঠকদের অন্তরে সঞ্চারিত হোক শ্রীঠাকুর ও শ্রীমা'র কৃপা এই আমাদের প্রার্থনা।

পুস্তিকা প্রকাশে সহযোগীদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদসহ শ্রীঠাকুরের ও শ্রীমায়ের অশেষ আশীর্বাদ।

শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু।

৭ শ্রাবণ, ১৪০০
23rd July, 1993

ছড়ানো মুক্তো

(ষষ্ঠ খণ্ড)

১।। কোনও মানুষ বলছে না এসে যে, আমি শান্তিতে আছি, ভালো আছি। প্রায় সবারই কিছু না কিছু অশান্তি লেগে আছে। চেষ্টা ক'রে সমস্ত দুঃখ কষ্টের মধ্যে শান্তি টেনে আনতে হবে। শান্তিটা হ'ল বড় জিনিষ।

একমাত্র ভগবৎ চাহিদাই বাস্তবিক শান্তি দিতে পারে। অন্য জাগতিক চাহিদাগুলি শুধুমাত্র অশান্তিকেই ডেকে আনে। 'ঠাকুর, আর কিছুই চাই না, একমাত্র তোমাকেই চাই'—একথা জোর ক'রে বলতে হবে আমাদের। সারাদিনের কাজের ভেতরে ভগবানকে খুব কম সময় দিতে পারি আমরা। ভগবানের কাছে চাই অনেক, কিন্তু সত্যিকারের দিই কতটুকু? আমাদের সাজানো ফ্ল্যাটে ভগবানের জন্য বড় জোর নির্দিষ্ট থাকে একটা শেল্ফ বা কুলুঙ্গি। ভগবান কিন্তু আমাদের সমস্ত বিশ্বজগৎটা ভোগ করতে দিয়েছেন। সুতরাং, বিশ্বজগতের নিয়ন্তা সেই পরম সন্ন্যাসী, যিনি সকলের অলক্ষ্যে বিরাজ করছেন, তাঁর জন্য যারা সব ছাড়তে পারে তারাই পরিপূর্ণ শান্তি পায়। মূল কথা, জগতে থেকেও মনটাকে যদি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ক'রে ভগবানের চরণে সঁপে দিতে পারো তাহলে শান্তি আসবেই।

২।। তুমি প্রার্থনা করলে, ভগবান তোমার প্রার্থনা শুনলেন না। তুমি তাঁকে আর ডাকলে না। কিন্তু তাতে তাঁর কিছু আসবে যাবে না। তবে, যারা ভক্ত, তারা সেটি পারে না। ছেলে মায়ের কাছে মার খাচ্ছে, তবু মাকে ছেড়ে কি যেতে পারছে? একটা বিরাট বিশ্ব যিনি পরিচালনা করছেন, তাঁকে তো সব দিকটিই দেখতে হবে। দেখা যাবে, তোমার যেটাতে ক্ষতি হচ্ছে, সেটা হয়তো বিরাট বিশ্বের ক্ষেত্রে কল্যাণকর হচ্ছে।

ভগবানের সৃষ্ট এই বিশাল জগতে প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের ভাগ্য অজ্ঞাতসারে জড়ানো। যার জন্য, আমার ক্ষতি বা আমার ভালো যাই ঠাকুর করুন না কেন, তার মানে খুঁজতে গেলে মুস্কিলে পড়ে যাব। মনে ক'রে নিতে হবে বৃহত্তর উদ্দেশ্যে এগুলির নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। আমাদের অধিকার প্রার্থনা করার, তাঁকে হুকুম করার নয়। প্রার্থনা করতে হবে, 'ঠাকুর! এমন দুঃখ দিও না যার ফলে আমি তোমাকেই ভুলে যাই।' আমরা প্রার্থনা ক'রে যাব, কতটা তিনি শুনবেন সেটি তাঁর ইচ্ছে। এক্ষেত্রে তাঁর ইচ্ছেটুকু কিন্তু আমাদের মেনে নিতেই হবে।

৩।। ভগবৎ পথ বড়ই সূক্ষ্ম। তাই এপথে খুব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে বিচার ক'রে চলতে হয়। কথাবার্ত্তা, আচার আচরণ, সব কিছুই হবে সূক্ষ্মবিচারের দ্বারা মার্জিত।

৪।। ফুল কি কখনও বিষ দিতে পারে? সে শুধু মধুই দেয়। যার ভেতর পরিপূর্ণতা আছে, সে সবকিছুর মধ্যেই পরিপূর্ণতা দেখে। যার মধ্যে আনন্দ নেই তার মধ্যে কখনও পরিপূর্ণতা আসে না। এই আনন্দ আসে ভগবৎ শরণাগতি থেকে, ভগবৎ প্রেম থেকে।

৫।। মানুষ ভালটা ভগবানকে দিতে চায় না। মানুষ বুড়ো বয়সে ধর্ম করে। তার মানে কি জান, জীবনের যে সবচেয়ে ভাল সময় সেটুকু ব্যবহার করে সংসারের জন্য। অথচ সে সংসার মানুষকে কিছুই দেয় না, রস নিঙড়ে ছিবড়ে ক'রে ফেলে দেয়। আর ভগবানের জন্য মানুষ রাখে অন্তঃসারশূন্য অস্থিপঞ্জরসার দেহটা, ক্লান্ত শ্রান্ত মনটা, ক্ষমতাহীন আত্মিক চেতনা। তবে এও মন্দের ভাল, কিছুই না দেওয়ার চেয়ে ভাল।

৬।। নিষ্ঠাযুক্ত সেবা এবং কর্তব্যবোধে সেবা—এদুটির মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। সাধারণভাবে অবশ্য প্রশ্ন আসে, নিষ্ঠা থাকলে ঠিক ঠিক কর্তব্যবোধ আসবে কি? কিছুটা হয়তো ঠিক যে, একেবারে নিষ্ঠাহীন হলে

কর্তব্যের মধ্যে ত্রুটি এসে যাবে। কিন্তু নিষ্ঠা ও কর্তব্য— দুটিকে যদি আলাদা ক'রে দেখি তাহলে বেশ বোঝা যাবে শুধু কর্তব্য কথাটির মধ্যে একটা শুষ্ক দায়িত্ববোধের ইঙ্গিত আছে আর নিষ্ঠা কথাটির মধ্যে আছে ভক্তি এবং প্রেমের ইঙ্গিত।

অনেক সময় দেখা যায়, ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমরা অনেক কাজই করি কর্তব্যের খাতিরে। কিন্তু ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিষ্ঠাকে আমরা আমাদের কাজের সঙ্গে যুক্ত করতে পারি না। প্রাণের আকুতি, ভক্তি, ভালবাসা, এগুলি না থাকলে কখনই নিষ্ঠা আসবে না। তাই ভগবৎ সেবার ক্ষেত্রে আমাদের কর্তব্যের পরিবর্তে নিষ্ঠাকেই জাগিয়ে তুলতে হবে গভীর হতে গভীরতর ভাবে।

৭।। এ জগতে মান, যশ, ঐশ্বর্য, রূপ, পাণ্ডিত্য কোনও কিছুর দ্বারাই মানুষ শাশ্বত প্রতিষ্ঠা পায় না। একমাত্র অধ্যাত্ম জগতে প্রতিষ্ঠিত হলেই মানুষ শাশ্বত প্রতিষ্ঠালাভের অধিকারী হতে পারে।

৮।। লক্ষ্মীর কৃপা তখনই আসে যখন বাইরের সম্পদের সঙ্গে অন্তরের সম্পদ যুক্ত হয়। তা না হলে বাইরের সম্পদ লোভ এবং অশান্তি জাগিয়ে দেয়, আর বাইরের সম্পদের যোগ্য ব্যবহারও হয় না। এসে পড়ে ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা। কিন্তু অন্তরের সম্পদ যেমন, উদারতা, সহানুভূতিশীলতা, পরোপকারের ইচ্ছা এবং সর্বোপরি ঈশ্বরে ভক্তি ইত্যাদি থাকলে জাগতিক ঐশ্বর্যের যোগ্য ব্যবহার হয়।

মহাভারতে এর দৃষ্টান্ত আমরা পাই যুধিষ্ঠির ও দুর্যোধনের চরিত্রের মধ্য দিয়ে। দুর্যোধন সম্পদ পেলেন। কিন্তু আন্তরসম্পদের অভাবে স্বার্থপরতার একটি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত হয়ে রইলেন পাণ্ডবদের বঞ্চিত ক'রে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পাণ্ডবদের বিজয়লাভের পর যুধিষ্ঠির যখন সম্পদ পেলেন তখন সেই সম্পদের দ্বারা পতিহারা

কৌরবপত্নীদের এবং কৌরববংশের সকলকে সমর্যাদায় পালন করলেন। এবং শুধু তাই নয়, কৃষ্ণের অন্তর্ধানের সংবাদ পাওয়া মাত্র বিশাল ঐশ্বর্য সব ছেড়ে মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করলেন।

আমাদের ঠাকুর সত্যানন্দদেব তাই বলতেন—"দেখ, অর্থের প্রয়োজন আছে প্রত্যেক মানুষের গার্হস্থ্য জীবনে এবং সন্ন্যাসীদের আশ্রম জীবনে। তাই মা লক্ষ্মীর কৃপা নিশ্চয়ই চাইবে। কিন্তু বলবে—মা, শুধু বাইরের সম্পদ দিয়ে আমাদের বিভ্রান্ত কোরো না। অন্তরের সম্পদে পরিপূর্ণ কর আমাদের হৃদয়, যাতে বাইরের ঐশ্বর্যের যোগ্য ব্যবহার করতে পারি।"

৯।। যখন কারও মনে প্রশ্ন ওঠে—ইচ্ছে করছে ভগবানকে ডাকতে কিন্তু পারছি না—তখন বুঝতে হবে বিবেকবোধটি জেগে উঠেছে। ঠাকুরই জাগিয়ে দিয়েছেন। বিবেকটি বলে দিচ্ছে—Take care of yourself. নিজের সম্বন্ধে সচেতন হও। অতএব, দুটো মন এসে যাচ্ছে। একটি মন দিয়ে বুঝতে পারছ কাজটি করা উচিত, কিন্তু আর একটি মন এসে তাতে বাধা দিচ্ছে; তুমি কাজটা করতে পারছ না। এক্ষেত্রে দুটি মনের মধ্যে যে মনটি ভাল কাজ করবার প্রেরণা দিচ্ছে সেই মনটির কথাই শুনতে হবে। এই ভাল মনটিকে জাগিয়ে রাখার সুবিধা হয় যদি দৈনন্দিন জীবনে একটা ধর্মীয় routine ক'রে ফেলতে পারি। যেমন, আমাদের ঠাকুর সত্যানন্দদেব বলতেন, ২৪ ঘন্টার মধ্যে অন্ততঃ ৬ ঘন্টা direct ভগবানের কাজে নিজেকে নিযুক্ত রাখার চেষ্টা করবে। একটা সময় বেঁধে নেবে। সে সময়ে যা করবে সবই ঠাকুরের জন্য। আধ্যাত্মিক কর্মসূচী বেছে নিতে হবে ভাললাগা অনুযায়ী। জপধ্যান, স্বাধ্যায়, নাম-গান, মন্দির পরিষ্কার, চন্দনবাটা, ফুলতোলা ইত্যাদি। যাদের ভগবৎ চাহিদা নেই, বিবেকবোধ জাগ্রত হয় নি, যারা উচিত অনুচিত বুঝতে পারে না, প্রতিদিনের কর্মস্রোতে

ভেসে যায়, তাদের কিছু বলার নেই। কিন্তু যাদের মনে চাহিদা জেগেছে তাদের জোর ক'রে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতে হবে। মনের ওপর যদি ছেড়ে দিই, যে মন অতি দুর্বল মন, তবে কোনওদিনই আর ঈশ্বরলাভ হবে না। Callousness মোটেই শরণাগতির লক্ষণ নয়। পূর্ণ শরণাগিতি বা ঠাকুরকে বকলমা দিয়ে দিয়েছি, ঠাকুর যা করছেন তাই ভাল, এটা খুব উচ্চস্তরে না উঠলে হয় না। গিরীশ ঘোষ পেরেছিলেন, ওঁর ছিল জ্বলন্ত বিশ্বাস। সাধারণ মানুষের এতটা হয় না। সুতরাং, যে মনটার ভাল কাজ করার ইচ্ছে হচ্ছে তাকে চেপে ধরতে হবে। সেটিই হল দেবশক্তি।

১০।। মেয়েদের বিয়ে হয়। বলে, শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছি। কিন্তু এখন দিন দিন এমন হয়ে যাচ্ছে, শ্বশুরবাড়ি ব'লে আর কিছু থাকছে না। শ্বশুরবাড়ি না বলে বলা উচিত স্বামীর বাড়ি। কারণ, বিয়ের পরেই দেখা যাচ্ছে মেয়েদের শ্বশুর, শ্বাশুড়ি, দেওর, ননদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক থাকছে না। ফলে ঘরে ঘরে একটা বিচ্ছিন্নতাবাদ দেখা দিচ্ছে। বেশিরভাগ পরিবারগুলিতে ভাঙন ধরছে। পূর্বে এই শ্বশুরবাড়ি ছিল যৌথ পরিবারের একটা পরিপূর্ণ ছবি। কিন্তু এখন বিবাহের পরেই শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে মেয়েরা স্বামী-পুত্র নিয়ে অথবা ছেলেরা স্ত্রী-পুত্র নিয়ে আলাদা থাকতে চাইছে বা থাকছে। ফলে প্রতিটি পরিবারে কি মেয়েদের কি ছেলেদের মনে এসে পড়ছে অশ্রদ্ধা, কর্তব্যচ্যুতি, বা কর্তব্যহীনতা এবং সংকীর্ণতা। নিরাপত্তার দিক থেকেও তারা হয়ে পড়ছে দুর্বল। পরিণাম অশান্তি।

সুতরাং বাবা মায়েরা প্রথম থেকেই মেয়েদের যদি শ্বশুরবাড়িকে ঠিক শ্বশুরবাড়ির মর্যাদা দিতে শেখায় তাহলে হয়তো এ অবস্থা হয় না। বাবা মাদের এই শিক্ষাই দেওয়া উচিত যে, শ্বশুরবাড়িটি স্বামীর বাড়ি ঠিকই, কিন্তু যাদের জন্য তুমি স্বামীকে পেয়েছ সেই শ্বশুর শ্বাশুড়ি প্রিয় পরিজনদের বাদ দিলে তোমার জীবনে একটা অপূর্ণতা এসে যেতে পারে।

কারণ, তোমার ছেলেমেয়ে আবার ঠিক এই আদর্শটাই অনুসরণ করবে এবং তখন তুমি বুঝতে পারবে তোমার শ্বশুর-শ্বাশুড়ির মানসিক অবস্থা। মেয়েরা যদি বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ির সকলকে যোগ্য শ্রদ্ধা ও মর্যাদা দান ক'রে একটা আদর্শ জীবন যাপন করে, তবেই ভারতের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য পুনরায় ফিরে আসবে।

১১।। প্রশ্ন ঃ ভক্তের এত দুঃখ কষ্ট কেন?

উত্তর ঃ ভক্তের দুটি সত্তা আছে। ভক্ত-সত্তা এবং জীব-সত্তা। একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, ভক্তের ভক্তসত্তাটি কষ্ট পাচ্ছে না। তার যে সত্তাটি কষ্ট পাচ্ছে সেটি স্থূল সংসারের সাথে জড়িয়ে থাকা জীবসত্তা। ভক্ত অনুভব করছে বেশি এইজন্য যে, সে তার আদর্শ থেকে নেমে অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ ক'রে চলতে পারছে না। একজন মানুষের বিভিন্ন রকম পরিচয় আছে। বাড়িতে সে ছেলেমেয়ের বাবা, স্ত্রীর স্বামী, আবার অফিসে গেলে সাহেব। বিভিন্ন রকমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে মানুষ বিভিন্ন রকম কষ্ট পাচ্ছে। কারণ, সেখানে প্রতিটি ক্ষেত্রেই নানারকম স্বার্থ জড়িয়ে আছে। কিন্তু শুধু মাত্র ভগবানের জন্য কষ্ট পাচ্ছে—সেটা হল ভক্তের কষ্ট। যখন সে জাগতিক ক্ষেত্রে কষ্ট পাচ্ছে তখন সে সাধারণ মানুষ হিসেবে সাধারণ কষ্ট ভোগ করছে অর্থাৎ সঞ্চিত কর্মফল ভোগ করছে। তখন সে ভক্ত হিসাবে কষ্ট পাচ্ছে, এটা বলা যায় না।

আবার হয়তো একজন ভক্ত হয়েও কোনও একটা অপরাধ ক'রে বসল। তার ফল তাকে হয়তো অনেক পরে ভোগ করতে হল। তখন সে ভগবানের কাছে নালিশ জানাল 'এতদিন ধরে আমি তোমাকে এত ডাকলাম, তাতে এই ফল হল আমার!' এই যে কষ্টটি এটি তার ভক্ত সত্তার নয়, জীব সত্তার। ভক্ত হিসাবে তোমার ভগবানের প্রতি যে কর্তব্য আছে সেটি নিষ্ঠার সঙ্গে ক'রে দ্যাখো, ধ্যান ক'রে দ্যাখো, জপ ক'রে

দ্যাখো, প্রার্থনা ক'রে দ্যাখো শান্তি-আনন্দ পাও কিনা। তাতে যদি না পাও, তবে ভক্ত হিসেবে ভগবানের কাছে তোমার অভিযোগ জানাতে পার। ভক্তের যে জ্বালা, তাতে ঠিক দুঃখ থাকে না, সে দুঃখটি হয় মধুর। আর এটাও ঠিক যে, ভক্তের দুঃখ-কষ্ট জ্বালার শেষে তাঁর কৃপার স্পর্শ আসবেই।

১২।। প্রশ্ন ঃ রিপুগুলির মোড় ঘোরানো যায় কিভাবে, বিশেষ ক'রে মাৎসর্যের?

উত্তর ঃ দ্যাখো, ছয়টি রিপু আছে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য। সাধারণ জীবের মধ্যে এইগুলির প্রত্যেকটিই কম-বেশি বর্তমান। কোনওটি হয়তো কম, কোনওটি প্রবল। এদের জয় করতে গেলে প্রথমেই বুঝতে হবে কোন্ রিপু আমার মধ্যে বেশি প্রবল। ঈশ্বরের দিকে সেটির মোড় ফিরিয়ে দিতে হবে। যেমন, ক্রোধ। অন্যের ওপর ক্রোধ না ক'রে নিজের ওপরই ক্রোধ করতে হবে—কেন আমি সব রিপুর ঊর্ধ্বে এখনও উঠতে পারছি না! লোভ হবে ঈশ্বরকে পাবার জন্য।

আসক্তি থাকলে একমাত্র ঈশ্বরের প্রতি সে আসক্তি থাকবে। কামনা যদি থাকে তো ঈশ্বরকে কামনা কর, লোভের বস্তুগুলি ঈশ্বরকেই অর্পণ কর, নিবেদন কর। যদি অহংকার করতে হয় তো এই বলে কর যে, আমি তাঁর দাস কিংবা বালকের 'আমি' , দাস 'আমি', পাকা 'আমি'। এতে অহং-এর মত্ততা থাকে না। এইভাবে সচেতন হয়ে রিপুগুলিকে তাঁর দিকে ঘুরিয়ে দিলে এগুলি আর ক্ষতিকারক থাকে না, বরং ভগবৎ পথের সহায়ক হয়ে যায়।

তবে মাৎসর্যের মোড় ফেরানোটা খুবই কঠিন। সাধুদেরও সব যায় কিন্তু মাৎসর্য যেতে চায় না। মাৎসর্য হচ্ছে ঈর্ষাভাব। অপর একজন আমার থেকেও প্রতিষ্ঠিত সাধু হল, আমি হতে পারলাম না—এই চিন্তা অনেক সময় সাধুকে পতনের দিকে নিয়ে যায়। মাৎসর্যের মোড় ফেরাবার একটি

সহজ উপায়—মনে সন্তোষ আনা। অন্য কেউ আমার থেকে বেশি পাচ্ছে, আমি পাচ্ছি না—এই ক্ষোভ থেকে অসন্তোষ আসে। এই ক্ষোভ দূর করতে হলে ভাবতে হবে তাঁর কৃপার কথা—আমি যা পেয়েছি তা অন্যে পায়নি, ওরা অনেক বিষয়ে আমার চেয়ে অল্প ভাগ্যবান। যদি ভাবি যে, আমার পাত্রটি তাঁর কৃপায় ভরে আছে, সে যত ছোটই হোক না কেন, তাহলে অপরের পাত্রের দিকে আর দৃষ্টিটি যাবে না। মনে পাওয়ার পূর্ণতা থাকলে আর অপরের প্রতি হিংসাও আসবে না, ক্ষুদ্রতা সংকীর্ণতাও আসবে না। আর একটা কথা—মাৎসর্যের ঠিক বিপরীত হল উদারতা। সুতরাং, মনে উদারতা আনতে হবে। এ কিন্তু একদিনে সম্ভব নয়, নিত্য অভ্যাস করতে করতে হবে। আত্মসচেতন হয়ে অভ্যাস করতে থাকলে মনে প্রসারতা আসবে, শান্তি আসবে। তখন অপরে যত বড়ই হোক না কেন, তার বড় হওয়া দেখে আমার বুক আনন্দে ভরে যাবে।

১৩।। প্রশ্ন ঃ বর্তমান যুগে সাধারণ মানুষের কিভাবে ধ্যান করা উচিত?

উত্তর ঃ প্রথমেই মনে রাখতে হবে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি বাণী—কলিতে অন্নগত প্রাণ, ধ্যান-জপ নাই...অতএব ভক্তিপথই শ্রেয়। ঠাকুরের এই বাণীটির কয়েকটি practical বা বাস্তব দিক আছে। কারণ, আধ্যাত্মিক জগতে উন্নতির জন্য ধ্যান এবং জপের যে গভীরতা প্রয়োজন, বর্তমান যুগের মানুষের পক্ষে সেটি প্রায় অসম্ভব। বিশেষ ক'রে ধ্যানের ক্ষেত্রে এ কথাটা খুবই প্রযোজ্য। গীতাতে ধ্যান করার উপযুক্ত যে স্থান-কাল-পাত্রের কথা পাই তার কোনওটিই বর্তমান যুগে নাই বললেই চলে। তবু এযুগেও কিছু আধার নিশ্চয়ই আছে যারা ধ্যান করতে ভালবাসে এবং চায় যে, তাদের ধ্যানে ভগবদ্‌রূপ প্রকাশিত হোক।

এই যুগের মানুষের চাহিদা অনুযায়ী কতকগুলি ধ্যানের process বা পদ্ধতি আমাদের ঠাকুরের বলা আছে। যারা ধ্যান করতে চায় তাদের

প্রথম যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে—মানসিক স্থৈর্য্য। সামান্য ছোটখাটো ব্যাপারেও যারা মানসিক স্থৈর্য্য হারিয়ে ফেলে তারা কিন্তু ধ্যানের জগতে কিছু পাবে বলে মনে হয় না। তাই প্রথম প্রয়োজন মনকে যতদূর সম্ভব চারপাশের চাঞ্চল্যকর পরিবেশ থেকে সরিয়ে রাখা। বর্তমানে বাইরের জগৎ আমাদের ধ্যানের পরিবেশ কোনও মতেই দেবে না। নিজেকেই সে পরিবেশ তৈরি ক'রে নিতে হবে এবং কেমন ভাবে করবে সেটা নিজেকেই বুঝতে হবে।

এরপর আসে ধ্যানের বস্তুটিকে ধ্যানের জগতে ধীরে ধীরে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টার কথা। ঠাকুর সত্যানন্দদেব বলেছেন—দেখ, প্রথম প্রথম দেখবে চোখ বুজলেই অন্ধকার। তাই যারা ধ্যান করতে চাও তারা গুরুদত্ত নাম প্রথমে জপ ক'রে পূজার আসনে রাখা মূর্তির দিকে চেয়ে, সেই রূপটিকে মনের মধ্যে গেঁথে নেবার চেষ্টা করবে। মাঝে মাঝে চোখ বন্ধ ক'রে চিন্তা করবে—ঐ মূর্তি যেন তোমার সামনে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এইভাবে করতে করতে যখন দেখবে মূর্তিটিকে মনের মধ্যে কিছুটা আনতে পারছ, তখন ঐ মূর্তিটিকে ভাবতে চেষ্টা করবে যেন জ্যোতি দিয়ে গড়া। তার জন্য প্রয়োজন হলে অনেক সময় আলোর দিকে চোখ ফিরিয়ে ধ্যান করা ভাল। তাতে মূর্তিটি জ্যোতির্ময় ভাবার সুবিধা হবে। যোগপথেও এই রকম স্থূল আলোকে কেন্দ্র ক'রে জ্যোতি চিন্তার পদ্ধতি রয়েছে। যেমন, অন্ধকার ঘরে প্রদীপশিখার দিকে তাকিয়ে জ্যোতির চিন্তার চেষ্টা।

আমাদের ঠাকুরকেও আমরা দেখেছি স্থূল বস্তুকে মাধ্যম ক'রে ভক্তদের ধ্যান করার পদ্ধতি শেখাচ্ছেন। যেমন—মন্দিরে বা কোন একটি নির্জন ঘরে দরজা জানলা বন্ধ ক'রে একটি electric bulb stand-এ fit করলেন। Bulb fit করারও রীতি ছিল আধার অনুযায়ী। সাদা, লাল, সবুজ ইত্যাদি। Stand-টি এমনভাবে তৈরি করিয়েছিলেন যে, height

অনুযায়ী bulb-টিকে ওঠানো নামানো যেত, যাতে bulb টি যে ধ্যান করবে তার ঠিক কপালের level-এর সমান হয়। মনে হয়, যারা একটু তমোগুণ বিশিষ্ট তাদের দিতেন লাল। যারা রজোগুণ বিশিষ্ট তাদের দিতেন সাদা। আবার যারা একটু শান্ত প্রকৃতির তাদের দিতেন সবুজ। এগুলো ঠাকুরেরই শ্রীমুখ থেকে শোনা। সবটা ঠিক বলতে পারব না, কারণ, এগুলি ভক্তদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। ঠাকুর কোনও দিনই খুলে বলেন নি।

অনেক সময় সামনে একটি মূর্তি fit করাও থাকত। এগুলো হচ্ছে যারা প্রথম ধ্যানের চেষ্টা করছে বা কিছুটা ধ্যান করতে পারলেও জ্যোর্তিময় রূপটা আনতে পারছে না, তাদের জন্য। এভাবে ধ্যান করতে করতে ধ্যানে ইষ্টমূর্তিটি বসে গেলে ঠাকুর বলতেন চোখ বন্ধ করলেই দেখবে ইষ্টের রূপ ফুটে উঠছে। এরপরে ঠাকুরের একটি নির্দেশ ছিল ধ্যানের মধ্যে ইষ্টের চরণ স্পর্শ করার চেষ্টা। এবং তারও পরে বলতেন—ধ্যান করার সময় ভাববে তিনি যেন তোমার সামনে বসে আছেন, তুমি তাঁর সঙ্গে নানা ধরণের কথা বলছ, হাসছ ইত্যাদি। যাদের pin-point ধ্যানে মন বসে না, তাদের জন্য ঠাকুরের নির্দেশ ছিল অনুধ্যান করার। অর্থাৎ ইষ্ট যেন স্থূলদেহধারী মানুষের মতো সঙ্গে রয়েছেন, তাঁকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, তাঁর সামনে গান করছি ইত্যাদি। ঠাকুরকে সাজানো খাওয়ানো এগুলিও ঠাকুর ভক্তদের ধ্যানের বিষয় ক'রে নিতে বলতেন, যেগুলি মানসপূজার সময় একান্ত প্রয়োজন।

ঠাকুর ধ্যানে মনকে স্থির করার আরও একটি সহজ উপায় বলেছেন। গুরুদত্ত ইষ্টনামের প্রত্যেকটি অক্ষরকে চোখ বন্ধ ক'রে দেখার চেষ্টা করতে হবে। প্রথম প্রথম এটিকে জ্যোতির্ময় চিন্তা করবে। যেমন, নিয়ন আলোতে নানারকম অক্ষর তোমরা দেখ। ঠিক সেরকমভাবে চোখ বন্ধ ক'রে আলোর অক্ষরে ইষ্ট নামটিকে চিন্তা করতে পার। এটা মনে হয় অনেক সহজ হবে।

তবে ভক্তদের মধ্যে যারা ধ্যানরসিক বা ইষ্টকে নিয়ে আনন্দবিলাস করতে চায় তাদের হয়তো এটুকুতে মন ভরবে না। সেক্ষেত্রে একটু জোর করেই চেষ্টা ক'রে ইষ্টমূর্তিকে মনের মধ্যে আনার চেষ্টা করবে।

১৪।। প্রশ্ন ঃ সংঘজীবনে একসাথে থাকতে গেলে কী কী গুণ থাকা দরকার?

উত্তর ঃ সংঘজীবন কথাটা যখন উঠেছে তখন নিশ্চয়ই ত্যাগের পথ নিয়ে যারা থাকবে তাদের জন্যই এ প্রশ্নের উত্তরটা দেওয়া ভাল। ত্যাগপথ নিয়ে যারা সংঘে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক তাদের প্রথমে মনে রাখতে হবে যে, ত্যাগপথের বা সন্ন্যাস জীবনের মূল কথা হল সংসারে বৈরাগ্য এবং ঈশ্বরে অনুরাগ। এই দুটি মূল কথা যদি প্রত্যেকটি সংঘবাসী মনের মধ্যে গেঁথে নেয় তাহলে চলার পথটা অনেক স্বচ্ছ ও পরিষ্কার হয়ে যায়। প্রত্যেকটি মানুষ তার বৈশিষ্ট্য নিয়েই জগতে এসেছে। প্রত্যেকটি মানুষের রুচি এবং মত বিভিন্ন। বিরোধটাও বাধে সেইখানেই। কিন্তু একটা যদি মূল সূত্র থাকে জীবনে, তাহলে বিভিন্ন রুচি, বিভিন্ন মতবাদ প্রভৃতি স্বাতন্ত্র্য নিয়েও পরস্পরের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলা যায়। সে মূল সূত্রটি হল— ভগবৎ অনুরাগের প্রসাদ মিশ্রিত ভালবাসা। এই দিব্য ভালবাসা যদি প্রত্যেকের ভিতরে কিছুটা ক'রেও থাকে তাহলে ছোটখাট মতবিরোধের মধ্যে একটা সমাধান ঠিক খুঁজে পাওয়া যায়।

একটু চিন্তা করলেই আমরা দেখতে পাই যে, সংসারজীবনে যে ধরণের গোলমালগুলো একটা বিরাট আকার ধারণ করে, ঠিক সেই ধরণের ঘটনা কিন্তু আশ্রমিক জীবনে থাকে না। যেমন—ছেলেমেয়ে, বিষয়-সম্পত্তি ইত্যাদি। তাহলে গোলমালটা কোথায়? আমরা সন্ন্যাস নিয়েছি সম্পূর্ণ ভগবানের দিকে তাকিয়ে। আমাদের আত্মীয়স্বজন সবকিছুই তিনি। আমরা আশ্রমিক জীবনে যে সুবিধা স্বাচ্ছন্দ্য পাচ্ছি সেটা তিনি যতটুকু দিয়েছেন

ততটুকুই পাচ্ছি। বাকিটা যেটা পাচ্ছি না সেটা আমরা তপস্যা বলে মেনে নিয়ে প্রথম থেকেই বর্জন করেছি। কাজেই ত্যাগের জীবনে গৃহীজীবনের মতো অশান্তির প্রশ্নই ওঠে না।

অথচ দেখা যায়, বহুক্ষেত্রে সংঘজীবনে একটা অশান্তির সৃষ্টি হয় পরস্পরের মধ্যে। এটার মূল কারণ হচ্ছে যে, প্রথম যে আদর্শের দিকে তাকিয়ে ত্যাগপথ নিয়েছিলাম, সে আদর্শটিকে হয়তো আমরা সাময়িকভাবে ভুলে গেছি। তার ওপরে আর একটা ব্যাপারও আছে। খুব সূক্ষ্ম বিচারশক্তি নিয়ে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি, তবে দেখব সন্ন্যাস-জীবনে শুষ্ক বৈরাগ্যের সাধনা করতে গিয়ে আমাদের ভেতর একটা হৃদয়হীন কাঠিন্য অনেক সময় এসে পড়ে। তার ফলে আমরা অপরের প্রতি সহানুভূতিটা তখনকার মতো হারিয়ে ফেলি।

সেইজন্য সংঘজীবনে আসতে গেলে গুহাবাসী সাধুর যে শুষ্ক কাঠিন্যপূর্ণ বৈরাগ্য, সেটির পরিবর্তে আমাদের মনে ঐশ্বরিক প্রেমময় একটি কোমলতার ভাব আনা প্রয়োজন, যে দিব্য কোমলতা দিয়ে আমি আমার পাশের মানুষটির প্রতি সহানুভূতিশীল হতে পারব এবং সমগ্র সংঘের কল্যাণের জন্য সচেষ্ট হব। প্রত্যেকটি আশ্রমবাসীর মনে যদি এই দিব্য সহানুভূতিপূর্ণ ভাব থাকে, তার সঙ্গে থাকে উদার দৃষ্টি এবং সর্বোপরি পবিত্রতা—তাহলে আশ্রম-জীবনে একটা বিরাট অশান্তির সৃষ্টি হতে পারে না। ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে মতানৈক্য ঘটলেও সেগুলো সহজেই মিটিয়ে ফেলা যায়। কারণ, আশ্রমজীবনে যেমন ত্যাগ, তপস্যা, পূজা, ধ্যান, জপ ইত্যাদির একটি সাধনক্রম আছে, তার সঙ্গে এই সহানুভূতিযুক্ত উদারতার সাধনাও যদি অঙ্গীভূত করা যায় দৈনন্দিন জীবনে, তাহলে সংঘজীবন সার্থক হয় এবং এর ফলে প্রতিটি সংঘ বা আশ্রম একটি সুসংহত আদর্শ সংগঠন হয়ে উঠতে পারে।

তাই প্রতিটি আশ্রমবাসীর মনে রাখা উচিত যে, আমরা প্রত্যেকেই ভগবানের আশ্রমে আশ্রিত। ভগবান আমাদের যাকে যে কাজের ভার দিয়েছেন সে কাজ তাঁরই প্রসন্নতার জন্য ক'রে যেতে হবে। ভগবৎ-কাজে কোনও ছোট-বড় নেই। আর এটাও মনে রাখতে হবে যে, আমরা কেউ কারও কাজে যেন interfere বা হস্তক্ষেপ না করি। অবাঞ্ছিত প্রতিযোগিতার ভাব যেন মনে না আসে। আমাদের ঠাকুর সত্যানন্দদেব বলতেন, আশ্রম জীবনে একটা কথা তোমরা মনে রেখো, যে তরীতে তোমরা চেপেছ সেটি ভগবানের তরী—'একই নায়ে সকল ভাই-য়ে যেতে হবে ওই ওপারে।' তোমার কর্তব্য ক'রে যাও এবং তাঁর হাতে নৌকার হালটা ছেড়ে দাও। দেখবে, তিনি ঠিক তোমার আধার অনুযায়ী, প্রয়োজন অনুযায়ী তোমাকে চালিয়ে নিয়ে গিয়ে কূলে পৌঁছে দেবেন।

১৫।। প্রশ্ন ঃ অনেকেই প্রশ্ন করে, আমরা যদি সামাজিক দিক থেকে সৎভাবে নৈতিক পথ অবলম্বন ক'রে চলি তাহলে আর আলাদা ক'রে ভগবানকে ডাকার বা তাঁর অস্তিত্বে বিশ্বাস করার কি প্রয়োজন আছে?

উত্তর ঃ প্রথমে একটা কথা মনে রাখতে হবে,—সদ্ভাবে অনেকেই হয়তো চলে, ভগবানকে বিশ্বাস না ক'রে বা ধর্ম ব্যাপারে মাথা না ঘামিয়ে। যেমন, পাশ্চাত্যে মানুষ সামাজিক বোধকে জাগ্রত রেখে সদ্ভাবে হয়তো জীবনযাপন করে। এ ধরনের বেশির ভাগ মানুষ ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়েই অজ্ঞান। ভগবানকে না ডাকলে ভগবানের দিক থেকে কোনও আপত্তি আসবে বলে মনে হয় না। তবে একটাই প্রশ্ন—সেটা ভারতবর্ষে সম্ভব হবে কি? ধর্মকে বাদ দিয়ে, ঈশ্বরের অস্তিত্বকে ভুলে গিয়ে সদ্ভাবে সুস্থ সমাজজীবন গড়ে তুলতে আমরা পারব কি? সুস্থ সমাজজীবন গড়ে তুলতে গেলে প্রত্যেকটি মানুষকে সৎ হতে হবে। সেটা যে সম্ভব হচ্ছে না, তা বর্তমান ভারতবর্ষের বিশেষ ক'রে পশ্চিমবাংলার সমাজের দিকে তাকিয়েই

বেশ বোঝা যায়। বিশেষ ক'রে পশ্চিমবাংলার একটা বিরাট গোষ্ঠী ভগবানের অস্তিত্বকে বাদ দিয়ে, প্রাচীন হিন্দু ধর্মের জীবনচর্যাকে অস্বীকার ক'রে নতুন একটা সমাজজীবন গড়ে তুলতে চাইছে। কিন্তু চরম দুর্নীতি ও বিশৃংখলা ছাড়া তার কোনও একটা দানা-বাঁধা রূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি না। যাঁরা ঈশ্বর মানছেন না বা প্রাচীন ধর্ম বিশ্বাসকে দূরে সরিয়ে রেখে বা ভুলে গিয়ে জীবনযাপন করতে চাইছেন তাঁরা বুকে হাত দিয়ে কি বলতে পারেন যে, তাঁরা মনে-প্রাণে সদ্ভাবে নৈতিকতা নিয়ে সমাজের সেবা করতে পারছেন? 'সবার উপরে মানুষ সত্য'—এই মন্ত্রটাকে তাঁরা বড় ক'রে দেখছেন নিজেদের স্বার্থকে গৌণ করে?

এখন প্রশ্ন আসতে পারে—যারা ভগবানকে বিশ্বাস করে বা কিছুটা ধর্মপ্রাণ মানুষ, তাদের ভেতরেও কি অন্যায় অসত্য নেই? তার উত্তর এই যে, মুখে ঈশ্বর বিশ্বাসের বুলি নিয়ে যারা অন্যায় আচরণ করে, তাদের কিন্তু ধর্মাত্মা বলা যায় না। কারণ, ধর্ম তাদের আত্মায় গ্রথিত হয় নি। ধর্মের মুখোশ পরে স্বার্থসিদ্ধির জন্য বা অভ্যাসবশতঃ তারা ধর্মাচরণ করে। কিন্তু এখানেও আমার বলার আছে যে, ধর্মকে যাঁরা অভ্যাসের বশে বা কিছুটা স্বার্থসিদ্ধির জন্য আঁকড়ে রয়েছেন তাঁরা কিন্তু একেবারে যারা ধর্মহীনভাবে উচ্ছৃংখল জীবনযাপন করছে তাদের তুলনায় অনেক ভাল।

হিন্দুধর্মের একটি বৈশিষ্ট্যই হল যে, এই ধর্ম মানুষের মধ্যে সৎ-অসৎ, ন্যায়-অন্যায় বোধটি জাগিয়ে দেয়, ঠিক পথটি ধরিয়ে দেয়। ধর্মকে যদি আমরা কিছুটাও ধরে থাকি, তাহলে যতটুকু ধরে থাকব ততটুকু আমরা অন্যায় থেকে সরে আসবার নির্দেশ অন্তর থেকে অনুভব করব। যেমন, বাড়িতে মাথার ওপর কোনও অভিভাবক না থাকলে ছেলের উচ্ছৃংখল হওয়াটা যত সহজ হয়, একজন সৎ মহৎ অভিভাবক মাথার ওপর থাকলে

উচ্ছৃংখল হওয়াটা অত সহজ হয় না। ধর্ম বা ঈশ্বর হচ্ছে একটি সর্বোত্তম তত্ত্ব। আমাদের ঠাকুর সত্যানন্দদেব বলেছেন—'সব সময় মনে রাখবে, একটি সর্বোত্তম তত্ত্ব তোমাদিগকে লক্ষ্য করছেন।' এখানে ঈশ্বর বা ধর্মের একটা সর্বজনীন বা সর্বজনগ্রাহ্য রূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি।

এই সর্বোত্তম তত্ত্বটিকে ধর্মবিশ্বাসী মানুষ নানাভাবে রূপ দেয়, পূজা করে। ঈশ্বরকে কেন্দ্র ক'রে যে পবিত্র অনুষ্ঠানগুলি তারা পালন করে, সেগুলির মাধ্যমে তাদের মন অন্তত কিছুক্ষণের জন্যও একটা অতিজাগতিক দিব্য শান্তিতে ভরে থাকে। সেটা যারা ঈশ্বর অবিশ্বাসী তারা কোনওদিনই অনুভব করতে পারবে না। কারণ, এ বিষয়ে তাদের কোনও জ্ঞানই নেই। ঈশ্বরলাভের পরম আনন্দ ও শাশ্বত শান্তির অবস্থা সম্বন্ধে তারা অজ্ঞ। কাজেই এ চাহিদাও তাদের জাগে না।

পাশ্চাত্ত্যের যে সমস্ত দেশ শুধু ভোগমুখী সমাজবাদ নিয়ে সমাজকে গড়ে তুলেছে, তারা নতুন ক'রে আজ পুরাতন ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে চিন্তা করতে শুরু করেছে। ভোগ ক'রে তারা শান্তি পেয়েছে কি? অনেকেই স্বীকার করেছে যে—না, তারা পায় নি। শুধু তাই নয়, তারা পুরাতন ভারতের ধর্মের কাছে শান্তির উপাদান সংগ্রহ করতে ব্যাকুল আগ্রহে এগিয়ে আসছে।

আজ আমাদের দেশ রাজনীতির চশমা এঁটে যতই অন্ধ থাকুক, অদূর ভবিষ্যতে ঐ পাশ্চাত্ত্যের কাছেই আবার হাত পেতে ভারতবর্ষের সেই পুরাতন আধ্যাত্মিক সম্পদকে ভিক্ষা ক'রে আনবে। তখন আজকের এই বুদ্ধিজীবীর দলই স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, ভারতবর্ষের জীবনচর্যার যে আদর্শ, সে আদর্শ ধর্ম ও ঈশ্বর-বিশ্বাসকে বাদ দিয়ে দাঁড়াতে পারে না। তাদের বুঝতে হবে, এদেশে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, সংসার থেকে সন্ন্যাস-জীবনের সবকিছুর মধ্যেই ওতঃপ্রোত হয়ে রয়েছে ধর্ম তথা ঈশ্বর-বিশ্বাস।

তবে এই ধর্মের মধ্যে কোনও একঘেয়েমি নেই, গোঁড়ামি নেই, আছে বিভিন্ন রুচির নরনারীর জন্য বৈচিত্র্যময় দিব্য আনন্দের পথ।

সর্বোপরি, একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, বর্তমান যুগের পরিস্থিতির উদ্‌ভ্রান্তির মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করলেও আমাদের ঘুমন্ত চেতনা সে অস্তিত্বকে ভুলতে দেবে না। কারণ, এ দেশের জীবনচেতনার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর-অস্তিত্বের চেতনা জেগে উঠেছিল যা আজও নির্মল গঙ্গাধারার মত প্রবহমান। তাই এযুগের ঠাকুর ভগবান রামকৃষ্ণের মুখে উচ্চারিত হল অনাদি যুগের মর্মবাণী—'জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ।' ঈশ্বরই সৎ, নিত্য; আর সব অসৎ, অনিত্য। তাই ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে সদ্ভাবে চলার চিন্তাটা ঠিক যুক্তিযুক্ত মনে হয় না।

১৬।। প্রশ্ন ঃ শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন—'প্রেম বা মহাভাব জীবকোটির হয় না।'—কেন হয় না? তবে জীবকোটিদের উপায় কী?

উত্তর ঃ জাগতিক ভালবাসা, স্বার্থজড়িত ভালবাসাকে প্রেম বলা যায় না। সে প্রেম দ্বারা ভগবৎলাভ হয় না। প্রকৃত প্রেম এমনই একটা জিনিস যে, জগৎ ভুল হয়ে যাবে, দেহ ভুল হয়ে যাবে। এই প্রেম হয়েছিল চৈতন্যদেবের, হয়েছিল রাধারানীর। প্রেম ঈশ্বরকোটি ছাড়া হয় না। তবে কি জীবকোটির ঈশ্বর লাভ হবে না? জীবকোটির ঈশ্বরলাভ আর ঈশ্বরকোটির ঈশ্বরলাভের মধ্যে তফাৎ আছে। ঈশ্বরকোটিরা ঈশ্বরের আর একটি রূপ। তাঁরা প্রেমের চরম আদর্শ স্থাপন করতে আসেন। সাধারণ জীবকোটি সেই আদর্শের দিকে লক্ষ্য রেখে যে যতটুকু পারে ভগবৎপ্রীতি লাভের চেষ্টা করে। ঈশ্বরলাভ মানে ঈশ্বরময় হয়ে যাওয়া।

ঠাকুর সত্যানন্দ বলেছেন—'প্রেম ভক্তি যার যতটুকু আছে সবটুকু তাঁকে দিতে হবে।' আমি তাঁকে যতটুকু ভালবাসতে পারব ততটুকুই তিনিময় হয়ে যাব। আমার আধার যতটুকুতে পূর্ণ হবে ততটুকু ঈশ্বরলাভ বলে

মেনে নেব। কারণ, আধার পূর্ণ হওয়াটাই মূল কথা। ঘটি পরিমাণ জলে ঘটি পূর্ণ হয়। জালা পরিমাণ জলে জালা পূর্ণ হয়। যাঁরা ঈশ্বরকোটি তাঁরা ঈশ্বরের এপিঠ ওপিঠ। সেই চরম প্রেম সাধারণ মানুষ ধারণাই করতে পারবে না। ছোট ছোট আধার সেই বিরাট ঈশ্বরপ্রেম ধারণ করতে পারবে না। কারণ, তাতে তার দেহ থাকবে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথায় বলা যায়, 'কুঁড়ে ঘরে হাতী ঢুকলে কুঁড়ে ঘর চুরমার হয়ে যাবে।'

১৭।। প্রশ্ন ঃ ঈশ্বরচিন্তা সর্বদা ধরে রাখার উপায় কী?

উত্তর ঃ এই প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেওয়া খুব কঠিন। কারণ, চারপাশের পরিবেশের একটা প্রশ্ন আসে। দেখা যায়, যারা তাঁর জন্য সব ছেড়ে আছে, চারপাশের পরিবেশের অশান্তি তাদেরও আধ্যাত্মিক সাধনার পথে বিঘ্ন ঘটায়। এটা হচ্ছে একরকমের যোগবিঘ্ন বা তপোবিঘ্ন। যেমন, প্রাচীনকালে মুনিঋষিরা যখন হোম বা যজ্ঞ করতেন, তখন রাক্ষসদল তাদের হোমে বিঘ্ন ঘটাত, যজ্ঞ পণ্ড করত! আর সাধারণ মানুষের তো আরও মুশকিল। কারণ, তাদের মন যদি সর্বদা ঈশ্বর-চিন্তায় মগ্ন থাকে অর্থাৎ সবসময় সে যদি ঈশ্বরময় হয়ে থাকে তবে তার পক্ষে জাগতিক কাজকর্ম করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। অনেক পীড়াপীড়ির পর রামকৃষ্ণদেব তাঁর সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী নিরঞ্জনানন্দকে অজপা জপ দেন। কিন্তু তিনি সেটি সহ্য করতে পারলেন না। দুদিন বাদেই ঠাকুরের কাছে এসে জানালেন—'ঠাকুর, আপনি এটি ফিরিয়ে নিন। আমি সহ্য করতে পারছি না!' সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঋষি বিবেকানন্দকে ঠাকুর একবার স্পর্শ করা মাত্রই তিনি চীৎকার ক'রে বলে উঠলেন—'তুমি আমার একী করলে গো, আমার মা আছে বাবা আছে।' মহাপুরুষদের যদি এই অবস্থা, তাহলে সাধারণ মানুষের তো আরও মুশকিল! তাই এযুগে ভক্তদের জন্য ভগবান সত্যানন্দদেব বেদছন্দামুখে একটা সুন্দর কথা বলেছেন—'মাঝে মাঝে

জগৎ থেকে মনটা সুইচ্ অফ্ ক'রে দেখবে মনটা ঈষ্টমুখী আছে কিনা।'

এই যে সবসময় ঈশ্বরের চিন্তায় মগ্ন থাকা এটা একদিনে হবে না। এর জন্য চাই তীব্র ব্যাকুলতা, তাঁর চরণে আকুল প্রার্থনা। শুধু তাই নয়, মনটাকেও সর্বদা সজাগ রাখতে হবে। অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার ন্যায় আমাদের সকলের অবচেতনে ঈশ্বরচিন্তা সুপ্ত হয়ে আছে। তার প্রমাণ— মাঝে মাঝেই আমাদের বিবেকটা জেগে ওঠে, ঈশ্বরমুখী মনটা আছে কিনা সে-বিষয়ে মন সচেতন হয়ে ওঠে। এটাকে স্থায়ী করার একটা উপায় হচ্ছে খুব নাম জপ ক'রে যাওয়া।

১৮।। প্রশ্ন ঃ গুরু ও শিষ্যের সম্পর্ক কিরকম হওয়া উচিত?

উত্তর ঃ গুরু ও শিষ্যের মধ্যে সম্পর্কটা কেমন হবে সেটা নির্ভর করে গুরু এবং শিষ্যের উভয়েরই ভাব ও আধার-এর ওপর। সাধারণতঃ গুরুশিষ্যের সম্পর্ক হওয়া উচিত স্রষ্টা ও সৃষ্টির মতো। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে সেটা সম্ভব হয় না যোগ্য গুরু ও যোগ্য শিষ্যের অভাবে।

বেশিরভাগ দেখা যায়, দীক্ষাগ্রহণটা হিন্দুধর্মের সংস্কারের একটা অঙ্গ হিসাবে সম্পন্ন হয়। আর দেখা যায়, চাওয়া পাওয়া সম্পর্কটাই শিষ্যের মধ্যে মূল বা প্রধান হয়ে যায়। জাগতিক চাহিদার শত শত ফর্দ গুরুর চরণে এসে উপস্থিত হয়। শিষ্যের আধ্যাত্মিক চাহিদার চেয়ে জাগতিক চাহিদাই বেশি থাকে। ফলে দীক্ষার মধ্য দিয়ে গুরু যে একটি আধ্যাত্মিক বীজ বপন করবেন শিষ্যের হৃদয়ে, সেটি সবসময় হয় না।

যেমন যজমানের সঙ্গে পুরোহিতের সম্পর্ক, তেমনি অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কুলগুরুর সঙ্গে শিষ্যের সম্পর্ক। কিন্তু গুরু এবং শিষ্যের সম্পর্ক ঠিক এধরনের হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। দীক্ষা ব্যাপারটাই হল আধ্যাত্মিক জগতের ব্যাপার। অর্থাৎ দীক্ষার মাধ্যমে শিষ্যের অধ্যাত্মচেতনা জেগে উঠবে। মন্ত্রের মাধ্যমে গুরু তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি শিষ্যের অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট

ক'রে দেন। এই ব্যাপারটি গুরু এবং শিষ্য উভয়েরই গভীরভাবে জানা উচিত। যেমন, পিতামাতা সন্তানের জন্ম দেন, সন্তান সেই সম্পর্কটাকে অস্বীকার করতে পারে না, তেমনি গুরু মন্ত্রের মাধ্যমে শিষ্যের আধ্যাত্মিক জীবনের জন্ম দেন। শিষ্যের উচিত এ বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত থাকা। গুরুর দিক থেকে শিষ্যের আধ্যাত্মিক জীবনগঠনের প্রতি একটা সচেতন দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। শিষ্যের দিক থেকেও গুরুর প্রতি আনুগত্য থাকা দরকার। গুরু যাতে তার জীবনটাকে একটা পূর্ণতার দিকে নিয়ে যেতে পারেন সেই সুযোগটা শিষ্যেরও দেওয়া কর্তব্য।

শিষ্য যদি বহির্মুখী হয়, আধ্যাত্মিক সচেতনতা তার ভেতর না থাকে, তাহলে গুরুর পক্ষে শিষ্যের আধ্যাত্মিক জীবন গঠন করা বিশেষ অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে। কিন্তু যে গুরুরা শুষ্ক কর্তব্য হিসাবে শিষ্যদের কেবলমাত্র দীক্ষামন্ত্রটুকু দিয়েই নিশ্চিন্ত হন, তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁদের লক্ষ লক্ষ শিষ্যের মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনা একটা বিশেষ রূপ নিতে পারে না। তবে এর ব্যতিক্রমও আছে। এ ধরণের গুরুর কোনও কোনও শিষ্য হয়তো তার নিজস্ব একনিষ্ঠ গুরুভক্তি ও বিশ্বাসের জোরে ইষ্টলাভ করে এবং আধ্যাত্মিক জগতেও প্রতিষ্ঠালাভ করে।

সৎগুরু হচ্ছেন শিষ্যের friend, philosopher, guide। কি স্থূলে, কি সূক্ষ্মে যে অবস্থায়ই গুরু থাকুন না কেন, সৎগুরু তাঁর শিষ্যের প্রতি ঠিক লক্ষ্য রাখেন। শিষ্যকেও নিজেকে উন্মোচিত ক'রে দিতে হবে গুরুর সেই কৃপাপূর্ণ দিশারী দৃষ্টির সামনে। তবেই সে আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি লাভ করতে পারবে।

হিন্দীতে একটি মহাজনবাক্য আছে—'গুরু মিলে লাখ লাখ, চেলা মিলে না এক।' অথচ আমরা দেখি একজন সৎগুরুর শতসহস্র শিষ্য। তাহলে মহাজনের মুখ থেকে কেন এই বাক্যটি নিঃসৃত হল? তার উত্তর

একটাই—একজন সৎগুরুর লক্ষ লক্ষ শিষ্য থাকা সত্ত্বেও ঠিক ঠিক শিষ্য এক আধটিই হয়। গুরু এবং শিষ্যের সম্পর্ক এই এক আধটি আধারের মধ্যেই সীমিত থাকে, কারণ, আধ্যাত্মিক জগতটা বড় কঠিন জগৎ। সৎগুরুর চরণে ক'টি শিষ্য নিজেকে উৎসর্গীকৃত করতে পারে? এরূপ শিষ্যের সংখ্যা কোটিতে গোটি।

আমরা বৈদিক যুগে দেখতে পেয়েছি গুরু এবং শিষ্যের মধ্যে একটি গভীর সম্পর্কের দৃষ্টান্ত। কিন্তু সাধারণভাবে ইদানীংকালে এই ব্যাপারটির অভাব পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে যত দিন যাচ্ছে গুরু এবং শিষ্য সম্প্রদায়গত হিসেবে লক্ষ লক্ষ কি তারও বেশি হয়েছে। অথচ গুরুভক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এ যুগে বিরল। তাই প্রত্যেক শিষ্যের ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করা উচিত গুরুকে আপন হতেও আপনতররূপে নিজের জীবনে গ্রহণ করা। এবং এ সম্পর্কটি হওয়া উচিত জাগতিক বাসনার ঊর্ধ্বের একটি সম্পর্ক। যদিও এটি খুবই কঠিন, কারণ, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মানুষের জীবনের সঙ্গে আদর্শের একটা বিরাট দূরত্ব আছে। কিন্তু মানুষ সেখানেই অতি-মানুষ হয় এবং দেবতায় পরিণত হয়, যেখানে সে সুদূর আদর্শে পৌঁছতে পারে। অন্তত আদর্শে পৌঁছানোর চেষ্টাটাও যদি থাকে, যে যতটুকু আদর্শে পৌঁছবে সে ততটুকুই যোগ্য গুরুর যোগ্য শিষ্য বলে পরিগণিত হবে।

ছড়ানো মুক্তো : সপ্তম খণ্ড

প্রকাশকের নিবেদন

(প্রথম প্রকাশ)

'ছড়ানো মুক্তো' ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ছে মানুষের হৃদয় অঙ্গনে। এটি খুবই আনন্দের বার্তা। 'বর্তমান' দৈনিকের 'অমৃত কথা' কলমে ছড়ানো মুক্তো থেকে কিছু বাণী প্রায় নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে বহুদিন ধরে। পাঠক বর্গ অকুণ্ঠ চিত্তে জানিয়েছেন তাঁদের সশ্রদ্ধ সমাদর। বহু চিঠিপত্র লাগাতার এসেছে ছড়ানো মুক্তোর উৎস সন্ধানে। ছয় খন্ডের পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ নিঃশেষিত হয়েছে অল্প সময়ের মধ্যে।

ছড়ানো মুক্তোর এই সপ্তম খণ্ডটিও সংকলিত হয়েছে পূর্বের ছয়টি খণ্ডের মতই শ্রীঅর্চনা মায়ের ভক্ত সঙ্গে সৎপ্রসঙ্গের মধ্যে থেকেই। এই সব বাণীর মধ্যে অনুস্যূত হয়ে রয়েছে শ্রীঅর্চনা মার তপঃশক্তি ও ঘনীভূত আধ্যাত্মিক স্পন্দন। এই দিব্যশক্তিমণ্ডিত স্পন্দন সর্বসাধারণকে ক'রে চলেছে উদ্দীপিত ও উজ্জীবিত।

শ্রীসত্যানন্দ মানসকন্যা পূজনীয়া সন্ন্যাসিনী শ্রীঅর্চনা পুরী মায়ের সৎপ্রাসঙ্গিক বাণীর এই চয়নিত পরিবেশন জিজ্ঞাসু ও সহৃদয় পাঠকবর্গের সার্বিক সন্তৃপ্তি বিধান করুক—এই প্রার্থনা।—

শ্রীসত্যানন্দার্পণমস্তু।

রথযাত্রা, ১৫ই আষাঢ়, ১৪০২
30th June, 1995

ছড়ানো মুক্তো

(৭ম খণ্ড)

১।। ফ্রয়েড যে অবচেতনের কথা বলেছিলেন তার মধ্যে আংশিক সত্য থাকতে পারে। কিন্তু অবচেতনের চালিকাশক্তিকে তিনি যে ইড বলে নির্দেশ করেছেন, সেটা ভুল। অবচেতন হল আদ্যাশক্তি মহাকালী। আমরা জানি না বলেই মনে করি অবচেতন অন্ধকার। কিন্তু অন্ধকার হল অজ্ঞানের আবরণ। আবরণ সরিয়ে দিলেই আলো।

২।। ব্রহ্মই হচ্ছেন মূল। আমরা ব্রহ্ম থেকে এসেছি, ব্রহ্মেই রয়েছি, ব্রহ্মেই ফিরে যাব। আমরা যা ছিলাম, তা-ই আছি, তা-ই হব। শুধু ওপরে অজ্ঞানের আবরণ আছে বলে নিজেদের স্বরূপ জানতে পারছি না। অজ্ঞানের আবরণে ঢাকা থাকতে থাকতে সংস্কার চেপে বসেছে। এই আবরণ সরিয়ে দেবার জন্যই সাধনা।

৩।। সাধনার বহু পথের মধ্যে একটি যেমন ভক্তি। ভগবানে অনুরাগ, ভগবানকে ভালবাসাই ভক্তি। ভক্তি প্রত্যেক মানুষের সহজাত সম্পদ। ভগবান থাকলে ভক্তি আছে আর ভক্তি থাকলে ভগবানও আছেন। কিন্তু মানুষের হৃদয়ের সহজাত ভক্তি ছাইচাপা পড়ে আছে। যেমন 'কথামৃতে' ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, সোনা রয়েছে এক ঝুড়ি মাটি চাপা হয়ে।

ভক্তিও রয়েছে মাটি-চাপা। তাতেই হয় ধর্মের গ্লানি। এই মাটি সরিয়ে দিতেই ভগবান নেমে আসেন। ধর্মের গ্লানি যখন বেশি জমে ওঠে তখন আসেন যুগাবতার। তিনি মানুষের মনকে পরিচ্ছন্ন করেন, হৃদয়কে করেন বাসনামুক্ত। তখন জীব-হৃদয়ের সহজাত ভক্তিসম্পদ মাটি-চাপা

অবস্থা থেকে উদ্ধার পায়। অবতারের আবির্ভাবের মূল উদ্দেশ্য বলা যায়, মানুষের হৃদয়ের হারিয়ে যাওয়া ভক্তি-সম্পদ উদ্ধার করা।

৪।। ভারতে যত অবতার এসেছেন, এমন আর কোনও দেশে নয়। কারণ, ভগবান ভারতকে করেছেন তাঁর মন্দির। এখানে তিনি বার বার আসবেন। জগতের মানুষ ভারতের দিকে তাকিয়ে ভগবানকে দেখবে। অন্যান্য দেশে, যেমন পাশ্চাত্ত্যে ভোগবাদের প্রাধান্য, materialism-এর প্রাধান্য। সেসব দেশে মানুষের জীবনযাপনের বস্তুগত প্রয়োজনগুলির প্রতি নজর দেওয়া হয়। জনসাধারণের জীবনযাত্রার সুবন্দোবস্ত আছে। এদেশে সেটুকুও নেই। কীভাবে মানুষ বাঁচবে, খাবে, পরবে, থাকবে, চিকিৎসা পাবে সেদিকে তেমন নজর নেই।

আবার দেখো, ধর্মের গ্লানিও ভারতেই বেশি। এখানেই মানুষের হৃদয়ের সহজাত ভক্তিসম্পদ মাটি চাপা পড়ে বেশি। তাই ভগবানকেও আসতে হয় বার বার। ভগবান চির উদাসীন। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে তিনি কোনও দিকে ফিরে তাকান না। ভারতের মাটিতে ধর্মগ্লানি বেশি মাত্রায় হলেই স্বয়ং ভগবান নেমে আসেন যুগাবতাররূপে।

৫।। আকবর বাদশা প্রশ্ন করেছিলেন, কেন তাঁকেই আসতে হবে, কই আল্লা নিজে তো আসেন না? তিনি পাঠান তাঁর দূত কিংবা পয়গম্বরদের। তাছাড়া, পয়গম্বরও শেষবারের মতো এসে গিয়েছেন, আর আসবেন না। তাই আকবর বললেন, মানুষকে উদ্ধার করতে আল্লা বা ভগবান নিজে আসেন না।

এসব কথার কিছুদিন পর একদিন বাদশা নৌকাবিহার করছিলেন। হঠাৎ তাঁর ছেলে জলে পড়ে গেছে—একথা শুনতে পেয়েই তাড়াতাড়ি ছেলেকে উদ্ধার করতে বাদশা নিজেই জলে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সবাই তাঁকে আটকে দিল। তারপর তাঁকে বলা হল, আপনি স্থির হোন।

আপনার ছেলে জলে পড়েনি। জলে পড়েছে আপনার ছেলের মতো দেখতে একটি পুতুল। এটা করা হল আপনাকে দেখাতে যে, নিজের ছেলে ডুবলে তাকে উদ্ধার করতে পিতা নিজেই জলে ঝাঁপ দেন। আর কাউকে নামিয়ে স্বস্তি পান না। সব মানুষ ঈশ্বরের সন্তান। তাই তাদের উদ্ধার করতে স্বয়ং ভগবানকে পৃথিবীতে নেমে আসতে হয় নিজের টানেই।

আমাদের ঠাকুর শ্রীসত্যানন্দদেব বলতেন, "মুসলিম ও খ্রিস্টান দেশগুলির জন্য আমার দুঃখ হয়। কারণ, তাদের এক প্রফেট, এক গ্রন্থ, এক পথ। তারা ভগবৎ ভক্তিরূপী সম্পদ থেকে বঞ্চিত। ভারতে যত দারিদ্র্যই থাকুক, এ দেশ ভগবৎ ভক্তির সম্পদে সমৃদ্ধ।" এখানে যার যেমন খুশি ভগবানের একটা রূপ বেছে নিয়ে ভগবৎ ভক্তি আস্বাদন করতে পারে। ইষ্ট নির্বাচনের এই স্বাধীনতা হিন্দুধর্ম ছাড়া আর কোনও ধর্মে নেই। কাজেই ভক্তি এবং তার বৈচিত্র্যময় আস্বাদন ভারতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য।

তবে মানুষের সহজাত ভক্তিকে মাটি-চাপা অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে হবে। সেজন্য চাই তপস্যা। সর্বদা তাঁকে স্মরণ মনন করতে হবে। ইষ্টমন্ত্র জপ করতে হবে।

৬।। নিত্যলীলা সবসময় চলছে। ভগবানের যে লীলা স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, তা-ই নিত্যলীলা। স্থূল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সেটি দেখা যায় না, শোনা যায় না, আস্বাদন করা যায় না। সাধনার দ্বারা যখন সাধক চিন্ময় দেহ লাভ করেন, তখন এই দেহে থেকেই ইচ্ছা করলে তিনি ভগবানকে দর্শন করতে পারেন। অন্য কেউ পাচ্ছেন না, অথচ তিনি দর্শন পাচ্ছেন। দেহে একটা প্রেমের layer পড়ে যায়, যার দ্বারা তিনি সবকিছু আস্বাদন করেন।

৭।। ভগবান হচ্ছেন সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু। তাঁর থেকে সরে এলে যে একটা বিশৃঙ্খলা ঘটে যায়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, তা আমরা বুঝতে পারি

বা না পারি। বর্তমানে সমাজের প্রতি স্তরে একটা বিশৃঙ্খলার ছবি দেখা যায়। কোনও গৃহেই শান্তি নেই। প্রতিটি মানুষ সামান্য তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে অশান্ত হয়ে উঠছে। মনে করছে, আমার দুঃখটাই সবচেয়ে বড়।

কোনও সংসারে যদি একজন মানুষও ঠিক ঠিক ঈশ্বরমুখী হয়, তাহলে সে ঠিক বুঝতে পারে যে, এই তুচ্ছ কারণে অশান্তির সৃষ্টি করাটা উচিত নয়। কারণ, ঈশ্বরমুখী হওয়ার ফলে তার বিবেকবোধ জাগ্রত হয়েছে।

আজ সমাজ এবং সংসারে প্রত্যেকটি মানুষ যদি তার কেন্দ্রবিন্দু ভগবানকে ভুলে না যেত, তাহলে প্রত্যেকের মনে আধার বিশেষে শুভবুদ্ধি ও বিবেকবোধের উদয় হত। ফলে কাম, ক্রোধ, মদ, মোহ, লোভ, হিংসা ইত্যাদি যে রিপুগুলি মানুষে মানুষে বিভেদের সৃষ্টি করে, সে রিপুগুলির উগ্রতা কমে যেত। বিবেক জাগলে তবেই আত্ম-সমীক্ষা সম্ভব এবং তখন মানুষ পরের ভুল না দেখে নিজেকে সংশোধনের চেষ্টা করবে।

৮।। ঠাকুর সত্যানন্দদেব বলতেন—প্রচণ্ড ক্রোধী যারা তারা একটুতেই মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে, যোগ্যস্থানে মর্যাদা দিতে পারে না। অকারণে নিরপরাধ মানুষের সঙ্গেও দুর্ব্যবহার ক'রে বসে। তাই ক্রোধী ব্যক্তিদের প্রার্থনা করতে হয়—তাদের ক্রোধরূপ অরিকে যেন ভগবান বিনাশ করেন। হিংসা এবং লোভের ক্ষেত্রেও তাই।

তবে মানুষের কিছু না কিছু রিপু থাকবেই, সেটা যেন প্রবল আকার ধারণ না করে, তার জন্য প্রার্থনা করতে হয়। আর লোভ, হিংসা, অহংকার, ক্রোধ ইত্যাদি যেন কারও মনে বৃথা আঘাতের বা কারও ক্ষতির কারণ না হয়। এই লোভ, হিংসা ইত্যাদি সমাজের প্রতি স্তরে বেড়ে গেছে বলেই ঘরে ঘরে অকল্যাণ ও অশুভ শক্তির অভ্যুদয় হচ্ছে। এই অশুভ শক্তির অভ্যুদয়কে কলির প্রভাব বলা যায়।

প্রত্যেকটি ব্যক্তিগত জীবনে অশুভ শক্তির উদয় ব্যাপক আকার

ধারণ ক'রে অশুভ শক্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করছে। ফলে দু-একটি শুভশক্তি বিশিষ্ট মানুষের প্রার্থনা ঠিক কার্যকরী হচ্ছে না। তাই প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে নিজেদের ক্ষতিকর রিপুগুলির, বিশেষতঃ লোভ, অহংকার, ক্রোধ, হিংসা, বৃথা ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ—এগুলির যাতে উপশম হয় তার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। আত্মবিশ্লেষণ করতে হবে। বুক নিঙড়ে ঠাকুরের চরণে প্রার্থনা জানাতে হবে। নইলে ব্যক্তি, জাতি—কি ব্যক্তিগতভাবে, কি সমষ্টিগতভাবে শান্তি পাবে না।

৯।। মহামায়ার সংজ্ঞা দিতে গেলে আমাদের সাধারণতঃ মনে হয় যেন মাতৃরূপ। তার কারণ হচ্ছে, মহামায়া শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গবাচক। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যাবে মহামায়া অর্থাৎ মোহকরী যে তত্ত্বটি সেটি স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে তো আছেই এমনকি জীবজন্তু, পশুপক্ষী, স্থূল বস্তুর ভেতরেও আছে। যে কোনও একটি মানুষকে কেন্দ্র ক'রে, যে কোনও একটি প্রাণীকে কেন্দ্র ক'রে, যে কোনও একটি বস্তুকে কেন্দ্র ক'রে মানুষ মোহগ্রস্থ হয়ে জীবন কাটাতে পারে।

সাধারণতঃ কথা ওঠে, স্ত্রীজাতি পুরুষকে বশীভূত করে। একথা অস্বীকার করা যায় না। দেখা যায়, একটি সংসারে শুধুমাত্র অবিবাহিত পুরুষরা বেশ আছে। সেখানে যেই স্ত্রীরূপিণী মহামায়াটি এসে প্রবেশ করলেন, অমনি এসে গেল বিচ্ছিন্নতাবাদ। কিন্তু ভেবে দেখতে হবে এর জন্য দায়ী স্ত্রী পুরুষ উভয়েই। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিদ্যাশক্তি এবং অবিদ্যাশক্তি দুটি শক্তির কথা বলেছেন।

আমাদের মনে হয়, এই বিদ্যাশক্তি এবং অবিদ্যাশক্তি স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মধ্যেই থাকে। একজনের ভেতরে যদি বিদ্যাশক্তির বিশেষ আধিক্য থাকে তাহলে সে স্ত্রী হোক বা পুরুষই হোক অপরকে সে তার দ্বারা প্রভাবিত

করবে। স্বামীর যদি বিদ্যাশক্তি যুক্ত পৌরুষ থাকে, বিদ্যাশক্তিযুক্ত ব্যক্তিত্ব থাকে তাহলে সে স্ত্রীকে ঠিক সৎ উপদেশ দিয়ে তার শুভবুদ্ধি শুভসংস্কারকে জাগিয়ে তুলবে। যে পুরুষের পৌরুষ এবং ব্যক্তিত্ব বিদ্যাশক্তির দ্বারা মণ্ডিত সে কখনই অবিদ্যাশক্তিরূপিণী স্ত্রী দ্বারা প্রভাবিত হবে না।

বর্তমানে পুরুষের দুটি রূপ দেখা যাচ্ছে। এক হচ্ছে সমস্ত ব্যক্তিত্ব এবং পৌরুষকে বিসর্জন দিয়ে স্ত্রীর প্রতি দাসমনোভাবযুক্ত হয়ে তার সন্তোষ বিধান করবার চেষ্টা করা, বিবেকবোধ লুপ্ত হয়ে ভগবৎ বিমুখ হয়ে জীবনযাপন করা, স্ত্রী ছাড়া তার কাছে আর সমস্তই মিথ্যা। আর দ্বিতীয় হচ্ছে, একটি পুরুষ আর একটি অবিদ্যাশক্তির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে বিদ্যাশক্তি যুক্ত বৈধ বিবাহকে অস্বীকার ক'রে বিবাহবিচ্ছেদের পথে যাচ্ছে। পুরুষ জাতির উচিত এই দুই রূপকেই পরিত্যাগ করা।

মেয়েদের ক্ষেত্রেও একই কথা। মেয়েদের ভেতরেও বিদ্যাশক্তি অবিদ্যাশক্তি দুটিরই প্রভাব দেখা যায়। বিদ্যারূপিণী স্ত্রীর সংজ্ঞা শ্রীরামকৃষ্ণদেব দিয়েছেন। সে স্বামীকে সবসময় সৎ পথে থাকতে উৎসাহ দেবে, সৎ উপদেশ দেবে। বিদ্যা স্ত্রী ধর্মের সাথী হয়। সে ভগবানের দিকে স্বামীকে এগিয়ে দেয়। তার মধ্যে একটা ত্যাগের মনোভাব বিশেষভাবে থাকে। যার ফলে বিদ্যা স্ত্রীর একটা মস্ত বড় অন্তরের সম্পদ থাকে। সেটা হচ্ছে সন্তোষ।

বিদ্যা স্ত্রীর অন্তরের সম্পদ লজ্জা, দয়া, সকলের প্রতি মাতৃভাবযুক্ত মমতা, নিঃস্বার্থ সেবার মনোভাব। বিদ্যা স্ত্রী নিজেও আত্মকেন্দ্রিক হয় না, স্বামীকেও আত্মকেন্দ্রিক হতে দেয় না। অবিদ্যা স্ত্রী ঠিক এর উল্টো। সংসারে সে শান্তি আনতে পারে না। সবসময় একটা অসন্তোষ, আত্মকেন্দ্রিকতা, মমত্বহীনতা, কটুবাক্য প্রয়োগে পটুতা তার স্বভাব। সে স্বামীকে ভালবাসলেও কোনদিন স্বামীর সংসারকে ভালবাসতে পারে না।

আজ প্রতি পরিবারে এই স্ত্রী পুরুষ উভয়ের মধ্যে এই অবিদ্যা শক্তির প্রভাব বাড়ার ফলে একান্নবর্তী পরিবার বলে কিছু থাকছে না। একান্নবর্তী পরিবার বলতে শুধু যে একটি বাড়িতেই থাকতে হবে তার কোনও মানে নেই, ভিন্ন ভিন্ন বাড়িতে থেকেও পরস্পরের প্রতি অন্তরের মৈত্রী বজায় রাখলে, সুখে দুঃখে পরস্পর পরস্পরের পাশে এসে দাঁড়ালে, একান্নবর্তী পরিবারেরই সমতুল্য হবে। কিন্তু আত্মহারা স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েই আজ অবিদ্যায় আচ্ছন্ন। তার প্রতিফলন সমাজের বুকে পড়ে গেছে। ফলে অভদ্র আচরণ, রূঢ় ব্যবহার, কোপন স্বভাব সবই বেড়ে যাচ্ছে। এর জন্যে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক মানুষই দায়ী, সমাজব্যবস্থাও দায়ী।

১০।। প্রত্যেকেই বলে সমাজে একটা ধস নেমেছে। সেই ধস নামার মাটি কোপানোর কাজে সমাজের সব মানুষই কিন্তু এগিয়ে এসেছে। সবার হাতে কোদাল। সবাই নিজের পায়ের তলার মাটি আগে কাটছে। নিজের বাড়ির ইটগুলো নিজেরাই ছাড়াচ্ছে। কেউ কাউকে সহ্য করতে পারছে না। সবাই সবাইকে দায়ী করছে। আত্মবিশ্লেষণ বলে বস্তুটি হারিয়ে গেছে। কাজেই মহামায়ার অবিদ্যা শক্তির হাত থেকে রক্ষা পেতে গেলে প্রত্যেকের উচিত আত্মসমীক্ষা। ভেতরের অবিদ্যা মায়া হচ্ছে তার অদিব্য কাম, ক্রোধাদি রিপুগুলি। আর বাইরের অবিদ্যা মায়া মানুষ, বস্তু, পশু সবকিছু।

আমরা যদি শান্তি পেতে চাই তাহলে আগে আমাদের অবিদ্যা মায়ার হাত থেকে মুক্তি লাভ করতে হবে।

১১।। একটা বিরাট দিব্য শক্তির অবতরণ ঘটে কোনও মহাপুরুষ বা অবতার পুরুষের নরলীলায়। তাঁরা যখন চলে যান তখন আমরা দেখি একটা বিরাট অন্ধকারের আবরণ যেন পড়ে গেল। এমনকি তাঁর পরবর্তী

অনুগামীদেরও দেখি, তাঁরা অনেকক্ষেত্রে তাঁদের আদর্শকে হারিয়ে ফেলেছেন। তখন মনে হয়, ভগবান এলেন, আর যাবার সময় কি তাঁর চরণ চিহ্নটাও মুছে দিয়ে গেলেন?

এই চরণচিহ্ন বলতে মনে রাখতে হবে মানুষের অন্তরে ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালবাসা, নিষ্ঠা, বিবেক, বৈরাগ্য, উদারতা, সততা ইত্যাদি গুণের উন্মেষ। তার পরিবর্তে দেখি, সে জায়গায় এসে পড়ে সংকীর্ণতা, অনুদারতা, ঈর্ষা, বিদ্বেষ ইত্যাদি। তখন সত্যি মনটা খুব বিষণ্ণ হয়ে যায়।

তাই আমাদের উচিত ভগবান চলে যাওয়ার পর আমরা যেন তাঁর দেওয়া সম্পদ অর্থাৎ ভক্তি, শ্রদ্ধা ইত্যাদিকে আরও বেশি ক'রে আঁকড়ে ধরি। সংকীর্ণতা প্রভৃতি অশুভ গুণের আবরণ দিয়ে যেন ঢেকে না ফেলি। এই অন্তরের সম্পদ যদি আমরা হারিয়ে ফেলি, তাহলে আমরা কিন্তু আরও বেশি দেউলে হয়ে যাব। খুব সাবধানে আমাদের এই সম্পদগুলিকে প্রাণপণে আঁকড়ে রাখতে হবে এবং তাঁর ফেলে যাওয়া আলো জ্বালিয়ে রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে, মানুষের মনের অন্ধকার যত বাড়বে, বাইরের অন্ধকারও তত বাড়বে। প্রতিটি ব্যক্তির মানসিক দৈন্যই সমাজের ব্যাপক দৈন্যরূপে প্রকাশিত হয়।

আমরা বলি, এত অবতার মহাপুরুষ আসছেন, তবু দেশের অন্ধকার কাটছে না কেন? এর জন্যে আমরা প্রত্যেকেই দায়ী। আমরা কেউই তাঁর ভাবমূর্তিকে অন্তরে ধরে রাখার চেষ্টা করি না। মুষ্টিমেয় কিছু লোক যারা সেই ভাবমূর্তিটিকে ঠিক ঠিক ধরে থাকে তারা ব্যক্তিগতভাবে হয়তো উপকৃত হয়, কিন্তু ব্যাপক অন্ধকার দূর করতে গেলে সমষ্টির চেতনা দরকার।

১২।। প্রশ্ন ঃ গুরু ইষ্টে লয় হয়ে যায় আবার ইষ্ট গুরুতে লয় হয়—এই কথাটির তাৎপর্য কী?

উত্তর ঃ এটি সবারই ক্ষেত্রে একরকম হয় না। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলেছেন, গুরু যেন সেখো, সঙ্গে নিয়ে চিনিয়ে দেন ওই তোমার ইষ্ট, তারপর গুরু ইষ্টতে লয় হন। কিন্তু আমাদের ঠাকুরের একটি বাণী আছে, কখনও গুরু ইষ্টে লয় হয়ে যান, আবার এমন এক এক স্তরের ভক্ত আছেন সেখানে ইষ্ট গুরুতে লয় হয়ে যান। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এবং আমাদের ঠাকুরের এই দু'টি ভাবের কথা বুঝতে গেলে প্রথমেই মনে রাখতে হবে ভক্তির জগৎটা হচ্ছে ভাব ও বৈচিত্র্যের জগৎ। যার যেমন ভাব তার তেমন লাভ।

সাধারণতঃ মানুষ গুরুকে ভক্তি করে ঠিকই, কিছুটা ঈশ্বরবোধও হয়তো থাকে; কিন্তু সেই ঈশ্বরবোধ গভীর হওয়া এবং পাকা বিশ্বাসের সঙ্গে মানুষ-দেহধারী একজনকে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারী ঈশ্বররূপে মেনে নেওয়া খুবই কঠিন। সেইজন্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঐ বাণীটি সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সাধারণ মানুষ গুরুদত্ত মন্ত্র জপ করে, তাঁর নির্দেশিত পথে চলে। সে জানে গুরুর হাত ধরেই তাকে ইষ্টের কাছে পৌঁছতে হবে। গুরু তার সাধন পথের দিশারী।

কিন্তু আর একদল ভক্ত আছে যাদের কাছে ইষ্টের চেয়ে দেহধারী গুরুই প্রধান। তারা ইষ্ট নাম করে ঠিকই, কিন্তু তাদের মনপ্রাণ অন্তরাত্মা সবকিছু জুড়ে গুরুর রূপ, গুরুর ভাব, গুরুর চিন্তা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। তাদের গুরুর প্রতি এমনই গভীর ভালবাসা যে গুরুকে সৃষ্টি স্থিতি লয়কারী ভগবান বলে না ভাবুক, গুরুই যে তাদের আপন হতেও আপন, এমনকি ইষ্টের চেয়েও আপন, গুরু ছাড়া তাদের এক মুহূর্ত চলবে না, এই ভাব তাদের মধ্যে গভীরভাবে বাসা বাঁধে। এখানে ঐশ্বর্য বোধ নেই, কিন্তু প্রেম আছে। এই ধরনের ভক্তের ক্ষেত্রে ইষ্ট অর্থাৎ ভক্তিপ্রিয় ভগবান গুরুতে লয় হয়ে যান।

১৩।। প্রশ্ন ঃ সত্যিকারের জ্ঞানী বলব কাকে? কতকগুলি বিশেষ ডিগ্রিধারী মানুষকে কি ঠিক জ্ঞানী বলে চিহ্নিত করা যায়?

উত্তর ঃ সাধারণভাবে জাগতিক দৃষ্টিতে যার যত পাণ্ডিত্য তাকে তত বড় পণ্ডিত বা জ্ঞানী বলেই আমরা জানি। কিন্তু কথামৃতে একটি চরম কথা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন—যে পণ্ডিতের বিবেক বৈরাগ্য নাই তাকে খড়কুটো বলে মনে হয়। ঠাকুরের এ কথার অর্থ বলতে কি আমরা এই বুঝব যে, প্রত্যেক পণ্ডিতকেই সংসারবিমুখ বৈরাগ্যের পথ নিতে হবে! ঠাকুরের এই বাণীটিকে বুঝতে হবে একটি চরম আদর্শের দৃষ্টিতে। এই আদর্শ তো সকলেই নিতে পারবে না, বিশেষ ক'রে এই যুগে।

প্রাচীন যুগে বুনো রামনাথের মতো সংসারবিমুখ পণ্ডিত হয়তো বেশ কিছু ছিল। কিন্তু এ যুগে যদি আমরা বুনো রামনাথের মত পণ্ডিত খুঁজতে যাই তাহলে হতাশ হব। তবু এ যুগেও জাগতিক জ্ঞান অর্জনের সঙ্গে যদি ভগবৎ বিশ্বাস, ভগবৎ বিষয়ে কিছু জ্ঞান, ধর্মশাস্ত্রের প্রতি একটা আকর্ষণ কিংবা জানার ইচ্ছা, ধর্মপ্রশ্ন এগুলি যদি থাকে তাহলে বর্তমান যুগের সেই জ্ঞানীজনকে শুধু ডিগ্রিধারী পণ্ডিতের চেয়ে বা ভগবৎবিমুখ পণ্ডিতের চেয়ে উচ্চমার্গের জ্ঞানী আমরা বলতে পারি।

কারণ, শুধু ভগবৎ-বিশ্বাসহীন, ভগবৎবিমুখ, কতকগুলি পুঁথিগত বিদ্যা কখনই প্রজ্ঞায় ভাস্বর হতে পারে না বা প্রজ্ঞার পথের নির্দেশও দিতে পারে না। তাই জাগতিক জ্ঞান অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে সচেতন এবং সচেষ্ট থাকতে হবে আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনের জন্যে। তাহলে এ যুগের পটভূমিতেও তাদের প্রকৃত জ্ঞানী বলে চিহ্নিত করা যাবে।

১৪।। প্রশ্ন ঃ বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি বলতে কী বোঝায়?

উত্তর ঃ আমাদের ঠাকুর সত্যানন্দদেব এই বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধির কথা

প্রায়ই বলতেন। যে মানুষের ভেতরে তিনি দেখতেন দিব্যজ্ঞানমণ্ডিত একটি বুদ্ধির বিকাশ, যার বুদ্ধি ঠিক বুঝতে পারে কোনটি শুভ, কোনটি অশুভ, কোনটি ন্যায়, কোনটি অন্যায়, কোনটি সৎ, কোনটি অসৎ, সেই বুদ্ধিকে তিনি বলতেন বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি। আমাদের আদি শাস্ত্র হচ্ছে বেদ। যে বেদকে আমরা বলি অপৌরুষেয় অর্থাৎ বোধির রাজ্য থেকে যার উদ্ভব। সেই বোধির স্পর্শ পাওয়া বুদ্ধি যদি কোনও মানুষের মধ্যে দেখা যায়, তাহলে তাকে বলা যায় মানুষটি একটি উচ্চ মার্গের দীপ্ত বুদ্ধির অধিকারী।

ঠাকুর এইসব ভাস্বর বুদ্ধিযুক্ত জ্ঞানকে বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি, বেদোজ্জ্বলা জ্ঞান ইত্যাদি বলে অভিহিত করতেন। যাদের মধ্যে এই বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধির প্রকাশ দেখতে পেতেন, তাদের উৎসাহ দিতেন, প্রেরণা দিতেন, যাতে এই বুদ্ধির দীপ্তি তাদের কোনও দিন মলিন না হয়। বলতেন, দেখো, তোমাদের এই বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধিটি যেন কখনো অশুভ বুদ্ধির দ্বারা আচ্ছন্ন না হয়।

১৫।। প্রশ্ন ঃ 'আমি মুক্তি দিতে কাতর নই, ভক্তি দিতে কাতর'—এ কথার তাৎপর্য কী?

উত্তর ঃ মুক্তি বলতে আমরা মনে করি একটা বিরাট কিছু। অনেক সময় আমরা তাকে ভক্তির উপরেও স্থান দিয়ে ফেলি। কিন্তু যারা ঠিক ঠিক ভক্ত, বিশেষ ক'রে যারা কিছু পেতে চায়, ভগবৎ-আস্বাদন করতে চায়, তাদের কাছে মুক্তি তুচ্ছ। মুক্তি বলতে কী বোঝায়—আর জন্ম হবে না, এ জগতে আসার হাত থেকে মানুষ রেহাই পাবে, এই তো!

সারা জীবন হেন অন্যায় কাজ নেই যে করেনি, এরকম একটি লোক হঠাৎ আমাদের ঠাকুরের কাছে এসে ভয়ে কীরকম কাঁপতে লাগল। ঠাকুরকে জানাল, ঠাকুরকে দেখে তার ভীষণ ভয় করছে, কারণ, জীবনে সে অনেক অন্যায় করেছে।

ঠাকুর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কী চাও? সে উত্তরে বলল—

ঠাকুর, আমি মুক্তি চাই। ঠাকুর তার প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। তারপর মাত্র তিনদিন মৌন এবং উপবাসী থেকে লোকটি চিরমুক্তি লাভ করল। লক্ষ্য করার বিষয়, লোকটি কিন্তু বলতে পারল না, ঠাকুর, ভক্তি চাই, ভগবৎ-আনন্দ আস্বাদন করতে চাই, এতদিন যে পাঁক ঘেঁটেছি সেই পাঁক ধুয়ে নতুন একটা আশ্রয় চাই। সে জানে মুক্তি চাওয়া অনেক সহজ। জলে জল মিশে যাবার মতো এটা সহজ। সে এও জানে—ভগবৎ রস পেতে গেলে যে কঠোর তপস্যা জন্মজন্মান্তর ধরে করতে হয়, তা অনেক কঠিন। তার চেয়ে মুক্তি পাওয়াটা সহজ।

এ মুক্তি, ভক্তি শাস্ত্রে যে মুক্তির কথা আছে তা নয়। এ অতি সাধারণ মুক্তি। সেখানে আনন্দ আস্বাদনের কোন ব্যাপারই নেই। সারা জীবনে লোকটি যে পাপের বিষ জমা করেছে, সেটা ওই বিরাট সমুদ্রে একটা বিন্দুর মতো মিলিয়ে যাবে। এখানে তার প্রাপ্তির ব্যাপার কিছু নেই। তবে সে জীবন-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবে—এ কথা ঠিক।

কিন্তু ভক্তি লাভ করা অত সহজ নয়। ভক্তিলাভের জন্য দরকার তপস্যা এবং কঠোর সাধনা। ওই লোকটির সে ধৈর্য নেই। তাই সে ভক্তি চাইল না, মুক্তি চাইল।

যে ভক্তি আমরা সাধারণ মানুষের মধ্যে দেখি, সে অতি সাধারণ ভক্তি। ভগবানকে বাঁধবার মতো গভীরতা সে ভক্তির মধ্যে সাধারণতঃ থাকে না। ভক্তি-পথের যে সব মানুষ বৈধীভক্তির মাধ্যমে নাম, পাঠ, পূজা ইত্যাদি নিত্য কর্মের মধ্য দিয়ে ভগবানকে ডাকছে তারা হয়তো ভগবানের কৃপাও পাচ্ছে ভাব অনুযায়ী।

কিন্তু ভগবানকে বাঁধবার জন্য যে প্রেমের বন্ধন, সেটি পেতে গেলে সব ছাড়তে হবে। 'সব ছোড়ে তো সব পাওয়ে।' কিন্তু এ যুগে সাধারণ মানুষের পক্ষে সেটা প্রায় অসম্ভব। সে জন্য ঠাকুর এ যুগের মানুষকে

সহজ বৈধীভক্তির পথটাই গ্রহণ করবার জন্য বলেছেন যাতে সে কিছুটা অন্তত এগিয়ে যেতে পারে।

ভক্তি দিতে সাধারণভাবে কাতর হলেও ভগবান কিন্তু ভক্তের ভক্তি আস্বাদন করতে এবং ভক্তির বন্ধনে বাঁধা পড়তে নিজেই ছুটে আসেন ধরাধামে। বৃন্দাবনের সরলপ্রাণ গোপ-গোপীদের তিনি অকাতরে ঢেলে দিয়েছেন শুদ্ধাভক্তি। তাই তাঁর কাছ থেকে ভক্তি আদায় করতে হলে ভক্তকে হতে হবে সরলপ্রাণ, নিষ্কাম এবং পূর্ণ শরণাগত। তারই সঙ্গে চাই তীব্র ব্যাকুলতা। এ সব না থাকলে ভগবান তো ভক্তি দিতে কাতর হবেনই।

১৬।। প্রশ্ন ঃ এক এক জনের মধ্যে এক এক রকম ভাবের উদয় হচ্ছে, তার উৎস কী?

উত্তর ঃ তিনি এক, কিন্তু বহুর সমাহার। আবার তিনি এক বহুর-ও পারে। তিনি অস্তি, তিনি নাস্তি, তিনি সগুণ, তিনি নির্গুণ। তিনি সগুণ নির্গুণেরও পারে। ঠাকুর সত্যানন্দদেব বলেছেন 'তিনি'তত্ত্ব রঙ্গতত্ত্ব। ঠাকুর ব্রহ্ম বললেন না, মা বললেন না, 'তিনি' বললেন। বিশেষ কোনও গুণ দিয়ে তাঁকে সীমিত করা যাবে না। ব্রহ্মের যেখানে কথা উঠেছে সেখানে তাঁকে বলা হয়েছে 'তৎ'। 'তৎ'-এর মানে 'তিনি'—নারী নন, পুরুষ নন, যে কোনও form-এ রূপায়িত হতে পারেন। তিনি যদি রঙ্গতত্ত্ব হন তবে সেখানে ভাব আছে, লীলা আছে, রস আছে। ওগুলো নিয়েই তো বৈচিত্র্য। সুতরাং যারা এই তত্ত্ব আস্বাদন করবে, তাদের মধ্যেও রুচিবৈচিত্র্য থাকবে। মানুষের মধ্যে এক এক জনের এক এক রকম ভাবের উৎস সেই 'তিনি'।

১৭।। প্রশ্ন ঃ কথামৃতে এক ভক্তের কথা আছে। সে হরিনাম করতে করতে আপন মনে মাঠ দিয়ে যাচ্ছিল। সে ধোপাদের কাপড় মাড়িয়েছিল। ধোপারা তেড়ে এলে ভক্তের বিপদ দেখে তাকে রক্ষা করার জন্য নারায়ণ নেমে আসছিলেন। কিন্তু ভক্তটি নিজেই ধোপাদের মারতে ইঁট তুলেছে দেখে

নারায়ণ ফিরে গেলেন। তা হলে আমরা কি আত্মরক্ষা করব না? বিপদে পড়লে আমরা কি ঈশ্বরের ওপর ভার দিয়ে চুপচাপ থাকব?

উত্তর ঃ না। শরণাগতিই আদর্শ। কিন্তু ভক্তির তারতম্য আছে। পূর্ণ শরণাগতির জন্য যে ভক্তির প্রয়োজন তা সবার থাকে না। বলতে গেলে কোটি কোটি মানুষের মধ্যে দু একজনের থাকে। ঐ কাহিনীতে যে ভক্তটির কথা বলা হয়েছে তারও সেই ভক্তি ছিল না এবং সেই শরণাগতিও ছিল না। তার নিজের ধারণা ছিল, সে ভক্তিবিহ্বল, তাই কোনও দিকে হুঁশ নেই। কিন্তু ভগবান পরীক্ষা ক'রে দেখালেন, ওই ভক্তের আত্মবোধ ও দেহবোধ আছে। শুদ্ধাভক্তির সঙ্গে পরিপূর্ণ শরণাগতি একটা বিশেষ অবস্থা। সে অবস্থায় দেহবোধ জগৎবোধ সব লুপ্ত হয়ে যায়। যে ভক্ত একান্ত ভক্তিবশত জগতের বোধ, এমনকি নিজের দেহের বোধও হারিয়ে ফেলেছে, ঈশ্বর তার সব ভার বহন করেন। কিন্তু যে ভক্ত নিজের বিষয়ে সচেতন, তাকে আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা করতে হবে।

১৮।। প্রশ্ন ঃ চারিদিকে শুনতে পাই, লড়াই চলছে, লড়াই চলবে। কিন্তু এতে তো আছে শুধু অশান্তি। লড়াই ক'রে মানুষ কী পায়?

উত্তর ঃ সাধারণতঃ লড়াই বলতে আমরা বুঝি অশান্তি। সংসারে সাধারণতঃ মানুষ লড়াই করছে ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির জন্য, জাগতিক কিছু প্রাপ্তির জন্য। সেখানে অশান্তি তো থাকবেই। সে অশান্তির জ্বালা মানুষকে মহৎ করতে পারে না। যার যে রকম ক্ষুদ্র চাহিদা, তার প্রাপ্তিটাও তেমনি ক্ষুদ্র। সেখানে মহৎ কিছু আমরা আশা করতে পারি না। কিন্তু লড়াইয়েরও আবার তারতম্য আছে। একটা বিরাট মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য যে লড়াই, সে লড়াইয়ে যত অশান্তি থাকুক, সেখানে একটা বিরাট প্রাপ্তির আনন্দের সম্ভাবনা থাকে। এ লড়াই একদিকে মনের ভেতরে আসুরী বৃত্তির সঙ্গে হতে পারে, আবার বাইরের পরিবেশের বাধার সঙ্গেও হতে পারে।

আমাদের ঠাকুর সত্যানন্দদেব বলতেন, "সামনে একটা বড় আদর্শ থাকলে, সেখানে পৌঁছতে যত কষ্টই থাকুক, মনটা নীচে নেমে যেতে পারে না।" তাই আমাদেরও মনে হয়, লড়াই যদি করতেই হয় তাহলে মহত্ত্বের প্রতিষ্ঠার জন্য করাই ভাল। ক্ষুদ্র বস্তুর জন্য লড়াই ক'রে জীবনটাকে বৃথা ক্ষতবিক্ষত করা উচিত নয়।

১৯।। প্রশ্ন ঃ অনেক সময় দেখি, কেউ কেউ অনবরত নাম জপ করছে, নিয়মিত পূজাপাঠও করছে। কিন্তু তাদের ভেতর থেকে ক্ষুদ্রতা, অহংকার, ক্ষোভ, অপরের প্রতি অকারণ ঈর্ষা, বিদ্বেষ ইত্যাদি যাচ্ছে না। এর কারণ কী?

উত্তর ঃ এর কারণ বলা যায় যে, নাম করছি বটে কিন্তু শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক রুটিন হিসেবে। যা কিছু আধ্যাত্মিক কৃত্য করছি, তা যন্ত্রবৎ। কিছু শুভ সংস্কার নিশ্চয়ই আছে নইলে করছি কেন? কিন্তু এক্ষেত্রে নাম জপ ইত্যাদি আধ্যাত্মিক রুটিনের সঙ্গে সঙ্গে মনের ওপর কড়া নজর রাখতে হবে। এই নজরদারিকে বলা যায় বিবেক। আমাদের ঠাকুর সত্যানন্দদেব বলতেন—মন হচ্ছে চোর, তার পেছনে মনের আর একটি শুভ অংশকে অর্থাৎ বিবেককে পুলিশের কাজে নিযুক্ত করতে হবে। নিজের মনটাকে যদি আমি না বুঝতে পারি, নিজের বৃত্তিগুলিকে যদি তাড়াবার চেষ্টা না করি, তাহলে কিছু করার নেই। এইজন্যই শাস্ত্রে বলেছে—

গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব তিনের দয়া হল
একের দয়া বিনে জীব ছারে খারে গেল।।

এখানে মনের কতখানি ভূমিকা তা বুঝে দেখতে হবে। মনের ওপর তাহলে কতটা দায়িত্ব দিয়েছেন শাস্ত্র ভগবান—সেটাও বুঝতে হবে। তুমি নাম কর—গুরু দয়া করছেন। দয়া করেছেন বলেই তিনি নাম দিয়েছেন। যে মুহূর্তে নাম দিয়েছেন সেখানে নামীও অনুস্যূত হয়ে গেছেন। কাজেই

গুরুর দয়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণের দয়াও স্বাভাবিকভাবেই পেয়ে যাচ্ছি। গুরুকৃষ্ণের দয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব তথা ভক্তের দয়াও আমরা পেয়ে থাকি। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে, মনের ত্রুটিগুলি যাচ্ছে না। সেখানে বুঝতে হবে, আমার কোথাও ফাঁকি আছে। নাম করছি কিন্তু সে নামের ভেতর নাম করার একটা অহংকার হয়তো থেকে যাচ্ছে। অথবা কতকটা লোকদেখানো নাম ক'রে যাচ্ছি। আত্মিক উন্নতির প্রতি কোনও দৃষ্টি নেই। মনের ফাঁকি যদি না ধরতে পারি, মনকে যদি প্রশ্রয় দিয়েই চলি, তবে কিন্তু নামের দ্বারা নামসিদ্ধ অবস্থা বা নামময়তা প্রাপ্তি হবে না। অভ্যাসবশতঃ রুটিন, আধ্যাত্মিক রুটিন ক'রে কিছুটা হয়তো উন্নতি হবে। কিন্তু সেটা আংশিকমাত্র। প্রসারতা না এলে পূর্ণতা আসবে না।

নাম জপ পূজা সবই করতে হবে, কিন্তু বিশেষভাবে আমাকে লক্ষ্য রাখতে হবে আমার আত্মিক প্রসারতা হচ্ছে কিনা। অন্তরটা উদার এবং ক্ষোভহীন না হলে সে নামের দ্বারা কোন ফল হয় না। বরং সে নামের ভেতর একটা অহংকারের প্রকাশ এসে যায়। ফলে ভক্তির যে সারল্য, যে দীনহীন ভাব, আমি ভগবানের দাস, আমি ভগবানের সেবক, এমন কি ভক্তেরও সেবক—এই ভাবটা থাকে না। কিন্তু নামের তপস্যা যারা করছে তাদের এই ভক্তির সারল্য, নিরহংকারিতা, ঈর্ষা-বিদ্বেষ বর্জনের চেষ্টা —এগুলি একান্ত প্রয়োজন। তা না হলে নাম হবে লোকদেখানো আর হবে অহংকারকে প্রশ্রয় দেওয়া। নামের একটা নিজস্ব ক্ষমতা নিশ্চয়ই আছে। নিজস্ব ক্ষমতা আছে বলেই চৈতন্যময় নাম লক্ষ্য করেন তাঁকে আশ্রয় ক'রে যারা রয়েছে, তারা তাঁর মর্যাদা ঠিক দিতে পারছে কিনা এবং তাঁর মাহাত্ম্যটা ফুটিয়ে তোলার জন্য চেষ্টা করছে কিনা। নাম করছি অথচ মনের ভেতর থেকে হীন বৃত্তিগুলি দূর হচ্ছে না—এটা দেখে নামেরও অভিমান হয়। তিনি তাঁর ঈপ্সিত অভিলাষ পূর্ণ করতে চান না। তবে

সাধারণ মানুষ যারা নামটাকে সাধনা হিসেবে নেয়নি, নিত্যকৃত্য হিসেবে নিয়েছে, তাদের পক্ষে তারা যেটুকু করছে, সেটুকুই ভাল। যারা সাধনা বলে গ্রহণ করছে তাদের এতটুকু অপরাধ হলে নাম ক্ষমা করবেন না। তাই নামের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অহংকার, বাসনা কামনা, ক্ষোভ, ঈর্ষা-বিদ্বেষ বর্জন করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। নামের কাছেই প্রার্থনা করতে হবে যেন এই অশুভ বৃত্তিগুলি চলে যায় এবং তার স্থানে নামের যেগুলি আসল কৃপা সেইটিই আসে। ক্ষোভহীনতা নিরহংকারিতা, ঈর্ষা-বিদ্বেষ-হীনতা, উদারতা, সহানুভূতি ইত্যাদি নামের আসল কৃপা। আর সর্বোপরি নামের কৃপায় অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হবে দিব্য আনন্দ। এর জন্য শরণাগত হয়ে প্রার্থনা করতে হয়।

২০।। প্রশ্ন ঃ সংসারটাকে মনে হয় জেলখানা। রিটায়ার করেছি। এখন আর সেই সময় নেই, শক্তি নেই, যাতে করে জেলখানার গারদ ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়তে পারি। এই অবস্থায় কী ক'রে এই বদ্ধ দশা থেকে উদ্ধার পাব?

উত্তর ঃ গৃহে যখন থাকতেই হবে, তখন ঐ জেলখানাটাকেই মন্দির ক'রে নিতে হবে। সকলে তো সাধু সন্ন্যাসী হয়ে যেতে পারবে না। তবে বাড়িতে থাকাটা যখন জেলখানার মতই অসহ্য বোধ হয়েছে তখন এর থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা তো করতেই হবে। যে মুহূর্তে মনে হয়েছে, সংসারের বাইরে একটা জগৎ আছে, যেটা মুক্তি আর শান্তির জগৎ, সেই মুহূর্তেই সুরু ক'রে দিতে হবে মুক্তির পথে চলার চেষ্টা। সংসারে থেকেই যতটুকু সময় দিতে পারবে ততটুকু দিয়েই সুরু ক'রে দিতে হবে।

এই চেষ্টার একটা দিক প্রার্থনা। ভগবানের চরণে, গুরু ইষ্টের চরণে প্রার্থনা করতে হবে। নমজপ সদ্‌গ্রন্থ পাঠ এসব বাড়াতে হবে। ছোট বয়স থেকে সুরু করতে পারলে নিশ্চয়ই খুব ভাল হয়। কিন্তু যখন হয়নি, তখন

আর সময় নষ্ট না ক'রে এখন থেকেই আরম্ভ করতে হবে।

আমরা আকাশের দিকে তাকালেই মুক্তির আভাস পাই। মুক্তির জগৎ একটা আছে, যেটা এ জগতের মধ্যে সীমিত নয়। যখনই ধর্মপ্রশ্ন এল, মনে হল এটাই সব নয়, সংসারটাই শেষ কথা নয়, আরও বড় প্রাপ্তির জগৎ আছে, তখনই আরম্ভ হল নতুন যাত্রা। বয়স হয়েছে বলে অকারণ ভাববার কিছু নেই। প্রত্যেকটি শুভ চেতনার জন্ম এক একটা নতুন জন্ম। শুভ চেতনার জন্মের মধ্য দিয়ে নতুন জন্ম হয় মানুষের।

ছোটবেলায় থাকে পুতুল খেলার জগৎ। তখন পুতুলকে নিয়ে ছোটরা অবুঝের মতই সংসার পাতে খেলার ছলে। তারপর বড় হয়ে সেই পুতুল খেলা জীবন্ত হয়ে ওঠে সত্যিকার সংসারের জীবনে। তারপর আবার সেই খেলার ঘোরটাও এক সময় ভাঙ্গে। তখন জন্ম নেয় এক নতুন চেতনা, নতুন জিজ্ঞাসা। এটিও আমরা বলব ঠাকুরেরই কৃপা।

অতএব চেতনার উন্মেষ মাত্রই শুভযাত্রা আরম্ভ ক'রে দেওয়া উচিত। যেটুকু সময় হাতে আছে সেটাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে হবে। অভ্যাস বাড়াতে হবে জপ পাঠ ইত্যাদির। অভ্যাস না থাকলে শেষে নাম মনে পড়ে না। একটি বুড়ি মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আছে। তাকে বলা হচ্ছে, বল দিদি ' রাধা কৃষ্ণ'। সে বলে না কিছুতেই। অনেক পীড়াপীড়ির পর বলল— 'অত বড় নাম আমি বলতে পারব না।' বলেই বুড়ি শেষ হয়ে গেল। আর একটি বুড়ির গল্প প্রচলিত আছে। মরতে মরতে সে বলেছিল—'ওরে প্রদীপের সলতেটা একটু কমিয়ে দে, তেল পুড়ে যাচ্ছে।'

তাই বলছি, খুব অভ্যাস ক'রে যাও। নাম জপ ধীরে ধীরে বাড়াবে। ভাল ভাল ধর্মের বই পড়বে, আলোচনা করবে নিজেদের মধ্যে। এগুলো নিয়মিত করবে। আর সম্ভব হলে সাধুসঙ্গ করবে। সৎসঙ্গ খুব দরকার। বাড়ির চার দেওয়াল থেকে বেরিয়ে যেখানে ভাল লাগে সেরকম কোনও

ধর্মস্থানে কিংবা সাধুসন্ন্যাসীদের আশ্রমে গিয়ে সৎপ্রসঙ্গ করবে, ধর্মকথা শুনবে। ধর্মস্থানে কিছুটা সময় কাটালে কারামুক্তির আনন্দ নিশ্চয়ই কিছুটা পাবে। মায়ার বন্ধনটাও ক্রমশঃ শিথিল হবে। এভাবে প্রার্থনা আর চেষ্টা রেখে গেলে তাঁর কৃপাতেই বন্ধনমুক্তি হবে।

২১।। প্রশ্ন ঃ আজকের ভালবাসা কালকে ভেঙ্গে যাচ্ছে কেন?

উত্তর ঃ সংসারে দেখা যায় প্রতি মুহূর্তে পরস্পরের স্নেহ ভালবাসার মধ্যে ভাঙন ধরছে। আজ যাকে ভালবাসছে কাল তাকে সন্দেহ করছে, তার প্রতি বিদ্বেষ হিংসার ভাব এসে যাচ্ছে। এর কারণ বুঝতে হবে, সংসারে ভালবাসার মধ্যে পবিত্রতা এবং শ্রদ্ধার অভাব আছে। সেখানে যেটাকে ভালবাসা বলে মনে করছি, সেটা কামনা বাসনাযুক্ত স্বার্থযুক্ত মোহ। বর্তমানে সেটা প্রকট।

যার ভালবাসা পবিত্রতায় এবং শ্রদ্ধায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার ভালবাসা সহজে ভেঙ্গে যায় না। তাই জাগতিক ক্ষেত্রেও ভালবাসার সঙ্গে পবিত্রতার সম্পর্ক রাখা উচিত। সে ভালবাসা হবে ভগবানের স্পর্শ পাওয়া ভালবাসা।

তবে এটি সম্ভব তাদেরই পক্ষে যারা ভগবানকে বিশ্বাস করে, যারা সংসার করেও ভগবানকে ধরে থাকে। পবিত্র ভালবাসা যার, তার মধ্যে সন্দেহ বিদ্বেষ হিংসা এসব এলে সে কষ্ট অনুভব করে এবং সেগুলো থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে। কিন্তু যেখানে ভগবৎ বিশ্বাস নেই, পবিত্রতা নেই, শ্রদ্ধা নেই, সেখানে ভালবাসা ভেঙ্গে যায় ক্ষণিকের স্বার্থের সংঘাতে।

২২।। প্রশ্ন ঃ আমাদের আত্মার চিরমুক্তিলাভ কী ভাবে সম্ভব? আত্মার মুক্তির পর তার অবস্থা কেমন হয়? জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিমানের মুক্তির লক্ষণ কি? ভক্তিমার্গের মুক্তির অবস্থা এবং ভাবগুলি কি রকম? ভাব অনুসারে

কি কিছু সাধন করতে হবে, না, ঠাকুরের ইচ্ছানুযায়ী মুক্তিলাভ হবে?

উত্তর ঃ আত্মার মুক্তি বলতে প্রথমেই বুঝতে হবে জীবাত্মা অর্থাৎ শুভাশুভ ফলমিশ্রিত সংস্কার-জড়িত আত্মার মুক্তি। মুক্তি তাঁরই হয়। পরমাত্মা নিত্য মুক্ত। উপনিষদের রূপক ব্যাখ্যায় আছে দুটি পাখির কথা। শাখায় বসে একটি পাখি সুমিষ্ট ফল ভক্ষণ করছে আর একটি নির্বিকার সাক্ষী দ্রষ্টা হয়ে আছে। ফলভক্ষণকারীটি জীবাত্মা আর নির্বিকার পাখিটি নিত্য মুক্ত পরমাত্মার রূপ। জীবাত্মা যখন পরমাত্মার সাথে একীভূত হয়ে যাবে তখই জীবের মুক্তি হবে। সুতরাং জীবাত্মাকে চেষ্টা করতে হবে তার সংস্কার আবরণ থেকে বিমুক্ত হ'তে— তারই নাম সাধনা। গুরু নির্দেশিত পথে নিষ্ঠার সঙ্গে চলতে পারলে একদিন না একদিন মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। তবে সেই মুক্তির কাল নির্দিষ্ট হবে আধার বিশেষে। যোগ্য আধার হলে গুরুকৃপায় সাধনার সুবিধা অথবা ফল অচিরে লাভ হবে। অথবা যাদের শুভ সংস্কার জন্মজন্মান্তরের সাধনায় তৈরি হয়ে আছে তাদেরও একটু কিছু করলেই মুক্তিলাভ অতি শীঘ্র হবে। এই মুক্তিলাভের পর জীবের কী অবস্থা হয় সেটা ঠিক ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তবে যতটুকু আপ্তবাক্যে বা শাস্ত্রের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি তার দ্বারা এইটুকু বলতে পারা যায় যে জ্ঞানীর মুক্তি, ভক্তের মুক্তি বা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিমানের মুক্তির অবস্থা বিভিন্ন প্রকার। জ্ঞানীর মুক্তির অবস্থা মুখে বলা যায় না—জলে জল মিশে যাবার অবস্থা, অসীমের মাঝে সীমার লয়—কে বলবে কী হয়? ভক্তের মুক্তির রূপ অবশ্য কিছু বলা যায়, আধার বিশেষে বা সাধক বিশেষে তার প্রকার ভেদ হয়। ভক্ত সাধারণতঃ একেবারে লয় হতে চায় না, দেহান্তের পরও ঠিক এখানকার মতই লীলা আস্বাদন করতে চায়। তার অদ্বৈত মুক্তি বড় একটা হয় না। তারা চিনি খেতে ভালবাসে, চিনি হতে চায় না। ভক্ত এখানে তার ভাব অনুযায়ী গুরু নির্দেশে যেমন ভাবে সাধনা করে ঠিক

তেমনি ভাবের পরিপূর্ণতাই সে লাভ করে দেহান্তের পর। কেউ পূজা, কেউ সেবা, কেউ ভজন, কেউ নৃত্য আরো কত কী ভাবে ভক্ত নিত্যলোকে ভগবানের রস আস্বাদন করে, সেই নিত্যলোকেও নিত্য লীলার অধিষ্ঠান হয়। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিমানের ক্ষেত্রেও ভাব সাধনার কথা ওঠে। তবে মনে হয়, তাদের ভাবসাধনায় উচ্ছলতার চেয়ে শান্তরসাস্পদ একটি ভাব থাকে। শ্রীমার কথায় পাই—নিত্যলোকে এক দল যুগ যুগ ধরে ধ্যান করে, আর এক দল এখানে যেমন পূজো সেবা ইত্যাদি নিয়ে থাকে সেখানেও তাই নিয়েই থাকে। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিমার্গী ভক্তদেরও কেউ কেউ হয়তো লয় না হয়ে ভগবৎ সান্নিধ্যে ধ্যান নিয়েই থাকে। কারণ, আমাদের ঠাকুরের সন্তানদের মধ্যে কোনও কোনও সন্তানকে আমরা বলতে শুনেছি—ঠাকুর, রামকৃষ্ণলোকে আমরা ঠাকুরের সামনে বসে ধ্যান করব আর একবার ক'রে এখানে এসে তাঁর লীলার রাজ্যটি দেখে যাব। বলা বাহুল্য, তাঁরা ভক্ত ছিলেন, কিন্তু সব সময় ভগবানের লীলা-চাপল্য নিয়ে আনন্দ করার চেয়ে স্তব্ধরূপে তাঁকে একাগ্র চিত্তে ধ্যান করতেই ভালবাসতেন। ভক্তির সঙ্গে যাদের জ্ঞানের পরিমাণ অধিকভাবে মিশ্রিত, তাদের মুক্তির পর এই অবস্থাই হয়ে থাকে। তবে, কি জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি, কি শুদ্ধাভক্তি, উভয়-ভক্তির মূল চাওয়ায় কিন্তু ভগবানের রূপটিই থাকে।

সাধারণভাবে ভক্তের মুক্তিকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়—সালোক্য, সাযুজ্য, সারূপ্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি। সালোক্য অর্থ—তাঁর তুল্য লোকে অবস্থান, সাযুজ্য মানে—তাঁর সঙ্গে সদা যুক্ত হয়ে থাকা, সারূপ্য—তাঁর রূপ প্রাপ্ত হওয়া, সামীপ্য—তাঁর নিকটে থাকা, আর সার্ষ্টি অর্থাৎ—তাঁর ঐশ্বর্য লাভ। এই মুক্তি ক'টির মধ্যেই ভক্ত তার ভাব অনুযায়ী আরো বৈচিত্র্যের সৃষ্টি ক'রে ভগবৎ রস আস্বাদন করে। প্রথমেই বলা হয়েছে সব মুক্তিই নির্ভর করছে ভক্তের চাহিদা এবং গুরু নির্দিষ্ট পথে ভাবসাধনার ওপর।

আবার ভক্তের চাহিদাও নানা রূপ আছে। কেউ মুক্তি চায় একান্তে একলা ভগবানকে সম্ভোগ করতে, কেউ বা একা রসাস্বাদন না ক'রে চায় সকলেই সে রসের আস্বাদক হোক। মুক্তির ক্ষেত্রেও তাই। কেউ ভাবে, আমি মুক্ত হলেই হ'ল, আর কিছু চাই না। আবার কারও দরদী মন মুক্তির পথে আরও অনেক মুক্তিকামীকে সঙ্গে নিতে চায়। যেমন রামানুজাচার্যের জীবনে পাওয়া যায়—তিনি গুরুর কাছে যখন মুক্তির মন্ত্র পেলেন, তখন গোপুরমের ওপর উঠে বিপুল জনতাকে সম্বোধন ক'রে চীৎকার ক'রে বলেছিলেন সেই মন্ত্র, যাতে সকলেই মুক্তির অধিকারী হয়। এটি কিন্তু সবার পক্ষে সম্ভব নয়, বিশেষ শক্তিমান আধার বা আধিকারিক পুরুষ ব্যতীত অপর কাউকে মুক্তি দেবার শক্তি থাকে না। তবে সাধারণ দরদী ভক্ত এই প্রার্থনা রাখতে পারে যে, অন্তত যারা অনুরূপ মুক্তিকামী তারা যেন নিত্যলোকের অধিকারী হয়। কিন্তু সে মুক্তি পাবে কিনা সেটি নির্ভর করছে তার সাধনা ও ভগবানের ইচ্ছার ওপর।

শেষ কথা—ঠাকুর সত্যানন্দদেব বলেছেন—"রামকৃষ্ণলোকে যেতে গেলে ডানার জোর থাকা চাই।" ডানার জোর বলতে এই বোঝায়—সে লোকে প্রবেশের অধিকার পাবার যোগ্যতা অর্জন করা। ভগবৎ কৃপা ও সাধনার দ্বারা শুদ্ধাতিশুদ্ধ সত্তা হলেই সেই পরম শুদ্ধ নিত্যলোকে জীব নিত্য মুক্ত সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে।

২৩।। প্রশ্ন ঃ জ্ঞানপাপীদের উদ্ধারের উপায় কী?

উত্তর ঃ একটু ব্যাপক ভাবে তলিয়ে চিন্তা করলে দেখা যাবে জ্ঞানপাপী আমরা সকলেই কিছু না কিছু পরিমাণে। কিন্তু তবু এদের দুটো দলে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন, একদল নিজের বুঝেও-না-বোঝার অক্ষমতায় কষ্ট পায়। আর এক দল নিজের না-বোঝার অক্ষমতাকে অনুমোদন করে। নানাভাবে নিজের মনে মনে নিজের অক্ষমতার কারণগুলি

খাড়া ক'রে বোঝাতে চায় বা বুঝতে চায় যে, এতে তার করণীয় কিছুই নেই।

একটা কথা বলে রাখছি যে, এখানে জ্ঞানপাপী বলতে আমরা আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞানকেই বোঝাতে চাইছি। অবশ্য আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞানের মধ্যেই অনুস্যূত হয়ে রয়েছে মানুষের নৈতিক মান। কাজেই আধ্যাত্মিক জগতে যে জ্ঞানপাপী সে কিন্তু নৈতিক জগতেও অপরাধী হয়ে যেতে পারে সাবধান না হলে। বিশেষ ক'রে এদেশের মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আধ্যাত্মিক সূত্র দিয়ে গাঁথা। সেটাকে বাদ দিতে গেলে তার নাড়ির যোগসূত্রকেই বাদ দেওয়া হবে। আর এদেশের মানুষ যে বেশির ভাগই জ্ঞানপাপী তার কারণ, ধর্মের দেশে থেকেও সে ধর্মকে বাদ দিতে চাইছে অথচ অন্তরের গভীর দেশ থেকে তার ঠিক সাড়াটা পাচ্ছে না। জোর ক'রে কোনও কিছুকে অস্বীকার করতে গেলে যা হয়—একটা তীব্র হতে তীব্রতর বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি করতে হয়, যেটা ঠিক স্বাভাবিক তো নয়ই বরং প্রচণ্ড রকমের অস্বাভাবিক। সে ক্ষেত্রে মানসিক অশান্তিটা দিন দিন বেড়েই চলে, যা চলেছে বর্তমান যুগে আমাদের দেশে। বহু দেশ আছে যেখানে ধর্মের সঙ্গে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কোন সম্পর্ক নেই, কিন্তু তবু তাদের অসামাজিক বোধ এবং সততা এগুলি হয়তো বজায় রয়েছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব হচ্ছে না। যে মুহূর্তে ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিচ্ছি সেই মুহূর্তে অসামাজিকতা অসততা ও অনৈতিকতা এসে ঢুকে পড়ছে ব্যাপকভাবে মানুষের মধ্যে। অথচ প্রত্যেকেই বলছে, এ দেশের মত আর কোনও দেশে দুর্নীতি ঢোকেনি। এখানেই প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে, সকলেই বেশ বুঝতে পারছে অর্থাৎ বেশ টনটনে জ্ঞান যে, যেভাবে মানুষ অন্ধকারের দিকে এগিয়ে চলেছে তাতে এভাবে চলা উচিত নয়। কিন্তু ঐ উচিত নয় পর্যন্তই, তার বেশি আর চিন্তা করতে পারছে না।

জ্ঞানপাপীদের একেবারে প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ একেবারে জেনে শুনে বুঝে পাপ করা।

এখন মূল প্রশ্ন হ'ল—এর থেকে উদ্ধার পাবার উপায় কী? এখানে প্রথমেই বলা যায়, উপায় আছে কিন্তু সে উপায়টা তাদেরই জন্য যাদের মনে প্রশ্ন উঠেছে 'উপায় কী?' অর্থাৎ মুক্তির ইচ্ছা। যারা মুক্তি চায় না তাদের ক্ষেত্রে মুক্তির কোন উপায়ই কার্যকরী হবে না। সাধারণতঃ মানুষ যখন ভুল করে, সে যত ছোট ভুলই হোক না, তখন সেটা বাইরে ঘটবার আগে তার মনোজগতে তার ক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। আমাদের ঠাকুর সত্যানন্দদেব বলতেন, "বাইরে কিছু ঘটবার আগে অন্তর্লোকে সূক্ষ্মলোকে সেটা ঘটে। হোঁচট খাবার আগে মনটা পড়বার জন্য তৈরি হয়ে থাকে। প্রত্যেকটি ভোগের আগে মনটি প্রথমে ফোঁস ক'রে ওঠে কিন্তু পরে ধীরে ধীরে নেমে আসে। শ্রীঠাকুরের কথায়, কেল্লায় নেমে যাওয়ার মত।" কাজেই আমরা প্রত্যেকেই জ্ঞাতসারেই ভুল করছি। না জেনে ভুল করা, যেটা আমরা বলি, সেটা সূক্ষ্ম মন বিশ্লেষণ করলে টেঁকে না। অতএব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে নিজেকেই। সংস্কারের প্রশ্ন অবশ্য আছে কিন্তু সেখানেও ঐ একই উত্তর—যখনই মনে মুক্তির প্রশ্ন উঠেছে তখন সংস্কারও কিছুটা কেটে এসেছে এবং তার ফলে প্রয়োজন মত চেষ্টাও করা যেতে পারে। আমাদের ঠাকুর কতকগুলি উপায় বলেছেন—"যার যে বিষয়ে হীনতা আছে তার সেই বিষয়ে আগে থেকে সচেতন থাকতে হয়। যেমন, যার ক্রোধ বেশি, তার আগে থেকে ক্রোধের বিরুদ্ধে মনকে তৈরি রাখতে হয়, বিচার এই সব ক'রে।" প্রশ্ন ওঠে, ক্রোধের বিরুদ্ধে মনকে তৈরি রাখা, সেটা কীভাবে করতে হবে? এর উত্তরে বলা যেতে পারে, মানুষ আত্মদৃষ্টিসম্পন্ন যদি হয়, তখন সে বুঝতে পারে তার নিজের মনের আনাচে কানাচে কী প্রবৃত্তি উঁকি দিচ্ছে বা কোন রিপুটির আধিপত্য বেশি হচ্ছে।

তার সন্ধানী দৃষ্টি সজাগ থাকায়, সেই রিপুর উদ্বোধক ক্ষেত্র থেকে বা উদ্বোধক বস্তু থেকে সে নিজেকে সরিয়ে রাখবে। এবং চেষ্টা করতে করতে দেখা যাবে, স্বাভাবিকভাবে কখন যেন সেই রিপুর আধিক্য কমে এসেছে। যা এমনও হতে পারে, হয়তো তার আকারটুকু মাত্র থাকবে কিন্তু সে আকারটুকু কারো কোনও ক্ষতি করে না। দেখা যায়, যাঁরা আত্মজয়ী তাঁদের ক্রোধকে যেন তাঁরা ইচ্ছা মত ব্যবহার করেন—যেখানে একান্ত প্রয়োজন সেখানে প্রকাশ করলেন আবার যেখানে প্রয়োজন নাই সেখানে ক্রোধ জয়ের জ্বলন্ত ইতিহাস সৃষ্টি করলেন। মহাপুরুষদের জীবনে এ উদাহরণ বহু দেখা যায়। আমাদের ঠাকুরের জীবনেও দেখেছি সন্তানদের শাসন করার ক্ষেত্রে। শাসনের পরের মুহূর্তে তাঁর ক্ষমার প্রসন্নতা দেখে মনে হত যেন শাসন করবার জন্যই রাগের সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের তো তা হয় না। প্রবৃত্তি তাদের নিজের বশে নাই। তারাই প্রবৃত্তির দাস। তাই নিজের প্রবৃত্তির কথা জেনেও তারা নিজেকে সংযত করতে পারে না। কাজেই নিজের বৃত্তিগুলিকে সংযত করার চেষ্টা নিজেকে করতে হবে। ঠাকুর বলতেন, গভীর রাত্রে উঠে বিচার করবে, মন কী চাস? বুক নিঙড়ে করবে ঠাকুরকে লাভ করার প্রার্থনা। প্রত্যেকেই জানো, নিজের মনের কোণে কোথায় ভোগের জন্য সূক্ষ্ম বাসনা সব কাঁটার মত খচ খচ করছে।" ঠাকুর গভীর রাত্রে প্রার্থনার কথা বললেন এইজন্য যে, মনের নিম্নমুখী প্রবৃত্তিগুলির আবাসস্থল হল অবচেতন রাজ্য এবং অবচেতনের প্রকাশের প্রশস্ত সময় হল গভীর রাত্রি। সারাদিনের কোলাহলে, বহু কাজের ভিড়ে নিজের মনকে একা পাওয়া যায় না, তাই মনের সাথে একান্তে বোঝাপড়ার সময় ঐ নির্জন নিশীথকেই ঠাকুর নির্দিষ্ট ক'রে দিলেন। গভীর রাত্রেই চোর আসে। তাই চোর ধরতে গেলে রাত্রেই হতে হবে সজাগ। জ্ঞানপাপী যদি নিজের মনের চুরিটা ধরতে পারে তাহলে অনেক সহজ

হয় জেনে-শুনে পাপ ক'রে যাওয়ার অপরাধ থেকে বাঁচা। তাই সব কিছুর মূল হচ্ছে sincerity। আমি জ্ঞানপাপী—এই বলে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে রইলাম—এ করলে হবে না। সেটা sincerely বুঝতেও হবে এবং তার থেকে রেহাই পাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতেও হবে। মনে রাখতে হবে, একটি বিরাট শক্তির নজর আমাদের ওপর আছে। আমার চাওয়ার আসল রূপটা তাঁর কাছে আয়নার মত ধরা পড়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। আমি যদি ঠিক ঠিক চাই আমার নিম্নমুখী অবস্থার ওপরে উঠতে তাহলে তিনি ঠিকই সাহায্য করবেন। শিশু যেমন উঠে দাঁড়াতে শিখতে মায়ের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয় তেমনি আমাদের তাঁর দিকে সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়ে দিতে হবে আকুল প্রার্থনার সঙ্গে। ঠাকুর বারবার বলেছেন, "তাঁর কাছে ঠিক ঠিক চাইলে ঠিক ঠিক পাবে।" তবে যুগের প্রভাবের জন্য কিছু অসুবিধা থাকবেই। তাই ঠাকুর বললেন, "ঠাকুরই এদিক ওদিক ক'রে ঠিক ক'রে নেবেন।" এই একটি বড় ভরসা যে, আমরা যদি তাঁর দিকে sincerely হাত বাড়াই এবং তিনি যদি হাত ধরেন, তাহলে একটু আধটু পা টললেও তিনি আখেরে ঠিকই চালিয়ে নিয়ে যাবেন। তাই জ্ঞানপাপী যদি বুঝতে পারে যে, সে জ্ঞানপাপী, তাহলে মুক্তির পথ সে নিশ্চয় খুঁজবে। শুধু তাই নয়, তার নিজের অসহায়তার মাঝে বুক নিঙড়ে প্রার্থনাও জাগবে আমাদের ঠাকুরেরই শেখানো ভাষায়—"তুমি কৃপা ক'রে জোর ক'রে নিয়ে চল তোমার দিকে।" আর বলবে, "হে ঠাকুর, তুমি তেষ্টাও জাগাও, সব জোগাড় ক'রে দাও, তোমার যত আছে সব করো।"

২৪।। প্রশ্ন ঃ অবতারপুরুষকে আমরা ভগবান বলে জানি। কিন্তু তাঁকে দেখার পরও কেন মনের সব রিপুগুলি যায় না। কমবেশি কিছু না কিছু থেকে যায়। ভগবানকে দর্শন ক'রে তো মন পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার কথা। অনেক ক্ষেত্রেই তা হয় না কেন?

উত্তর ঃ ভগবান যখন মানুষরূপ ধরে আসেন, সাধুসন্ত রূপেই হোক বা গুরু রূপেই হোক, তাঁকে মোটামুটি একটা বিশ্বাস হয় বটে কিন্তু ঠিক অনুভূতিটা হয় না। মুখে বলছি ভগবান বা খানিকটা বিশ্বাসও করছি। সেটা হয়তো তাঁর মাহাত্ম্যের জোরে কতকটা প্রভাবান্বিত হয়ে বলছি। কিন্তু ঠিক অনুভূতি, যেটা সাধনা ক'রে চিন্ময়রূপধারী ভগবানকে পেলে হয়, সেটা আলাদা জিনিস।

তাই অবতারপুরুষ হোন, গুরু হোন, সাধুসন্ত হোন তাঁকে আমি সামান্যতম বিশ্বাস দিয়েই মনে ক'রে নিচ্ছি ইনি ভগবান। কিন্তু সেক্ষেত্রে আমার মনের কু-বৃত্তিগুলিকে নষ্ট করতে গেলে বিশেষভাবে চেষ্টা করতে হবে। তাঁর নাম জপ ইত্যাদি সহায়ে প্রার্থনা করতে হবে যাতে ঐ বৃত্তিগুলি চলে যায়। তার জন্য বিশেষভাবে কিছু তপস্যাও করতে হবে। তা না হলে ভগবান বলাটা কথার কথা হবে।

তবে কিছু ফল যে হবে না তা নয়। কিন্তু আমি যদি মনটাকে পরিষ্কার করতে চাই তাহলে তার জন্য আমাকে একটু আলাদা সময় ক'রে কিছু সাধনা ইত্যাদি করতে হবে। আমাদের ঠাকুরের কাছে অনেককে তাদের মনের ত্রুটিগুলি বলতে শুনেছি। ঠাকুর বিভিন্নভাবে আধার বিশেষে তাদের উপদেশ দিয়েছেন। নিজের অবস্থাটা নিজেকেই বুঝতে হবে, আমার ভিতর এই ত্রুটিটি আছে। নিজে বুঝেও যদি সেটাকে না বুঝি তাহলে কোনও ত্রুটিই কোনও দিন দূর হবে না, মনও পরিষ্কার হবে না। যেমন ধর— কারও প্রতি আমার বিদ্বেষভাব আছে, ঈর্ষাভাব আছে। কাউকে দেখলে রাগ এসে যাচ্ছে অকারণে। এগুলি নিজেকে বুঝতে হবে, বিচার করতে হবে। গুরুর কাছে স্বীকার করতে হবে, কৃপা প্রার্থনা করতে হবে। সত্যি যদি আমরা অবতার সাধুসন্ত বা গুরুকে ভগবান বলে বিশ্বাস করি, তবে তাঁর কাছে বলে পরিষ্কার হয়ে যাওয়াই সহজ উপায়। তিনি আধার বিশেষে

বলে দেবেন কী করলে মন পরিষ্কার হবে।

আমরা ঠাকুর সত্যানন্দদেবের কাছে এরকম ঘটনা দেখেছি। কোনও কোনও ভক্ত অকপটে তার মনের ত্রুটি বলত। ঠাকুর তখন তার মাথায় হাত দিয়ে জপ ক'রে দিয়ে নানান্ উপদেশ দিয়ে তার সে ভাব দূর করতে চেষ্টা করতেন। কখনও বলেছেন—যখন দেখবে মনের কোনও কু-ভাব বলতে সংকুচিত হচ্ছ, তখন একান্তে মা গঙ্গার কাছে বলবে। মা গঙ্গা হলেন পবিত্রতার প্রতিমূর্তি। এবং তিনি সব অপরাধ গ্লানি ধুয়ে দিতে পারেন। তাই এটিও একটি সাধনার অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। ঠাকুর বলতেন—যারা গঙ্গার ধারে থাকে, তারা যদি মা গঙ্গার কাছে বসে জপ করে, ঐ ত্রুটি দূর করার জন্য প্রার্থনা করে—তবে হয়তো ভাল ফল পেতে পারে।

সেইজন্য মাঝে মাঝে মনে হয় তপস্যা ক'রে সাধনা ক'রে চিন্ময় ভাগবানকে লাভ করলে হয়তো ভগবৎলাভের একটা আলাদা মূল্য হয়। কারণ সেটি কষ্ট ক'রে পাওয়া। আর অবতার রূপে, গুরু রূপে, সাধুসন্তদের রূপে পাওয়াটা সহজসাধ্য বলে সবসময় তাঁকে মর্যাদাও দেওয়া যায় না বা নিজের মনের অশুভ বৃত্তিগুলি ত্যাগ করার দিকে লক্ষ্যও থাকে না। কারণ, সহজে পেয়েছি বলে বুঝতে পারি না, ভগবান কতখানি কৃপাময়। বুঝতে পারি না, সাধারণ মানুষের সাধনা ক'রে ভগবৎলাভের ক্ষমতা নাই বলেই তিনি কৃপা ক'রে আমাদের ধরা দিয়েছেন। তাই যারা অবতার পুরুষ বা সদ্‌গুরুর আশ্রিত তাদের বিশেষ সচেতন হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। কারণ, নিজের মানসিক ত্রুটিগুলি বর্জন না করলে সেই পরম পাওয়ার ঠিক ঠিক মূল্য দেওয়া হয় না।

তবে এর মধ্যে একটা কথা আছে। তপস্যা ছাড়াই ভগবানকে পেলাম, মর্যাদা দিতে পারলাম না, এটি সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে বলা যায়। কিন্তু যাঁরা নিত্যসিদ্ধের থাক অর্থাৎ ভগবানের লীলার সাথী বা অন্তরঙ্গ পার্ষদ তাঁদের কথা আলাদা। তাঁদের তপস্যা সাধনা বিধিবৎ করার হয়তো প্রয়োজনই হয় না। করলেও সেটা লোকশিক্ষার জন্যই। কথামৃতে শ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলেছেন —নিত্যসিদ্ধদের ক্ষেত্রে আগে ফল তারপর ফুল।

♦♦♦♦♦♦♦

শ্রীঅর্চনাপুরী মায়ের স্বরচিত কয়েকটি গ্রন্থ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঙ্গলকাব্য	টাঃ ১৫০.০০
জননী সারদেশ্বরী	৩০.০০
মহাভারতের কয়েকটি চরিত্র	৩০.০০
সারদা তত্ত্ব	১০.০০
হিন্দু নারীর ঐতিহ্য	১০.০০
সমন্বয়ী দর্শন	১০.০০
মূর্তিপূজার বিধি ও তাৎপর্য	৫.০০
সবার ঠাকুর সত্যানন্দ	১০.০০
অমৃত সরসি (কবিতা)	[illegible]৫.০০
আমি নয় তুমি (কবিতা)	১০.০০
কতগুলো ঢেউ (কবিতা	১৮.০০
দিগন্ত সংকেত (কবিতা)	১৫.০০
ছোটদের সারদামণি	৭.০০
এসো ভাই দেশ গড়ি	২০.০০
বড় হবার লক্ষ্যে	২০.০০
পশু পাখীর মেলা (১ম খণ্ড)	১৮.০০
পশু পাখীর মেলা (২য় খণ্ড)	১২.০০

স্বামী মৃগানন্দ রচিত কয়েকটি পুস্তিকা

ধর্মের রহস্য	২০.০০
সর্বদেবময় সত্যানন্দ	২০.০০
অলৌকিক কৃপাময় সত্যানন্দ	৩০.০০
গোপাল সোনা	৩০.০০

স্বামী নির্বেদানন্দ রচিত পুস্তক

স্মৃতির তীর্থে সত্যানন্দ	১৫০.০০

স্বামী হীরানন্দ রচিত পুস্তক

আলোর দেবতা সত্যানন্দ	২০.০০

ছড়ানো মুক্তো — তিরিশ টাকা